বিদেশী গল্পগুচ্ছ

বিদেশী গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক
অমিয়কুমার চক্রবর্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৪
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা—১২

ছেপেছেন
গৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলকাতা—৬

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
গণেশ বসু

তিন-টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

বিদেশী শ্রেষ্ঠ লেখকদের একটা করে গল্প নিয়ে একটা সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছে বহুদিন থেকেই ছিলো। প্রচুর উৎসাহ নিয়ে সংকলনের কাজে এগিয়ে চলেছি, অনেক বাছাই অনেক যাচাই করে শেষ পর্যন্ত যখন একটা তালিকা খাড়া করা গেলো, ছাপাখানার কর্তা তা দেখে যত পৃষ্ঠার বই হবে বললেন তা শুনে মনটা বেশ একটু দমে গেলো, কারণ বইয়ের দাম তিনটাকা সাড়ে তিনটাকার মধ্যেই রাখবো ঠিক করেছিলাম। তখন চললো আবার বাছাই আর যাচাইয়ের কাজ, যার ফলে বইটা বর্তমানে আকৃতিতে এসে দাঁড়ালো। এই ডবল বাছাইয়ের ফলে যে-কয়টা গল্প এই সংকলনে গ্রন্থিত হলো, মাত্র সেই কয়টি নিয়ে সম্পূর্ণতার দাবী করা যায় না, একথা বলাই বাহুল্য।

অনুবাদগুলি প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ, এবং অনূদিত গল্পগুলিতে মূল লেখকের লিপিকুশলতা বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের এক-একটি উজ্জ্বল রত্ন, এবং যেকোনো শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে উপযোগী। সাহিত্য যেখানে মহৎ, সেখানে আর স্থান কাল বা বয়সের গণ্ডীতে তাকে বেঁধে রাখা যায় না।

মূল লেখক, প্রকাশক ও অনুবাদক, যাঁদের সাহচর্য না পেলে এ-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ-ধরনের প্রচেষ্টা বাংলায় আগে হয়েছে বলে জানা নেই, সুতরাং পাঠক-সমাজ একে কীভাবে গ্রহণ করবেন জানিনা : তবে বাঙালী পাঠক সম্বন্ধে এটুকু অন্তত জানা আছে যে যেকোনো ভালো জিনিস তাঁরা সাদরে গ্রহণ করে থাকেন।

একটা ত্রুটি স্বীকার করছি। 'চোরাই চিঠি' গল্পটির অনুবাদকের নাম ভুলক্রমে বাদ পড়েছে। গল্পটি অনুবাদ করেছেন নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বইটির শেষে একটি লেখক-পরিচিতি দেওয়া হলো।

সম্পাদক

লক্ষ্মীমেয়ে

নমিতাকে—

কতোটা জমি দরকার ?

লিও টলস্টয়

সহর থেকে দিদি এসেছে বোনের বাড়ি বেড়াতে। দিদির বিয়ে হয়েছে এক মহাজনের সঙ্গে, আর বোনের বিয়ে হয়েছে এক চাষীর সঙ্গে। দুজনে চা খেতে খেতে গল্প করছিলো। দিদি পাঁচখানা করে বলতে লাগলো সহর-জীবনের সুখ-সুবিধের কথা—কত আরামে-আয়েসে সে থাকে, ছেলেমেয়েদের ভালো জামা-কাপড় পরায়, কত রকমারি জিনিস খায়, স্কেট করে, বেড়ায়, থিয়েটারে যায়।

দিদির কথাবার্তায় ভারি বিরক্ত হলো ছোট বোন। সেও পাল্টা মহাজনের স্ত্রীর জীবনযাত্রার নিন্দে করে নিজের গ্রাম্য জীবনের খুব খানিকটা প্রশংসা করলো।

সে বললো, আমার কথা যদি বলো, আমি তো কিছুতেই তোমার সঙ্গে আমার জীবনধারা বদলাতে রাজি নই। অবশ্য তোমার এ-কথা আমি মানি যে আমাদের এখানকার জীবন খুব সাদাসিধে আর তাতে উত্তেজনাও কিছু নেই। কিন্তু তোমাদের কথাটাও ভাবো। তোমরা খাও-পরো ভালো বটে, কিন্তু তোমরা হয় ভালো ব্যবসা করে খুব বড়লোক হবে, না হয় তো একেবারে ফকির হবে। সেই প্রবাদটা তুমি নিশ্চয়ই জানো: লাভ-ক্ষতি দুই ভাই। ছাখো, আজ তুমি ধনী, কিন্তু কাল তুমি পথের ভিখিরি হতে পারো। আমরা কিন্তু এখানে তার চেয়ে অনেক

ভালো আছি। চাষীরা খায় হয়তো কম, কিন্তু তারা সব সময়েই খেতে পায়। সোজা কথায়, চাষীরা ধনী না হতে পারে, কিন্তু প্রচুর খাবার তাদের সবসময়েই থাকে।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, কী বললে? প্রচুর? কতগুলো শুয়োরের বাচ্চা আর গোরুর বাচ্চা ছাড়া তোমাদের আর কী আছে শুনি? ভালো একটা পোশাক নেই, ভালো একটা সঙ্গীসাথী নেই, তার আবার প্রচুর! আরে বাপু, তোমার বাড়ির লোকটি যতই খাটুক না, তোমরা থাকবে মাটির ঘরে, আর মরবেও সেখানে—হ্যাঁ তাই। আর তোমার ছেলেপুলেদেরও সেই দশাই হবে।

ছোট জবাব দিলো, না না, আমাদের অবস্থা বরং এই রকম: যদিও আমাদের খুব খাটতে হয়, তবু যে-জমিতে বাস করি সেটা অন্তত আমাদের নিজেদের। আর, অন্যের খোসামুদি আমাদের কখনো করতে হয় না। আর তোমরা সহুরেরা—একটা বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে তোমাদের জীবন কাটে। আজ তুমি বেশ আছ, কিন্তু কালই হয়তো শনির দৃষ্টি পড়লো তোমার উপর, আর তোমার স্বামী হয়তো ভুললো জুয়ায় বা মদে, ফলে তোমরা একেবারে শেষ হয়ে গেলে। কেমন, তা নয় কি?

স্টোভটার পাশে বসে ছোট বোনের স্বামী পাখোম সবই শুনছিলো।

সে বললো, সে কথা ঠিক। ছোটবেলা থেকে মাটি-মায়ের কোলেই পড়ে আছি, তাই মাথায় কখনো কোনরকম বদ্‌খেয়াল ঢুকতে পারে নি। তবে একটা অভাব আমার আছে—বড় অল্প জমি আমার। জমি যদি পাই তাহলে আমি কাউকে ডরাই না—স্বয়ং শয়তানকেও না।

দুই বোন চা খাওয়া শেষ করে আরো খানিক বসে জামা-

কাপড়ের গল্প করলো, চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলো, তারপর শুতে গেলো।

এদিকে শয়তান কিন্তু সারাক্ষণ বসে ছিলো স্টোভটার পিছনে আর শুনছিলো সব। চাষীর বৌয়ের কথায় তার স্বামী যখন গর্ব করে বললো যে জমি একবার পেলে স্বয়ং শয়তানও তা কেড়ে নিতে পারবে না, সে-কথা শুনে শয়তান ভারি খুশি হলো।

সে ভাবলো, চমৎকার! তোমাকে নিয়েই একটা খেলা খেলবো। আগে তোমাকে অনেক জমি দেবো—আর তারপর তা কেড়ে নেবো।

এই চাষীদের বাড়ির কাছেই একটি মহিলা বাস করতেন। তিনি ছিলেন ১২০ ডেসিয়াটিন [১]জমির মালিক। এতদিন চাষীদের সঙ্গে তাঁর বেশ সদ্ভাবই ছিলো। নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার তিনি কখনো করেন নি। কিন্তু সম্প্রতি তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিককে জমিদারির ওভারসিয়ার নিযুক্ত করেছেন। সেই লোকটি নানারকম জরিমানা করে চাষীদের উপর অত্যাচার করতে লাগলো। পাখোম যতই সতর্ক হোক, তবু কখনো হয়তো তার একটা ঘোড়া ঢুকলো সেই মহিলার ওট ক্ষেতে, কখনো বা গরুটা গেলো তাঁর বাগানে, নয়তো বাছুরটা বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়লো তাঁর গো-চরে; ফলে তাকে অনেক জরিমানা দিতে হতো।

সেবার শীতকালে চারদিকে গুজব রটে গেলো যে বারিনা[২] তাঁর সব জমি বিক্রি করে ফেলবেন এবং সেই জমি ও তৎসংলগ্ন যাতায়াতের রাস্তাটা কিনে নেবে তাঁর ওভারসিয়ার। গুজব ক্রমে চাষীদের কানেও পৌঁছুলো। ফলে তারা খুব মুসড়ে পড়লো।

১। এক ডেসিয়াটিন = ২$\frac{3}{4}$ একর

২। বারিনা=জমিদার মহিলা

তারা ভাবলো, ওভারসিয়ার যদি জমির মালিক হয় তাহলে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি করে জরিমানা চাপিয়ে আমাদের বিব্রত করবে। অথচ ঐ জমির চারদিকেই আমাদের বসবাস। কাজেই যেমন করেই হোক ও জমি আমাদের হাত করতেই হবে।

তখন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বা মীরএর একটি প্রতিনিধিদল গেলো বারিনার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে অনুরোধ করলো, জমিটা ওভারসিয়ারের কাছে বিক্রি না করে যেন তাদের দেওয়া হয়, তারা বেশি টাকা দিতে রাজি আছে। বারিনা এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। তখন চাষীরা মীরএর পক্ষ থেকে সমস্ত সম্পত্তিটা কিনে নেবার জোগাড়-যন্তর করতে লাগলো। এ নিয়ে তারা একটা সভা ডাকলো। পরে আরো সভা করলো, কিন্তু কোনো মীমাংসা করতে পারলো না। আসল ব্যাপার হলো কী, শয়তান অলক্ষ্যে থেকে এমন ব্যবস্থা করতে লাগলো যাতে তারা কিছুতেই একমত হতে না পারে। তখন চাষীরা স্থির করলো যে, প্রত্যেকে আলাদা ভাবে যে যতটা পারে জমি কিনে নেবে। আর বারিনাও সে-প্রস্তাবে রাজি হলেন। একদিন পাখোম শুনতে পেলো, তাদের এক প্রতিবেশী কুড়ি ডেসিয়াটিন জমি কিনে ফেলেছে এবং বারিনা নাকি টাকার অর্ধেক এক বছর পরে নিতে রাজি হয়েছেন। শুনে পাখোমের ঈর্ষা হতে লাগলো। সে ভাবলো, অপরে যদি সব জমি কিনে ফেলে তাহলে আমি কী করব? তাই সে স্ত্রীর পরামর্শ চাইলো : দ্যাখো, সবাই কিছু কিছু জমি কিনছে। আমাদেরও দশ ডেসিয়াটিন জমি কেনা উচিত। যা দিন-কাল পড়েছে, তাতে তো খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করাই শক্ত, কারণ ওভারসিয়ার তো জরিমানা হিসেবে সবই নিয়ে নিয়েছে। কাজেই জমিটা কী ভাবে কেনা যায় তাই তারা ভাবতে লাগলো।

একশো রুব্‌ল্ তাদের আগে থেকেই জমানো ছিলো।

তার উপর একটি গাধার বাচ্চা ও অর্ধেক মৌমাছি বিক্রি করে এবং ছেলেকে চাকরিতে পাঠিয়ে তারা কোনরকমে বাকি অর্ধেক টাকা জোগাড় করলো।

সব টাকা জুটিয়ে পনেরো ডেসিয়াটিন জমি ও ছোট একটা বাগান পছন্দ করে পাখোম বারিনার কাছে গেলো জমি কিনতে। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে দুজনে করমর্দন করলো। পাখোম কিছু টাকা তখুনি জমা দিয়ে দিলো। তারপর সে গেলো সহরে। দলিল রেজেস্ট্রি করা হলো (জমির অর্ধেক টাকা তখুনি দিতে হবে, আর বাকিটা দিতে হবে দু-বছরের মধ্যে)—ব্যস্! পাখোম হয়ে বসলো জমির মালিক। শ্যালকের কাছ থেকে আরো কিছু টাকা ধার করে সে বীজ কিনলো। তারপর যথাসময়ে নতুন-কেনা জমিতে সেই বীজ সে বুনে দিলো আর ফসল পেলো প্রচুর। ফলে এক বছরের মধ্যেই সে বারিনার টাকা আর শ্যালকের দেনা দুই-ই শোধ করে দিলো। তখন সে হলো জমির পুরো মালিক। নিজের জমিতে সে বীজ বুনলো, তুললো নিজের ফসল, কাটলো নিজের জ্বালানি কাঠ আর চরালো নিজের গোরু-বাছুর। চাষ করতে অথবা ফসল এবং গো চরের তত্ত্বাবধান করতে যখনই সে ঘোড়ায় চড়ে তার নিজস্ব জমিতে যেতো, তখনই আনন্দে ভরে উঠতো তার মন। এমনকি জমির ঘাসগুলোকে পর্যন্ত মনে হতো অন্য ঘাসের চেয়ে স্বতন্ত্র, ফুলগুলোও যেন ফুটতো অন্য ভাবে। আগে যখন সে জমির উপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতো, তখন জমিকে জমি-ই মনে হতো; এখন সেই জড় মাটি যেন তার চোখে আলাদা হয়ে দেখা দেয়।

এমনি করে বেশ সুখেই পাখোমের দিন কাটতে লাগলো। এবং কাটতোও তাই, শুধু যদি অন্য চাষীরা তার ফসল আর গো-চরগুলোকে রেহাই দিতো। বার বার সে বৃথাই প্রতিবাদ

জানালো। মেষপালকেরা প্রায়ই তার গো-চর মাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতো তাদের মেষের দল, আর রাতের বেলায় ঘোড়াগুলো ঢুকে পড়তো ফসলের ক্ষেতে। বার বার পাখোম সেগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত রইলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। জেলা আদালতে সে একটা নালিশ রুজু করে দিলো। সে জানতো, জমির অভাবেই চাষীরা এ কাজ করতো, তার ক্ষতি করবার জন্য নয়। তবু এ অবস্থা সে আর চলতে দিতে পারে না। ওরা যে খেয়ে সব তছনছ করে দিলো! একটা শিক্ষা মেষপালকদের দিতেই হবে।

আদালতে সে প্রথমে তাদের একজনকে শিক্ষা দিলো। তারপর আরেকজনকে। প্রথমে একজনের জরিমানা হলো। তারপর আর একজনের। ফলে সবাই তার উপর চটে গেলো এবং প্রতিবেশীরা এবার ইচ্ছে করেই তার ফসল চুরি করতে আরম্ভ করলো। একদিন রাত্রে একজন তো তার বাগানে ঢুকে দশ-দশটা লিণ্ডেন গাছের বাকল আগাগোড়া তুলে নিলো। সেখান দিয়ে যেতে যেতে একদিন এই ব্যাপার দেখে তার মুখ কালো হয়ে গেলো। আরো কাছে গিয়ে দেখলো, বাকলগুলো সব ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে আর গাছগুলো সব শিকড়শুদ্ধ উপড়োনো রয়েছে। দুষ্কৃতকারীরা একটা গাছ শুধু রেখে গেছে; তারও আবার সব ডালপালা কেটে ফেলেছে। বাদবাকি সব গাছ তারা কেটে একেবারে সাফ করে দিয়েছে। পাখোম তো রেগে আগুন! সে মনে মনে ভাবলো, উঃ! যদি জানতে পারতাম কে এ কাজ করেছে, একবার দেখে নিতাম সামনা-সামনি! সে অনেক ভাবলো, লোকটা কে হতে পারে। হুঁ, এ কাজ যদি কেউ করে থাকে তবে সে সেম্‌কা। তখুনি সে গেলো সেম্‌কার কাছে। কিন্তু শুধু গালাগালি ছাড়া তার কাছ থেকে আর কিছুই পাওয়া

গেলো না। তবু ক্রমেই তার নিশ্চিত ধারণা হলো যে এ কাজ সেম্‌কার। তার বিরুদ্ধে সে মামলা ঠুকে দিলো। ফলে দুজনেরই ডাক এলো আদালত থেকে। অনেক আলাপ-আলোচনার পর ম্যাজেস্ট্রেটরা প্রমাণ অভাবে মামলা খারিজ করে দিলো। এতে আরো রেগে গেলো পাখোম। গাঁয়ের মাতব্বর আর ম্যাজিস্ট্রেট —দু-দলকে সেই দোষ দিতে লাগলো। বললো, ম্যাজিস্ট্রেট বাবুরা, আপনাদের সংগে নিশ্চয় চোরদের যোগসাজস আছে। আপনারা যদি সৎ হতেন তাহলে কিছুতেই সেম্‌কাকে খালাস করে দিতেন না। ক্রমেই সে নিজের জমিতে একা-একা বাস করতে লাগলো। মীরএর সঙ্গেও তার সম্পর্ক ক্রমেই ঢিলে হতে লাগলো।

সেই সময় একটা গুজব রটলো যে, কিছু কিছু চাষী এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছে। একথা শুনে পাখোম মনে-মনে ভাবলো: কিন্তু আমার জমি ছেড়ে কোথাও যাবার কোনো কারণই নেই। যদি অন্যেরা যায়, ভালোই তো, আমার আরো বেশি জমি হবে, তাদের জমিগুলো আমি কিনে নিতে পারবো। তখন চারদিকে সবই হবে আমার জমি, আমি আরো আরামে থাকতে পারবো। এখন বড়ই চাপাচাপিতে আছি।

কিছুদিন পরের ঘটনা। একদিন পাখোম বাড়িতেই বসে ছিলো। এমন সময় একজন পথিক চাষী সেখানে এসে থামলো। পাখোম তাকে এক রাতের জন্য আশ্রয় দিলো, খেতে দিলো। কথাপ্রসঙ্গে সে তাকে শুধোলো সে কোথা থেকে এসেছে। লোকটি জবাবে বললো যে, ভল্‌গার ওপারে যেখানে সে চাকরি করতো সেখান থেকে উজান হেঁটে সে এসেছে। তারপর সে আরো বললো, সেখানে একটি নতুন বসতির পত্তন হচ্ছে। যারাই সেখানে গিয়ে গ্রাম্য পঞ্চায়েতে নাম লেখাচ্ছে তাদেরই দশ

ডেসিয়াটিন করে জমি দিচ্ছে। আর, সে কী জমি! কী চমৎকার তার ফসল! তার খড়গুলোই এতো লম্বা যে তার মধ্যে একটা ঘোড়া ঢুকলেও আর দেখা যাবে না। আর ঘনও এমনি যে পাঁচ মুঠো নিলেই একতাড়া হয়ে যাবে। লোকটা বলেই চললো, একজন চাষী যখন সেখানে প্রথম এলো তখন সে একেবারেই গরিব। খেটে খাবার ছুখানি হাত ছাড়া আর কোনো সম্বলই ছিলো না। এবার সে পঞ্চাশ ডেসিয়াটিন জমিতে শুধু গমই ফলিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, গত এক বছরে একমাত্র গম বেচেই সে ৫০০০ রুব্‌ল্ পেয়েছে।

একথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো পাখোমের মন। সে ভাবতে লাগলো: এমন উপার্জন যদি সেখানে করতে পারি, তাহলে এখানে এমন গরিবের মতো কুঁকড়ে পড়ে থাকব কেন? এখানকার জমি, বাড়ি সব বেচে দিয়ে সেই টাকায় সেখানে গিয়ে নতুন বাড়ি করবো, ক্ষেত করবো। এখানে এই ছোট জমিতে জীবনে ছুঃখকষ্ট তো লেগেই আছে। অন্ততপক্ষে সেখানে একবার গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে তো পারি।

গরম পড়তেই সে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লো। ভল্‌গা নদীতে স্টীমারে চড়ে পৌঁছুলো সামারা। সেখান থেকে ৪০০ ভার্স্ট[১] পায়ে হেঁটে পৌঁছুলো গন্তব্যস্থানে। যেমনটি শুনেছিলো ঠিক তাই। মাথা-পিছু দশ ডেসিয়াটিন জমি নিয়ে চাষীরা খাসা আছে সেখানে। পঞ্চায়েৎ তাকেও সাদরে গ্রহণ করলো। তাছাড়া তাকে বলা হলো যে, সেখানে যারা টাকা নিয়ে আসে তারা কায়েমী স্বত্বে যতো খুশি জমি কিনতে পারে। ডেসেয়াটিন-প্রতি তিন রুব্‌ল্ দামে যতো খুশি সবার সেরা জমি কেনা যায়।

এইসব খবর জেনে পাখোম হেমন্তকালে বাড়ি ফিরলো।

১। এক ভার্স্ট = ১১৬৬⅔ গজ

এসেই সব বিক্রি করতে শুরু করলো। জমি, বাড়ি, ফসল সব সে বেশ ভালো দামেই বেচে ফেললো। তারপর মীরএর খাতা থেকে নিজের নাম কাটিয়ে বসন্তকাল আসতেই সপরিবারে যাত্রা করলো নতুন দেশে।

যথাসময়ে তারা পৌঁছলো সেখানে। সঙ্গে সঙ্গেই পাখোমকে নতুন বসতির মীরএর সভ্য করে নেওয়া হলো (অবশ্য মাতব্বরদের গলা কিছুটা ভিজিয়ে প্রয়োজনীয় দলিল সম্পাদনের পর)। তারপর মাথা-পিছু দশ ডেসিয়াটিন হিসেবে তাকে দেওয়া হলো পঞ্চাশ ডেসিয়াটিন জমি। তাছাড়া গো-চরের অংশ তো আছেই। পাখোম নতুন করে বাড়িঘর করলো। আগে তার যে জমি ছিলো তার দ্বিগুণ জমি সে এমনিতেই পেলো। সবই আবার ফসলের জমি। মোটের উপর যেখান থেকে সে এসেছে তার তুলনায় এখানকার জীবন দশগুণ ভালো। এখন চাষের জমি এবং গো-চর দুয়েরই মালিক সে, আর সে গো-চর এতো বড় যে সে যতো ইচ্ছে গোরু-ঘোড়া রাখতে পারে।

প্রথম-প্রথম বাড়ি-ঘর করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবার সময় সবই তার কাছে মনে হয়েছিল চমৎকার। কিন্তু একটু পা ছড়িয়ে বসবার পরে তার আবার মনে হতে লাগলো যে জায়গা যেন বড় কম। অন্যের দেখাদেখি তারও সাদা তুর্কী-গম ফলাবার ইচ্ছে হলো। কিন্তু যে পাঁচখানা জমি তার ভাগে পড়েছিলো তার কোনোখানাই গমের উপযুক্ত নয়। গম জন্মায় ঘাসজমি, নতুন জমি বা ফেলে-রাখা জমিতে। সেসব জমি একবার চাষ করে দুবছর ফেলে রাখতে হয়, যাতে ভালো করে ঘাস গজাতে পারে। অবশ্য নরম জমি তার যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু তাতে ফলে শুধু রাইফসল। গমের জন্য দরকার শক্ত জমি। আর শক্ত জমির প্রার্থীও বেশি। আবার সেরকম জমি যথেষ্ট ছিলোও না

সেখানে। উপরন্তু, সেসব জমি নিয়ে ঝামেলাও অনেক। ধনী চাষীরা নিজেদের জমিতে ফসল বোনে। কিন্তু যারা গরিব তারা মহাজনের কাছে জমি বন্ধক দিতে বাধ্য হয়।

প্রথম বছরে পাখোম তার জমিতে গম বুনে চমৎকার ফসল পেলো। পরের বারেও সে গম বুনতে চাইলো। কিন্তু তার এতো জমি ছিলো না যে গত বছরের ফসলের জমি পাখাল ফেলে রেখেও নতুন জমিতে ফসল বোনা চলে। কাজেই আরো জমি তার দরকার। তাই সে এক মহাজনের কাছে গিয়ে কিছু গমের জমি এক বছরের জন্য লীজ নিলো। সে-জমি চাষ করে ফসল পেলো প্রচুর। কিন্তু জমিটা ছিলো নতুন বসতি থেকে অনেক দূরে। তাই গাড়ি করে সব ফসল বয়ে আনতে হলো পনেরো ভার্স্ট পথ। পাখোম দেখেছে, অনেক কৃষি মহাজন চাষের জমির পাশেই চমৎকার বাড়িঘর করে যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি করেছে। তাই সেও ভাবতে লাগলো, তাদের মতো আমিও যদি জমিটা লম্বা লীজ নিয়ে সেখানে বাড়িঘর করি তাহলে কেমন হয়? আমি তো তাহলে জমির কাছাকাছি থাকতে পারি। কাজেই সে সেই ব্যবস্থাতেই মন দিলো।

এমনি করে ক্রমাগত নতুন জমি নিয়ে আর তাতে গম বুনে পাখোম পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলো। সবগুলো বছরই ছিলো ভালো, গম ফললো প্রচুর আর টাকাও এলো ঢের। কিন্তু এই একঘেয়ে জীবন ক্রমেই তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠলো। ফি বছর নতুন নতুন জায়গায় জমি লীজ নিয়ে সেখানে চাষের সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাওয়ার হাঙ্গামাও অনেক। তাছাড়া, ভালো জমি একটা পাওয়া গেলেও অন্য চাষীরাও সেখানে ভীড় জমাতো। ফলে সমস্ত জমিটা নিজের নামে লীজ নেবার আগেই সেটা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যেতো। একবার কয়েকজন চাষীর একটা

গো-চর জমি সে এক মহাজনের সঙ্গে ভাগে নিয়ে আবাদ করলো। এদিকে সেই জমি নিয়ে একটা মামলায় মহাজন গেলো হেরে। ফলে তার সমস্ত পরিশ্রমটাই বরবাদ হয়ে গেলো। জমিটা যদি তার একার হতো, তাহলে তো আর কোন হাঙ্গামা হতো না।

তখন থেকেই সে একটা পুরো সম্পত্তি একেবারে কিনে নেবার চেষ্টায় রইলো। জনৈক চাষীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ায় সে তার ৫০০ ডেসিয়াটিন জমি সস্তায় বেচে দিতে রাজি হলো। পাখোম তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে অনেক কথা-কাটাকাটির পর জমির দাম ১০০০ রুব্‌লে রফা করলো—অর্ধেক নগদ দিতে হবে, বাকিটা পরে। এর কয়েক দিন পরে একজন মহাজন একদিন পাখোমের বাড়িতে এসে উঠলো তার ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেবার জন্য। দুজনে এক পাত্র চা খেতে খেতে অনেক গল্প করলো। মহাজনটি বললো, সে অনেক, অনেক দূরের বাসকিরদের দেশ থেকে এসেছে। সেখানে (সে তো তাই বললো) সে মাত্র ১০০০ রুব্‌লে ৫০০০ ডেসিয়াটিন জমি কিনেছে। কৌতূহলী হয়ে পাখোম তাকে অনেক প্রশ্ন করলো। সেও জবাব দিলো। সে বললো, আমি অবশ্য কাজের মধ্যে এই করেছি যে, গাঁয়ের মাতব্বরদের কিছু উপহার দিয়েছি, (কিছু খালাত,[১] কার্পেট আর এক বাক্স চা), কয়েক শো রুব্‌ল্ ছড়িয়েছি, আর যারা চেয়েছে কিছু ভড্‌কা খাইয়েছি। ফলে ডেসিয়াটিন প্রতি কুড়ি কোপেক[২] দামে জমিটা আমি পেয়ে গিয়েছি। পাখোমকে সে জমির দলিলটাও দেখালো। তারপর বললো, জমিটা একেবারে নদীর উপরে, চারদিক খোলা, কেবল ঘাসজমি আর মাঠ। পাখোম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে আরো অনেক প্রশ্ন করলো।

১। খালাত—একরকম লম্বা কোট
২। কোপেক—অল্পদামী মুদ্রা

মহাজনটি আরো বললো, সারা বছর খুঁজলেও অমন জমি আপনি পাবেন না। আর বাসকিরদের দেশের সব জমিই ঐরকম। তা ছাড়া সেখানকার মানুষগুলি একেবারে ভেড়ার মতো সরল। আপনি অনায়াসে যে-কোনো জিনিস তাদের কাছ থেকে বাগিয়ে নিতে পারেন।

পাখোম মনে মনে ভাবলো, আচ্ছা ১০০০ রুব্‌ল্‌ খরচ করলে আমি যখন একটা জমিদার বনে যেতে পারি তখন সেই টাকা দিয়ে ৫০০ ডেসিয়াটিন জমি কিনে আমার লাভ কী? তাও আবার ঘাড়ে ঝুলে থাকবে একটা ঋণের বোঝা!

মহাজনটির কাছ থেকে পাখোম বাসকিরদের দেশে যাবার হদিশ জেনে নিলো এবং সে চলে যাবার পরেই সেখানে যাবার জন্য তৈরি হলো। স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে একজন মাত্র মজুরকে সঙ্গে নিয়ে সে হাজির হলো একটা সহরে। সেখানে মহাজনের পরামর্শ মতো এক বাক্স চা, ভড্‌কা ও অন্যান্য উপহার কিনে আবার দুজনে যাত্রা করলো। ৫০০ ভার্স্ট পথ পার হয়ে সাত দিনের দিন বাসকিরদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলো। মহাজন যেমন যেমন বলেছিলো ঠিক তাই। খোলা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে যে নদীটা বয়ে চলেছে তারই ধারে ধারে চামড়ার ছাউনি দেওয়া গাড়িতে তারা বাস করে। তারা জমিও চাষ করে না, কোনো ফসলও খায় না। খোলা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে গোরু-মহিষ আর কসাক ঘোড়ার দল। ঘোড়ার বাচ্চাগুলো সব বাঁধা রয়েছে গাড়ির পিছনে। দিনে দুবার করে তাদের মাকে তাড়িয়ে আনা হয় বাচ্চাদের দুধ দিতে। লোকের প্রধান খাদ্যই হলো ঘোড়ার দুধ। সেই দুধ দিয়ে মেয়েরা একরকম পানীয় তৈরি করে, তার নাম কুমিস। কুমিস থেকে আবার তৈরি হয় পনীর। বাসকির-দের একমাত্র পানীয় কুমিস বা চা, তাদের একমাত্র খাদ্য ভেড়ার

মাংস। আর তাদের একমাত্র প্রমোদ বাঁশি বাজানো। তবু দেখতে তারা বেশ হাসিখুশি, সারা বছর ধরেই যেন তাদের ছুটি লেগেই থাকে। লেখাপড়া জানে খুবই কম, রুশ ভাষা জানেই না; কিন্তু মানুষ হিসেবে তারা দয়ালু আর আকর্ষণীয়।

পাখোমকে দেখেই তারা সব গাড়ি থেকে নেমে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। একজন দোভাষীও পাওয়া গেলো। পাখোম তাকে জানালো যে সে জমি কিনতে এসেছে। একথা শুনে লোকগুলো ভারি খুশি হয়ে পাখোমকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তাকে নিয়ে গেলো সবচেয়ে ভালো গাড়িটাতে। সেখানে তাকে বসতে দিলো একবোঝা কম্বলের উপর পাতা নরম গদিতে, চা দিলো আর দিলো কুমিস। একটা ভেড়া মেরে তার মাংস দিলো খেতে। পাখোমও তার টারাণ্টাস[১] থেকে উপহারের জিনিসগুলো এনে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলো। তখন বাসকিররা কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করে দোভাষীকে কথা বলতে বললো।

দোভাষী বললো, আমি আপনাকে জানাতে চাই যে এরা সবাই আপনার উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছে এবং কোনো উপহার পেলে তার বিনিময়ে যেকোনো উপায়ে অতিথির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা, সেই আমাদের প্রচলিত প্রথা। যেহেতু আপনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, এখন বলুন আমাদের এমন কোন্ জিনিস আছে যা আমরা আপনাকে দিতে পারি।

পাখোম জবাব দিলো, আমি বিশেষ করে চাই আপনাদের কিছু জমি। যেখান থেকে এসেছি সেখানে যথেষ্ট জমি নেই। যাও বা আছে সব আবাদ হয়ে গেছে। অথচ আপনাদের অনেক জমি আছে। বেশ ভালো জমি, এমন জমি যা আমি এর আগে কখনো দেখিনি।

১। টারাণ্টাস—ছোট দু-চাকার গাড়ি

দোভাষী কথাগুলো অনুবাদ করে দিলো। বাসকিররা আবার নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করলো। তাদের কথা অবশ্য পাখোম কিছুই বুঝতে পারছিলো না, কিন্তু সে দেখলো, তারা আহ্লাদে গদ-গদ হয়ে উচ্চকণ্ঠে কি যেন বলছে আর হো-হো করে হেসে উঠছে। অবশেষে আলোচনা থামিয়ে তারা পাখোমের দিকে তাকালো আর দোভাষী কথা বলতে লাগলো।

সে বললো, আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনার সদয় ব্যবহারের বিনিময়ে আপনি যতো জমি চান তাই আপনার কাছে বেচতে আমরা রাজি আছি। আপনি শুধু হাত তুলে দেখান কতো জমি আপনার চাই। ব্যস তাই আপনি পাবেন।

এইসময় লোকগুলো আবার যেন কি নিয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ তর্কাতর্কি শুরু করে দিলো। পাখোম শুধোলো, ব্যাপার কী? দোভাষী বললো, একদল বলছে জমির কথাটা আগে স্টার্শিনাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং তাকে ছাড়া কিছু করা উচিত নয়, আর অপর দল বলছে তার কোনো দরকার নেই।

বাসকিররা যখন এইরকম কথা-কাটাকাটি করছে তখন হঠাৎ সেই গাড়িতে শেয়ালের চামড়ার টুপি-পরা একটি লোক ঢুকলো। তাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো। দোভাষী পাখোমকে বললো: এই হচ্ছে স্বয়ং স্টার্শিনা। পাখোম তৎক্ষণাৎ সবচেয়ে ভালো খালাতটা নিয়ে তাকে উপহার দিলো, আর দিলো পাঁচ পাউণ্ড চা। স্টার্শিনা যথারীতি সেগুলো গ্রহণ করলো। সে তার সম্মানিত আসন গ্রহণ করবার পর বাসকিররা তাকে সমস্ত ব্যাপার বোঝাতে লাগলো। মনোযোগ দিয়ে সব

কথা সে শুনলো। হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। রুশ ভাষায় সে কথা বললো পাখোমের সংগে।

সে বললো, বেশ কথা, আপনার মনোমত যে কোনো জমি আপনি বেছে নিন। অনেক জমি আমাদের আছে।

পাখোম মনে মনে ভাবলো, আমি তাহলে যতো খুশি জমি নিতে পারি। তবু ব্যবস্থাটাকে পাকা করে নিতে হবে। আজ হয়তো বললো এ জমি তোমার, আবার কাল যদি কেড়ে নেয়!

সে বলে উঠলো, আপনার সদয় কথাবার্তার জন্য আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি বলছেন আপনার অনেক জমি, আর আমারও কিছু জমির দরকার। আমি শুধু জানতে চাই ঠিক কোন্ জমিটুকু আমার হবে, যাতে কোনোরকমে সেই জমিটা মাপ-জোপ করে আপনি দলিল করে সেটা আমাকে দিয়ে দিতে পারেন। জন্ম মৃত্যু ভগবানের হাত। আপনারা ভালো মানুষ, আজ হয়তো জমিটা আমাকে দিলেন, কিন্তু আপনার পরবর্তী বংশধরেরা আবার সেটা কেড়েও তো নিতে পারে।

স্টার্শিনা হাসলো।

সে বললো, দলিল ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। এইরকম সভাতেই আমরা দলিল পাকা করে থাকি—এর চেয়ে পাকা দলিল আর হয় না।

পাখোম বললো, কিন্তু আমি শুনেছি একজন মহাজন সম্প্রতি আপনাদের এখানে এসেছিলো, এবং আপনারা তার কাছে জমি বিক্রি করে তাকে যথারীতি জমির হস্তান্তর দলিল দিয়েছেন। তাই আমার প্রার্থনা আমার বেলাতেও সেই ব্যবস্থা করুন।

স্টার্শিনা এবার সব বুঝতে পারলো।

সে বললো, তাই হবে। আমাদের এখানে একজন মুন্সি আছে। সে-ই সহরে গিয়ে প্রয়োজনীয় দলিল নিয়ে আসবে।

কিন্তু জমির দাম কতো দিতে হবে? পাখোম শুধোলো।

জমির দাম? স্টার্শিনা জবাব দিলো, দিন-প্রতি ১০০০ রুব্‌ল্ মাত্র।

'দিন-প্রতি' ব্যাপারটা পাখোম ঠিক বুঝতে পারলো না। সে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলো, তাতে কতোটা জমি হবে?

স্টার্শিনা বললো, ওভাবে আমরা জমি মাপি না। আমরা বিক্রি করি দিন হিসেবে। অর্থাৎ আপনি যতোটা জমি একদিনে ঘুরে আসতে পারবেন পায়ে হেঁটে তার সবটাই আপনার। এই হচ্ছে আমাদের মাপ, আর তার দাম হলো ১০০০ রুব্‌ল্।

পাখম অবাক হয়ে গেলো।

সে বললো, সেকী? এক দিনে একটা লোক তো অনেক ঘুরে আসতে পারে।

স্টার্শিনা আবার হাসলো।

সে বললো, বেশ তো, সে সব জমিই আপনার হবে। তবে, একটি মাত্র সর্ত আছে—মানে, যেখান থেকে আপনি হাঁটতে শুরু করবেন দিনমানে যদি সেখানে ফিরে আসতে না পারেন, আপনার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

পাখোম শুধোলো, কিন্তু কোন্‌খান থেকে হাঁটতে শুরু করবো আপনারা জানবেন কেমন করে?

স্টার্শিনা জবাব দিলো, আপনি যেখান থেকে খুশি হাঁটতে শুরু করুন, আমরা সেখানেই দাঁড়াবো। আমার কিছু লোক এবং আমি সেখানে উপস্থিত থাকবো আর আপনি হাঁটতে শুরু করবেন। আমাদের কয়েকটি যুবক ঘোড়ায় চড়ে আপনার পিছনে পিছনে যাবে, আর আপনি যেখানে যেখানে বলবেন সেখানেই একটা করে খুঁটি পুঁতবে। তারপর সেই খুঁটি-বরাবর লাঙল চালিয়ে দেওয়া হবে। আপনি যেখান দিয়ে খুশি বৃত্ত এঁকে যাবেন। শুধু, সূর্যাস্তের

আগেই আপনাকে যাত্রার স্থলে ফিরে আসতে হবে। যতোটা জমি আপনি ঘুরে আসতে পারবেন সবটাই হবে আপনার।

পাখোম সেই প্রস্তাবেই রাজি হলো। স্থির হলো, আগামী কাল খুব সকালে যাত্রা হবে। তারপর সকলে মিলে অনেক কথা বললো, অনেক 'কুমিস' পান করলো, অনেক ভেড়ার মাংস খেলো, আর অনেক চা। রাত পর্যন্ত উৎসব চললো। অবশেষে পাখোম শুতে গেলো পাখির পালকের বিছানায়, এবং বাকিরা কাল সকালে প্রথমে নদীর পারে জমায়েত হয়ে সূর্যোদয়ের আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে-যার ঘরে চলে গেলো।

পাখির পালকের বিছানায় শুয়েও, যে-জমির মালিক সে হবে তার চিন্তায় সারা রাত পাখোম দুচোখের পাতা এক করতে পারলো না।

সে নিজের মনে ভাবতে লাগলো, কাল সকালে ওদের প্রতিশ্রুত জমির অনেকখানিই দাগ কেটে নিতে পারবো। সারাদিনে আমি অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ ভার্স্ট পথ ঘুরে আসতে পারবো। আর পঞ্চাশ ভার্স্ট পথ ঘুরে আসতে মোটামুটি হিসেবে ১০,০০০ ডেসিয়াটিন জমি খুবই বেড় দিতে পারবো। তখন আর আমি কারো তোয়াক্কা করবো না। একটা জোড়া বলদে-টানা লাঙল আর দুজন মজুর রাখতে পারবো। সেরা জমিগুলো চাষ করবো আর বাকিটা থাকবে গো-চর।

সারা রাত পাখোম চোখ বুজোতে পারলো না। কিন্তু ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো সে। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা স্বপ্ন দেখলো। সে যেন একটা গাড়িতে শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছে বাইরে কে যেন হাসছে আর কথা বলছে। কে এমন করে হাসছে দেখবার জন্য

বাইরে গিয়ে সে দেখলো, মাটির উপর বসে আছে স্টার্শিনা। বুকের দুই পাশ হাত দিয়ে চেপে ধরে খুশির উল্লাসে সে গড়াগড়ি যাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই পাখোম হেঁটে তার কাছে গিয়ে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেলো লোকটি স্টার্শিনা নয়, যে মহাজন সম্প্রতি তার বাড়ি গিয়ে এই দেশের কথা বলেছিল সেই। তখন সে জিজ্ঞাসা করলো, কিছুদিন আগে আপনাকেই কি আমার বাড়িতে দেখিনি? বলতে-বলতেই মহাজনের বদলে দেখা গেলো ভল্‌গার ভাটি থেকে আসা সেই চাষীটিকে, যে তার পুরোনো গোলাবাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করেছিলো। সবশেষে পাখোম দেখলো, এ চাষীটি মোটেই চাষী নয়, এ হচ্ছে স্বয়ং শয়তান, মাথায় সিং আর পায়ে খুর। মাটিতে বসে হাসতে হাসতে কিসের দিকে যেন সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তখন পাখোম মনে মনে ভাবলো: ও কিসের দিকে চেয়ে আছে, আর এমন হাসছেই বা কেন? স্বপ্নেই সে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলো, একটি লোক—খালি পায়ে, শুধু শার্ট আর ব্রীচেস পরে—চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার মুখ কাগজের মতো সাদা। লোকটির দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে পাখোম দেখতে পেলো, লোকটি সে নিজে।

তার যেন দম আটকে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল ঘুম। জেগে উঠেও তার মনে হতে লাগলো, স্বপ্নটা বুঝি সত্যি! তখন সে চেয়ে দেখলো, ফর্সা হয়েছে কি না। দেখলো, ভোর হয়-হয়।

সে ভাবলো যাত্রার সময় হয়েছে। এদের ঘুম এবার ভাঙাতে হবে।

পাখোম বিছানা ছেড়ে উঠলো। টারাণ্টাস থেকে তার মজুরটিকে ডাকলো। তাকে বললো গাড়িতে ঘোড়াটা জুড়ে বাসকিরদের ডাকতে, কারণ মাঠে গিয়ে জমির মাপ শুরু করবার

সময় হয়েছে। বাসকিররাও ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিলো। স্টার্শিনাও এলো। তারা সবাই কুমিস দিয়ে প্রাতরাশ সারলো। পাখোমকেও চা দিতে চাইলো। কিন্তু সে আর অপেক্ষা করতে পারে না। বললো, যদি আমাদের যেতে হয় তো এখুনি চলুন। সময় হয়ে গেছে। কাজেই বাসকিররাও যাত্রা করলো—কেউ ঘোড়ায়, কেউ গাড়িতে। পাখোম তার মজুরকে নিয়ে চললো তার টারাণ্টাসে চড়ে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা হাজির হলো প্রান্তরে। একটা ছোট গোল পাহাড়ের দিকে সবাই এগিয়ে চললো। বাসকিরদের ভাষায় ঐ পাহাড়কে বলে শিকান। সবাই এসে জমায়েত হলো সেখানে। স্টার্শিনা পাখোমের পাশে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে চারিদিক দেখিয়ে বললো, এখান থেকে যতো জমি আপনি দেখতে পাচ্ছেন সব আমাদের। আপনি যেদিকে খুশি এগিয়ে যান। পাখোমের চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠলো, কারণ সমস্ত জমি ঘাসে ভর্তি, আর হাতের তালুর মত সমতল। শুধু যেখানে গভীর খাত আছে সেখানেই ঘাস নেই, তাছাড়া সর্বত্র বুক-সমান উঁচু ঘাস। স্টার্শিনা তার শেয়ালের চামড়ার টুপি খুলে শিকানের ঠিক মাঝখানে সেটাকে রেখে বললো, এই হলো চিহ্ন। এইখানে আপনার টাকা রাখুন। আপনি রওনা হবার পর আপনার চাকরটি এখানে থাকবে। এই চিহ্নিত জায়গা থেকে আপনি যাত্রা করবেন, আবার এখানেই ফিরে আসবেন। যতোটা জমি আপনি ঘুরে আসতে পারবেন সবটাই আপনি পাবেন।

পাখোম টাকা বের করে টুপিটার মধ্যে রাখলো। তারপর গায়ের ক্লোকটা খুলে ফেললো। পেটের উপরে বেল্টটা কসে বাঁধলো। ঝোলায় কিছুটা রুটি ভরে রেখে দিলো বুকের ভিতরে। জলের পাত্রটা স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধলো ঘাড়ের সংগে। পায়ের বুট দিলো টেনে। তৈরি হলো যাত্রার জন্য। সে নিজের মনে

ভাবতে লাগলো, সবদিকেই তো ভালো জমি, এখন কোন্ দিক আমি বেছে নেবো? অবশেষে সে ঠিক করলো, ঠিক আছে, সব দিকই যখন সমান, আমি হাঁটবো সূর্যোদয়ের দিকে। কাজেই সেই দিকে মুখ করে সে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। মনে মনে ভাবলো, এতোটুকু সময় আমি নষ্ট করবো না, কারণ বাতাস ঠাণ্ডা থাকতে থাকতেই আমাকে সবচেয়ে বেশি হেঁটে নিতে হবে।

তখন অশ্বারোহী বাসকিররাও শিকানে চড়ে পাখোমের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। সূর্যের প্রথম রশ্মি দিকচক্রে ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই পাখোম এগিয়ে চললো সুমুখের দিকে। অশ্বারোহীরা চললো তার পিছনে পিছনে।

সে হেঁটে চললো—আস্তেও নয়, আবার খুব জোরেও নয়। এক ভার্স্ট যাবার পরে সে থামলো। একটি খুঁটি সেখানে পোঁতা হলো। আবার সে চলতে লাগলো। প্রথম চলার জড়তা কাটিয়ে ক্রমেই সে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলো। আবার থেমে আরেকটি খুঁটি পুঁতিয়ে দিলো। সূর্যের দিকে তাকালো একবার। এতোক্ষণে আলো ছড়িয়ে পড়েছে গোল পাহাড়টার উপরে—সেখানে দাঁড়ানো মানুষগুলোর উপরে। হিসেব করে দেখলো, প্রায় পাঁচ ভার্স্ট সে হেঁটেছে। ক্রমেই শরীর গরম লাগছে। ওয়েস্ট-কোটটা খুলে আবার সে বেল্ট এঁটে দিলো। আরো পাঁচ ভার্স্ট গিয়ে সে থামলো। তখন সত্যি বেশ গরম পড়েছে। আবার সে সূর্যের দিকে চাইলো। প্রাতরাশের সময় হয়েছে। মনে মনে বললে, দিনের একভাগ তো শেষ হলো। আরো চার ভাগ এখনো বাকি। পথের দিক বদলাবার সময় এখনো হয়নি। তবু পায়ের জুতো এবার খুলে ফেলতে হবে। কাজেই সেখানে বসে জুতো খুলে সে আবার চলতে শুরু করলো। আরো সহজে

এখন সে হাঁটতে পারছে। মনে-মনে ভাবলো, আর পাঁচ ভার্স্ট পার হয়েই বাঁ দিকে মোড় ঘুরবো। যাত্রার স্থানটি বড়ই ভালো বাছা হয়েছে। ভারি ভালো জমি পাচ্ছি। কাজেই আবার সে সোজা এগিয়ে চললো। একবার পিছন ফিরে চাইলো। গোল পাহাড়টা এখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। উপরের লোকগুলোকে দেখাচ্ছে ছোট-ছোট পিঁপড়ের মতো।

অবশেষে সে ভাবলো, এতোক্ষণে বেড়টা বেশ বড়ই হয়েছে। এইবার মোড় ঘুরতে হবে। ঘাম ঝরছে শরীরে। তেষ্টাও পেয়েছে। ফ্লাস্ক থেকে জল খেলো খানিকটা। সেখানে আর-একটা খুঁটি পোতা হলো। তখন সে বাঁদিকে খাড়া বেঁকে গেলো। লম্বা লম্বা ঘাস আর সেই আগুন গরমের ভিতর দিয়ে চললো এগিয়ে। ক্রমেই সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে। সূর্যের দিকে চেয়ে বুঝলো, দুপুরের খাবার সময় হয়েছে। মনে মনে বললো, এবার নিশ্চয় একটু বিশ্রাম নিতে পারি। সেখানে দাঁড়িয়েই খানিকটা রুটি খেলো। কিন্তু মাটিতে বসলো না, কারণ সে ভাবলো, একবার বসলেই শুতে ইচ্ছে করবে, আর শুলেই পড়বো ঘুমিয়ে। কাজেই আরো খানিকটা জিরিয়ে আবার চলতে শুরু করলো। প্রথমটা হাঁটতে খানিকটা সুবিধে হলো, কারণ খাবার খেয়ে সে খানিকটা জোর ফিরে পেয়েছে। কিন্তু সূর্য প্রখরতর হয়েছে, একটুখানি হেলেছে সন্ধ্যার দিকে। পাখোমের শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে এবার, তবু সে ভাবলো, এক ঘণ্টার কষ্টে আমার শতেক কড়ি লাভ।

বৃত্তের এই অংশের প্রায় দশ ভার্স্ট পার হয়ে সে ফিরবার পথে বাঁদিকে বাঁক নেবে, এমন সময় তার চোখে পড়লো, একটা শুকনো খাতের চারদিক ঘিরে রয়েছে সুন্দর একটুকরো জমি। এটুকু ছেড়ে যাওয়া বড়ই দুঃখের কথা। সে ভাবলো, চমৎকার তিসি

হবে ও জমিতে। কাজেই সে সোজা এগিয়ে চললো সেই খাত পর্যন্ত। সেখানে একটা খুঁটি পোতা হলে চাকার মতো ঘুরে চললো ভিতরের দিকে। শিকানের দিকে চেয়ে দেখলো, লোকগুলো একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ওরা পনেরো ভার্স্টের চেয়ে কম দূরে হবে না। . মনে মনে বললো, মোট পথের তুটো লম্বা অংশ তো পার হয়েছি। এবার শেষ অংশটা পার হতে হবে খুব সোজা পথে। কাজেই এবার খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগলো সে। আবার চাইলো সূর্যের দিকে। সান্ধ্য আহারের সময় হয়ে এসেছে, অথচ মাত্র তুটো ভার্স্ট পথ সে পার হয়েছে। যাত্রার স্থান এখনো তেরো ভার্স্ট দূরে। সে মনে মনে বললো, রাস্তা যতোই খারাপ হোক এবার সোজা ফিরে যাবো। ফিরবার পথে আর নতুন জমি নিতে চেষ্টা করবো না। যা নিয়েছি তাই যথেষ্ট। পাখোম সোজা এগিয়ে চললো গোল পাহাড়ের দিকে।

সোজা পথেই সে এগিয়ে চলেছে। তবু হাঁটতে এখন বড় কষ্ট হচ্ছে। পা তুটো কেটে-ছিঁড়ে গিয়ে খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে এখন। পা তুটো যেন আর চলতেও চায় না। কাঁপছে থর থর করে। একটু বিশ্রামের বিনিময়ে যে-কোনো কিছু দিতে সে এখন প্রস্তুত। অথচ সে জানে, সূর্যাস্তের আগে গোল পাহাড়ে পৌঁছতে হলে বিশ্রাম করা তার চলবে না। সূর্য তো অপেক্ষা করে থাকবে না! কে যেন গাড়ি চালকের মতো তাকে চাবুক মেরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে সে যেন টলে টলে পড়ছিলো। নিজের মনেই সে কথা বলতে লাগলো বার বার, নিশ্চিয়ই আমি হিসেবে ভুল করি নি? দ্রুত চলেও সময়ে ফিরতে পারবো না, নিশ্চয়ই এতো জমি আমি ঘুরি নি? এখনো কতো পথ পাড়ি দিতে হবে, অথচ আমি যে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি! তবে কি আমার সব অর্থ, সব পরিশ্রম বৃথা যাবে? দেখা যাক, সাধ্যমতো চেষ্টা তো করি!

আবার শক্তি সঞ্চয় করে পাখোম দৌড়োতে শুরু করলো। পা ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে, তবু সে দৌড়োচ্ছে, দৌড়োচ্ছে, আরো দৌড়ে চলেছে। ওয়েস্ট-কোট, জুতো, ফ্লাস্ক, টুপি—সব ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ভাবলো, হায়, সব কিছু দেখে আমি কতো খুশিই না হয়েছিলাম! এখন তো সবাই গেলো! সূর্যাস্তের আগে কিছুতেই আমি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারবো না! ভয় পাবার দরুণ তার দম আরো ফুরিয়ে গেলো। তবু সে দৌড়োতে লাগলো। শার্ট আর ব্রীচেস ঘামে ভিজে গায়ের সংগে লেপ্টে গেলো। গলা উঠলো কাঠ হয়ে। বুকের ভিতর কে যেন একজোড়া হাপর টানছে, হৃৎপিণ্ডের ভিতরে মারছে হাতুড়ির ঘা। পা দুটো আর সইছে না দেহের ভার, ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সেদুটো যেন তার নিজের পা নয়! জমির কথা আর এখন তার মনে নেই। পরিশ্রমের দরুণ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাই এখন তার একমাত্র চিন্তা। তবু, মৃত্যুর ভয় যতোই থাকুক, তবু সে থামতে পারলো না। সে ভাবতে লাগলো, এতো পথ চলে এখন থামবো! ওরা যে তাহলে বোকা মনে করবে আমাকে! এই সময় সে শুনতে পেলো, বাশকিররা চিৎকার করে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। তাদের চিৎকার শুনে তার মনে জাগলো নতুন বল। শেষ শক্তিটুকু নিয়ে সে দৌড়োতে লাগলো সামনে—আরো সামনে। সূর্য তখন দিক-চক্ররেখা ছোঁয়-ছোঁয়। হায়! সে প্রায় লক্ষ্যস্থলে এসে পৌঁছেছে! সে দেখতে পেলো, গোল পাহাড়ের উপর থেকে সবাই হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। সে দেখতে পেলো, শেয়ালের চামড়ার টুপিটা পড়ে রয়েছে মাটিতে, তার মধ্যে রয়েছে টাকা, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্টার্শিনা। হঠাৎ পাখোমের মনে পড়লো স্বপ্নের কথা। সে ভাবলো, তবু এখন আমার অনেক জমি, শুধু ভগবান আমাকে নিরাপদে গিয়ে সেই জমির উপর

বেঁচে থাকতে দিলেই হয়। কিন্তু আমার মন বলছে, নিজেকে আমি খুন করেছি! তবু সে দৌড়তে লাগলো। শেষবারের মতো চাইলো সূর্যের দিকে। প্রকাণ্ড লাল সূর্যটা মাটি ছুঁয়েছে, ডুবতে বসেছে দিকচক্ররেখার নিচে। পাখোম যখন গোল পাহাড়ে পৌঁছলো সূর্য তখন অস্ত গিয়েছে। আঃ! বলে গভীর হতাশায় চেঁচিয়ে উঠলো সে, কারণ সে ভাবলো যে সবই গেলো। সহসা তার মনে পড়লো, গোল পাহাড়ের উপরে তার চেয়ে উঁচুতে যারা রয়েছে তাদের কাছে সূর্য হয়তো এখনো অস্ত যায় নি! ছুটলো সে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে। হাত-পা দিয়ে পাহাড়টাকে আঁকড়ে ধরে উঠতে উঠতে সে দেখলো, টুপিটা তখনো সেখানে আছে। হঠাৎ পা হড়কে নিচে পড়ে গেল। পড়তে পড়তেও একবার দু-হাত বাড়িয়ে দিলো টুপিটার দিকে—সেটাকে স্পর্শ করলো একবার।

স্টার্শিনা চিৎকার করে উঠলো, হায় যুবক, অনেক জমি তুমি পেলে বটে!

পাখোমের মজুর ছুটে গেলো প্রভুর কাছে। তাকে তুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার মুখ থেকে রক্তের স্রোত বইছে। পাখোম মরে গেছে। আতংকে চিৎকার করে উঠলো মজুরটা। স্টার্শিনা কিন্তু বসেই রইলো মাটিতে—দুই হাত ঝুলিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলো।

অবশেষে সে উঠে দাঁড়ালো, মাটি থেকে একখানা কোদাল তুলে নিয়ে মজুরটার দিকে ছুঁড়ে দিলো।

শুধু বললো, ওকে কবর দাও।

বাশকিররা উঠে চলে গেলো। রইলো শুধু মজুরটা পাখোমের মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত শরীরটা যতোখানি লম্বা সেই মাপের—তিন রুশ 'এল'১—একটা কবর খুঁড়ে সে তাকে সমাধি দিলো।

অনুবাদ—মণীন্দ্র দত্ত

১। এক এল—আড়াই হাত

জাদুকর

আনাতোল ফ্রাঁস

রাজা লুইয়ের আমলে ফ্রান্সের কম্পেঅঁতে বারনাবি নামে এক বাজিকর থাকতো : সহর থেকে সহরে গিয়ে চমৎকার সব ভানুমতীর খেলা দেখানোই ছিলো তার পেশা।

যেদিন আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকতো, সেদিন সে বেরোতো তার বহুকালের পুরোনো, জীর্ণ এক কারপেট নিয়ে, তারপর সহরের কোনো ফাঁকা চত্বরে সেটা পেতে হাত-পা নেড়ে এক বক্তৃতা দিতো যাদুবিদ্যে সম্পর্কে। অবশ্য যে-সব কথা সে বলতো, একটাও তার নিজস্ব ছিলো না, সব সে শিখেছিলো তার গুরু আরেক বাজিকরের কাছ থেকে, এবং গুরু একদা যে-সব কথা বলে গিয়েছিলেন, তার একটি শব্দও না পাল্টে সে হুবহু সেই কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করতো। তার এই বক্তৃতা শুনে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার চারদিকে ছোটদের আর ভবঘুরেদের ভিড় জমে যেতো। আর তখন সে শুরু করতো খেলা দেখাতে। নানা ধরনের অবাক-করা অঙ্গভঙ্গি করে, অসাবধানের মতো সে তার নাকে ডগায় রাখতো এক টিনের পাত্র। অবশ্য, এতো সব দেখেও, ভিড়ের লোকেরা প্রথমটা উদাসীনই থাকতো তার সম্পর্কে। এমন কী আর নতুন খেলা দেখাচ্ছে বারনাবি? কিন্তু, যখন হাতের উপর ভর দিয়ে মাথা নিচেয় রেখে সে ছ-টা তামার বল ছুঁড়তো হাওয়ায়, চকচকে তামার বলগুলি তখন সোনালি রোদ্দুরে উঠতো ঝকমকিয়ে, আর তারপরেই সে পা দিয়ে লুফতে শুরু করতো সেই ঝকমকানো বলগুলি; আর তখন দর্শকের মধ্য

থেকে উঠতো প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি—কিংবা, যখন সে নিজেকে পিছনে বাঁকাতে-বাঁকাতে পায়ের গোড়ালি দিয়ে ছুঁতো ঘাড়ের বাঁকানো রেখা, তার সমস্ত শরীর যখন দেখাতো এক জ্যান্ত গাড়ির চাকার মতো, তখন সেই ভঙ্গিতেই এক ডজন ছোরার এক আশ্চর্য বাজি দেখাতো, আর তখনই ভিড়ের মধ্যে উচ্ছল গুনগুনানি জাগতো তার প্রশংসায়, আর তার কারপেটের উপর টাকাকড়ির বর্ষণ শুরু হয়ে যেতো তখন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র নিজের শক্তিকে সম্বল করে জীবিকা নির্বাহ করতে যারা উন্মুখ তাদের মতোই কম্পেআঁর বারনাবিকে প্রাত্যহিকের খরচা ওঠাতে ভয়ানক পরিশ্রম করতে হতো। আমাদের পূর্বপুরুষ আদমের একটিমাত্র ভুলের জন্য বার-নাবিকেও অনেক শাস্তি পেতে হতো,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কেবলমাত্র রুটি রোজগারের চেষ্টা করাতেই নিষ্কৃতি ছিলো না।

তার উপর ইচ্ছে থাকলেও সবসময় খেলা দেখাতে পারতো না। সূর্যের উষ্ণ রোদ্দুর আর ঝলসানো সোনালি আলোর দরকার হতো খেলা দেখাবার সময়;—অনেকটা যেন গাছের মতো—গাছের কাছে ফুল আর ফল চাইলে তাকে রোদ আর আলো দিতেই হবে। শীতের সময়ে তার অবস্থা হতো মৃত গাছের মতো,—পাতা-ঝরা গাছের কঙ্কাল যেন সে তখন। বরফ-জমানো মাটিতে খেলা দেখানো অসম্ভব হলো তার পক্ষে। মারি দ্য ফ্রাঁস*-কথিত তৃণভুকের মতো শীতের শেকল তারও ক্ষুধা ও শৈত্যের কারণ হতো। কিন্তু তার স্বভাব ছিলো সহজ-সরল; নিজের সমস্ত দুর্দশাকেই সে নিঃশব্দে সহ্য করবার চেষ্টা করতো।

* মারি দ্য ফ্রাঁস ফ্রান্সের মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে উজ্জ্বল-চিহ্নিত। ঈশপের মতো তিনিও একশো তিরিশটি নীতিকথা রচনা করেছিলেন, এবং, বলা নিষ্প্রয়োজন, সবগুলি নীতিকথাই বিশ্বসাহিত্যের সোনালি সম্পদ।

ধনসম্পত্তির উদ্ভব কী করে হয়, কিংবা মানুষে-মানুষে এই অসখ্যের কারণ কী, এ সম্পর্কে সে মাথা ঘামাতো না মোটেই। সে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতো যে, যদি বর্তমান জীবন তার দুঃসহ কঠিনতায় ভরা থাকে, তবে তার ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চয়ই, তার সাম্য রক্ষার জন্য হলেও, তাকে সুখী করবে.: আর বোধহয় এই আশাই তাকে এতোকাল সমস্ত দুরবস্থার মধ্যে জীইয়ে রেখেছিলো। যারা শয়তানের কাছে সত্তাকে বিক্রি করে দেয়, তাদের মতো চতুর ছিলো না সে। আবার ঈশ্বরের জন্যও সে কখনো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো না, সৎভাবেই জীবন কাটাবার চেষ্টা করতো।

বিবাহ করেনি বলে সে একলা ছিলো, এবং কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা উঠলেই সে শিউরে উঠতো মনে মনে, কেননা, নারী যে মানবের শত্রু, একথা তো বাইবেলের স্যামসন-কাহিনীতেই সোনালি হরফে লেখা আছে।

সত্যি বলতে কি, তার বাসনা কখনো ঐদিকে উন্মুখই হতো না, বরং মাতাল না হলেও, মাঝে মাঝে উষ্ণ দিনে সুরাপান করতে তার ভালোই লাগতো। এক কথায়, সে ছিলো এক সৎ, ধর্মভীরু মানুষ, এবং প্রাণমন দিয়ে ভক্তি করতো মানবপুত্রের জননী মারিয়াকে। গির্জেয় ঢুকলেই একবার-না-একবার সে নতজানু হয়ে যীশু-জননীর সামনে বসবেই, আর স্পষ্ট, নম্র, আবেগময় উচ্চারণে প্রার্থনা করবে: যতোদিন না ঈশ্বরের ইচ্ছেয় আমার মৃত্যু হয়, ততদিন তোমার সতর্ক সস্নেহ দৃষ্টি রেখো আমার উপর, আর, মৃত্যুর পরে আমি যাতে স্বর্গের সুখ উপভোগ করতে পারি, সেদিকেও যেন দৃষ্টি থাকে তোমার।

সেদিন সারাদিন বৃষ্টি হবার পরে সন্ধ্যাবেলার দিকে আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছিলো। বারনাবি তার জাদুবিদ্যের সাজসরঞ্জাম পুরোনো কারপেটে মুড়ে বগলে নিয়ে বিষণ্ন মনে;

অবসন্ন পায়ে চলেছে আশ্রয়ের সন্ধানে,—সারাদিন তার খাওয়া হয়নি, রাত্রেও না-হবারই প্রবল সম্ভাবনা,—এখন কেবল কোনো জায়গায় রাত্রে মাথা গুঁজতে পারলেই সে খুশি। যেতে-যেতে রাস্তায় তার দেখা হয়ে গেলো গির্জের পাদ্রীর সঙ্গে। বারনাবি যে-দিকে যাবে, বিশপও সেদিকেই যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো বারনাবি। এক সঙ্গে পথ চলতে-চলতে দু-জনে আলাপ করতে শুরু করে দিলে।

বন্ধু,—বিশপ বললেন,—তোমার পোশাক সবুজ রঙের কেন? তুমি কি কোনো নাটকে ভাঁড়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছো?

উঁহু,—উত্তর দিলে বারনাবি,—আমি ভাঁড় নই। আমার নাম বারনাবি। নানারকম বাজি দেখিয়ে বেড়ানো আমার পেশা। বাজিকর কথাটা শুনতে বোধহয় পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো হতো, যদি প্রত্যেকদিন আমার খাবার জুটতো। কিন্তু তা তো আর হবার নয়—

বিশপ বললেন: বন্ধু, সর্বদাই কোনো কথা বলবার আগে বিবেচনা করে নিয়ো। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে গির্জের যাজক হবার চাইতে পৃথিবীতে ভালো আর কিছু হতে পারে না। যাঁরা যাজক, তাঁরা প্রতিমুহূর্তেই মানবপুত্রের, সাধুসন্তদের ও ঈশ্বরজননীর প্রশংসায় মুখর থাকেন। আর, সত্যি বলতে কি, বিশপের জীবন যেন ঈশ্বরের এক অনিঃশেষ স্তোত্র।

ফাদার,—বারনাবি উত্তর করলে,—একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে আমি কিছুই জানিনে। আমার সঙ্গে আপনার তো কোনোরকম তুলনাই হতে পারে না। নাকের ডগায় একটা তামার পয়সা রেখে তার উপরে একটা ছড়ি রেখে নাচাতে পারায় কিছুটা প্রশংসার থাকতে পারে বটে, কিন্তু

যাজকদের সঙ্গে কোনক্রমেই এর তুলনার কথাই ওঠে না। ফাদার, আমি সত্যিই সারাদিন ধরে ঈশ্বরের উপাসনা করতে চাই, চাই যীশু-জননী মারিয়ার স্তোত্র পাঠ করতে, আর যদি তা পারতুম, তবে সবচেয়ে ভালো হতো হয়তো; কেননা, আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা সমস্তই আমি সমর্পণ করেছি মারিয়ারই কাছে। গির্জের কাজ পেলে এই ভানুমতীর খেলা-দেখানো আমি অনায়াসেই ছেড়ে দিতে পারি। অবশ্য এই খেলা দেখিয়েই ছ-সাতশো গ্রাম-সহরে আমি পরিচিত; কিন্তু জনপ্রিয় হবার চাইতে ঈশ্বরের প্রিয় হওয়াটাই বেশি লোভনীয় নয় কি?

বাজিকরের সরলতা বিশপের অন্তর স্পর্শ করলো। বিচারশক্তি তাঁর যথেষ্ট ছিলো, আর সেই কারণেই বারনাবির ভিতরে তিনি দেখতে পেলেন এমন লোক, যাদের সম্বন্ধে বাইবেলে বলা আছে—শান্তি তাদের সঙ্গী হোক। এবং সেই কারণেই তিনি উত্তর করলেন: বন্ধু বারনাবি, আমি মঠের অধ্যক্ষ। তুমি আমার সঙ্গে এসো, যাতে তুমি গির্জের কাজ পাও আমি সেই ব্যবস্থা করবো। ঈজিপ্টের সেণ্ট মারিকে যিনি মরুভূমির মধ্যে পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁকেই আদর্শ করে আমি চেষ্টা করবো তুমি যাতে মুক্তির সন্ধান পাও।

এমন ভাবেই বারনাবি বিশপ হল শেষ পর্যন্ত। যে-মঠে হল, সেই মঠের অন্যান্য বিশপরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির ব্যবহার করে হোলি ভার্জিনের উপাসনা করতো।

মঠের অধ্যক্ষ নিজে তাতে অংশ গ্রহণ করতেন, ঈশ্বর-জননীর উপাসনার মধ্যে জটিল তত্ত্বের সমাহার ঘটিয়ে সেবিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে।

ব্রাদার মরিস সিদ্ধ, চতুর হাতে তা পার্চমেণ্ট কাগজে নকল করে রাখতেন।

ব্রাদার আলেকজাঁদ্রে সেই পার্চমেণ্ট কাগজের চারপাশ সূক্ষ্ম কারুকাজে অলঙ্কৃত করতেন। তিনি যে-সব ছবি আঁকতেন, তারই অন্যতম হল: স্বর্গের রানী বসে আছেন রাজা সলোমনের সিংহাসনে, আর তাঁর পাদদেশে চারটে সিংহ প্রহরায় রত: মাথায় তাঁর জ্যোতির মুকুট, আর সেই মুকুটের চারদিকে উড়ছে সাতটি রাজহাঁস—পবিত্রতার সাতটি প্রতীক: ভয়, ভক্তি, জ্ঞান, শক্তি, উপদেশ, অনুভূতি, পাণ্ডিত্য;—সহচারী হিসেবে তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে ছ-জন কুমারী, চুল তাদের সোনালি: আর তাদের নাম হল বিনয়, বিচারশক্তি, সমর্পণ, শ্রদ্ধা, কৌমার্য ও আনুগত্য; তাঁর পায়ের কাছে নগ্ন, উজ্জ্বল, শ্বেতবর্ণ দুই ছোট মূর্তি আবেদনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে: তারা হল সেই আত্মা, যারা নিজেদের সত্তার স্বাস্থ্যের জন্য তাঁর সর্বশক্তিমান করুণা অনুনয় করছে,—এবং তাদের যে বিফল হতে হচ্ছে না, তা বলাই বাহুল্য। অন্য-আরেক পাতায়, ঠিক এর বাঁদিকের পৃষ্ঠায়, ব্রাদার আলেকজাঁদ্রে মারিয়ার সুমুখে ঈভকে এঁকেছিলেন, যাতে লোকে অনুভব করতে পারে পাপ আর তার পরিণাম, নারীর অসহায় দুরবস্থা এবং কুমারী জননীর পবিত্র গৌরব। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে অন্যতম হলো, প্রাণসঞ্চারী বারিধারার উৎস, ঝরনাধারা, লিনি, সূর্য, ক্যানটিকল-কথিত ঘেরানো উদ্যান, স্বর্গের দুয়ার আর ঈশ্বরের সহর; এবং সমস্তই বস্তুতপক্ষে, যীশু-জননীরই প্রতীক।

ব্রাদার মারবোও যেন মারিয়ার প্রিয় সন্তানদের অন্যতম। সারাদিন তাঁর কাটে পাথর কেটে মূর্তি বানাতে, আর, সেই কারণে তাঁর দাড়ি, ভুরু, চুল ধুলোবালিতে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিলো, আর তাঁর বিস্ফারিত চোখ সর্বদাই থাকতো অশ্রুপূর্ণ। কিন্তু বুড়ো হলেও তাঁর শক্তি আর আনন্দ এখনো অন্তর্হিত হয়নি,

আর এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, স্বর্গের রানী এখনো তাঁর ভৃত্যকে সতর্ক স্নেহে অবলোকন করেন। মারবো তাঁর এক মূর্তি তৈরি করেছিলেন : সিংহাসনে বসে আছেন কুমারী মাতা, হীরে চুনি পান্নায় এক ঝলমলানো মুকুট তার কপালে, আলো ফেটে বেরোচ্ছে তা থেকে। এবং প্রভূত প্রযত্নে পোশাকের ভাঁজের নিচে তাঁর পা-দুটি ঢেকে দেয়া হয়েছিলো, যার সম্বন্ধে ঈশা বলেছিলেন, আমার প্রিয় যেন এক বন্ধ উদ্যান। কখনো-কখনো আবার তাঁকে তিনি আঁকতেন সুন্দর শিশু হিসেবে, মনে হতো তিনি যেন বলতে চাইছেন : প্রভু, আমার প্রভু!

তা ছাড়া মঠে ছিলেন অনেক কবি, তাঁরা লাতিনে স্তোত্র রচনা করতেন—গদ্যে আর পদ্যে—পবিত্র জননীর সম্মানে। আর, এ ছাড়া ছিলেন পিকার্ডি থেকে আসা একজন গায়ক : ছন্দ-দোলানো কবিতায় তিনি রচনা করেছিলেন মির‍্যাকল্‌স্ অব্ আওয়ার লেডি। আর সুর দিয়ে তিনি উঁচু গলায় স্থূল উচ্চারণে গাইতেন এইসব গান।

এই প্রশংসনীয় প্রতিযোগিতা আর কঠিন পরিশ্রমের এতো সব সোনালি ফসল! বারনাবি তার অজ্ঞানতার জন্য মনে-মনে মুষড়ে পড়লো।

মঠের চারদিকের দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট বাগানে ঘুরতে-ঘুরতে একদিন সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপন মনে বললে : হায়! আমার দুঃখের আর ক্ষান্তি নেই কোথাও! কিন্তু অন্যদের মতো আমি তো পারিনে দেবী মারিয়ার প্রশংসা করতে, অথচ তাঁকেই আমি সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি! হায়, কী হতভাগ্য আমি! এতো মূর্খ যে, কোনো সহজ শিল্পকলা পর্যন্ত আমার আয়ত্তে নেই, কোনো স্তোত্র-রচনা সাধ্যে নেই আমার, জানিনে কী করে ছবি আঁকতে হয় কিংবা পাথরের মূর্তি তৈরি করা যায়,

জানিনে গান পর্যন্ত গাইতে! হায়, কিছুই নেই আমার! কিছুই আমি জানিনে!

এইসব ভেবে অতলে তলিয়ে গেলো সে, তার মনের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়লো যেন, দুর্দশার আর কোনো সীমা থাকলো না তার।

কিন্তু একদিন সন্ধেবেলায়, মঠের সবাই যখন অবসর সময়ে বসে আলোচনা করছেন, তখন সে শুনতে পেলো একজন বিশপ এমন এক ধার্মিক ব্যক্তির কথা বলছেন, যে আভে মারিয়ার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারতো না। তার অজ্ঞানতার জন্য জীবিতকালে তাকে সকলের ঘৃণ্যই হতে হয়েছিলো, কিন্তু মৃত্যুর পর তার শব থেকে ফুটেছিলো পাঁচটি গোলাপ ফুল 'মেরি' নামের সম্মানে,—আর এইভাবেই তার পবিত্রতার প্রসিদ্ধি হয়েছিলো লোকসমাজে।

এই জনশ্রুতি শুনতে-শুনতে বারনাবি আরেকবার মারিয়ার সীমাহীন করুণার বিষয়ে সচেতন হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেই পবিত্র মৃত্যুর অন্তর্নিহিত উপদেশ থেকেও তার মন সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পেলো না, বরং উৎসাহে তার মন পূর্ণ হচ্ছে আবার। তীব্রভাবে সে উন্মুখ হল মারিয়ার সম্মান উদ্‌যাপনে।

কিন্তু কী করে যে সে এই কাজ সম্পন্ন করবে, তার কোনো পথ সে খুঁজে পেলো না। দিনের পর দিন কেবলই যন্ত্রণা তার হৃদয় ছিন্নভিন্ন করতে লাগলো। অবশেষে এলো এমন এক আশ্চর্য সকাল, যেদিন ভার ঘুম ভাঙলো প্রচুর আনন্দে আর উৎসাহে; তাড়াতাড়ি পা চালালো গির্জের উপাসনা-ঘরের দিকে, আর একঘণ্টারও বেশি থাকলো সেখানে—একা, একেবারে একাই সে উপাসনা-ঘরে কাটালো অতোক্ষণ। দুপুরবেলা খাবার পরেও আবার গির্জের উপাসনা-ঘরে গিয়ে হাজির হলো।

এবং সেই মুহূর্ত থেকে শুরু করে এর পর থেকে প্রত্যহ সে উপাসনা-ঘরে অনেকক্ষণ ধরে কাটাতে লাগলো। বেছে-বেছে কেবল সেই সময়েই সে ওখানে যেতো যখন তা নির্জন থাকে, এবং অন্যান্য বিশপদের কলাচর্চায় ব্যস্ত থাকার সুযোগ নিয়ে সে একলাই থাকতো ওখানে। আর সেদিন থেকে, যেন মন্ত্রবলেই, তার সমস্ত বিষণ্ণতা অপসৃত হয়ে গেলো; আর সে কখনো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতো না শুধু-শুধু। এবং সেই কারণেই অন্যান্য বিশপদের মধ্যে জাগলো কৌতূহল। তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে থাকলেন, অমন ভাবে একা-একা ব্রাদার বারনাবি উপাসনার কোঠায় গিয়ে কী করেন—সেকথা কেউ জানে কি না। কিন্তু কেউই কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না।

মঠাধ্যক্ষ,—যাঁর দায়িত্ব হলো মঠের ভেতর কী হয় না-হয় তার পুংখানুপুংখ খবর রাখা,—ঠিক করলেন গোপনে তিনি বারনাবির উপর লক্ষ্য রাখবেন। সেই কারণেই একদিন বারনাবি যখন উপাসনার ঘরে একা, তখন তিনি দুজন বিশপের সঙ্গে দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালেন, সে কী করে দেখবার জন্য।

বারনাবিকে দেবী মারিয়ার বেদীর সামনে দেখতে পেলেন তিনি। মাথা তার ভূমি স্পর্শ করেছে, পা দু-টি শূন্যে: এক-ডজন ছোরা আর ছ-টা তামার বল নিয়ে সে খেলা দেখাচ্ছে। একদা যে-সব বাজি তাকে বিভিন্ন সহরে বিখ্যাত করে তুলেছিলো, তাই সে মনপ্রাণ দিয়ে দেখাচ্ছে দেবী মারিয়াকে। তার সমস্ত সাধ্য আর ক্ষমতা দিয়ে সে যে সেইভাবেই যীশু-জননীর পুজো করছে, সে-কথা বুঝতে না পেরে বিশপ দু-জন এমন অধার্মিক আচরণের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে উঠলেন।

বারনাবির সারল্য মঠাধ্যক্ষের অগোচর না থাকলেও তিনি ভাবলেন যে বারনাবির মাথার আর ঠিক নেই, সে নির্ঘাৎ পাগল

হয়ে গেছে। তাঁরা তিনজনে বারনাবিকে উপাসনা-ঘর থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেবার জন্য তার দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, দেবী মারিয়া* তাঁর বেদী থেকে ধীর পায়ে নেমে এসে তাঁর আকাশ-রঙের পোশাকের প্রান্ত দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছেন বাজিকরের কপালের ঘাম।

মঠাধ্যক্ষ প্রণাম করলেন দেবী মারিয়াকে, উচ্চারণ করলেন বাইবেলের পবিত্র উক্তি : যাদের হৃদয় সরল, তারা পবিত্র : কারণ তারাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়।†

নতমস্তকে অন্য বিশপেরা উচ্চারণ করলেন : আ মেন।

অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

* ফরাসি বানান ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুযায়ী যীশু-জননী 'মেরি'র রূপান্তর হলো মারি (বানান পাঁচ অক্ষরে—Marie) বা মারিয়া (এরও বানান পাঁচ অক্ষরে—Maria)

† Blessed are the simple-hearted : for they shall see the Lord.

এ্যাসপিনওয়ালের আলোকস্তম্ভ-রক্ষী

হেনরিখ্‌ সিনকেভিচ্‌

[এক]

পানামার কাছে এ্যাসপিনওয়ালের আলোকস্তম্ভ-রক্ষী একদা কোনো চিহ্ন না রেখে অদৃশ্য হলো। এক ঝড়ের সময় থেকে নিখোঁজ বলে সবাই ধারণা করেছিলো, সেই ছোট্ট পাথুরে দ্বীপের একেবারে ধার ঘেঁসে সে দাঁড়িয়ে ছিলো আর ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সেই দ্বীপের উপরেই রয়েছে আলোক-স্তম্ভটি। এ-ধারণা আরো দৃঢ় হলো যখন পরের দিন তার ডিঙিটাকে সেই সব পাথরের কোনো খাঁজের মধ্যে পাওয়া গেলো না।

আলোকস্তম্ভ-রক্ষীর পদ শূন্য হয়ে পড়লো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই শূন্য আসনে কাউকে বসানো দরকার। স্থানীয় জলযানের এবং ন্যু-ইয়র্ক থেকে পানামা পর্যন্ত যে-সব জাহাজ আসে তাদের জন্য এই আলোকস্তম্ভের একান্ত দরকার। মসকুইটো উপসাগরের ভিতর অসংখ্য চোরা পাহাড় আছে। তাদের ভিতর দিয়ে দিনের বেলাতেও জাহাজ চালানো কঠিন; আর রাত্রে, বিশেষত এই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সূর্যের উত্তাপে, এমন ঘন কুয়াশা ওঠে যে তা প্রায় অসম্ভব। সে-সময় অসংখ্য জাহাজকে পথ দেখায় একমাত্র এই আলোকস্তম্ভ।

পানামাতে যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতের উপরই নতুন এক আলোক-স্তম্ভ-রক্ষী খুঁজে বার করার ভার পড়লো। এ-কাজ সহজ নয়; কারণ, প্রথমত বারো ঘণ্টার মধ্যেই নতুন লোক খুঁজে কাজে

লাগানো একান্ত দরকার; দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তি অসাধারণ বিবেক-সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন—যেমন-তেমন করে প্রথম আবেদন-কারীকেই কাজে লাগানো যায় না; আর তৃতীয়ত, এ-কাজের জন্য লোক পাওয়া সহজ নয়। আলোকস্তম্ভের উঁচু মিনারের জীবন ভারি কঠিন; সে-জীবন এই দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে একেবারেই লোভনীয় নয়। এখানকার লোকেরা ভালোবাসে কুঁড়েমি আর নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রা। আলোকস্তম্ভ-রক্ষীকে প্রায় বন্দীর মতোই থাকতে হয়। রবিবার ছাড়া অন্য কোনো দিন সে সেই পাথুরে দ্বীপ ছেড়ে যেতে পারে না। এ্যাসপিনওয়াল থেকে দিনে একবার একটি ডিঙি তার খাদ্য ও পানীয় পৌঁছে দিয়েই ফিরে যায়। সেই তিন বিঘে দ্বীপের মধ্যে আর জনমানব নেই। রক্ষীকে সেই আলোকস্তম্ভের মধ্যেই থাকতে হয়। জায়গাটিকে গুছিয়ে রাখা তার একার দায়িত্ব। দিনের বেলায় আবহাওয়ার চাপ-মাপা যন্ত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী নানা রঙিন পতাকা ঝুলিয়ে তাকে সংকেত জানাতে হয়। সন্ধ্যায় সে লণ্ঠন জ্বালে। লণ্ঠন জ্বালানোর ব্যাপারটা এমনিতে খুব পরিশ্রমের নয়। কিন্তু সেই লণ্ঠন আছে আলোকস্তম্ভের একেবারে চুড়োয় আর সেখানে পৌঁছতে হলে খুব উঁচু উঁচু চারশোর বেশি সিঁড়ির ধাপ ভেঙে উঠতে হয়। এক-একদিন আবার এইরকম ওঠা-নামা অনেকবার করতে হয়।

মোটামুটিভাবে এখানকার জীবন গৃহত্যাগী বৈরাগীর মতো—শুধু বৈরাগী কেন, তার চেয়েও বেশি—এখানকার জীবন সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো কঠিন। তাই বর্তমান রক্ষীর জায়গায় নতুন লোক কোথায় পাবেন এই নিয়ে মিস্টার আইজ্যাক ফ্যাল্‌কন-ব্রিজের যে নিদারুণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো তার যথেষ্ট সঙ্গত কারণই রয়েছে। তাই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিন যখন একটি লোক

ঐ কাজের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো তখন তাঁর কী রকম যে আনন্দ হয়েছিলো তা সহজেই অনুমান করা যায়। মানুষটি বৃদ্ধ, সত্তর কিংবা তার চেয়েও বেশি তার বয়স। তবু চমৎকার সুস্থ চেহারা, একটুও নুয়ে পড়েনি। তার হাবভাব আর হাঁটবার ভঙ্গী সৈনিকদের মতো। সমস্ত চুল তার সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে, ক্রেওলদের মতো কালো তার মুখ; কিন্তু তার নীল চোখ দেখে মনে হয়, এই দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসী সে নয়। তার সমস্ত মুখের মধ্যে একটি করুণ ক্লান্ত ছাপ, কিন্তু সততার অভাব নেই।

প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে ফ্যাল্‌কনব্রিজের পছন্দ হয়ে গেলো। এবারে শুধু পরীক্ষা করার প্রয়োজন। তাই নিম্নলিখিত কথোপকথন শুরু হলো:

তুমি কোন্ দেশের লোক?

আমি পোল।

এতদিন কোথায় কাজ করেছো?

নানা জায়গায়।

আলোকস্তম্ভ-রক্ষীরা কিন্তু এক জায়গাতে থাকতেই ভালোবাসে।

এবার আমার বিশ্রাম দরকার।

কোথাও কোনো চাকরি তুমি করেছো কি? কোনো সরকারি আপিসের প্রশংসাপত্র কি সঙ্গে আছে?

সেই বৃদ্ধ তার জামার ভেতর থেকে এক টুকরো সিল্ক বার করলো। তার রঙ ফিকে হয়ে এসেছে, দেখলে মনে হয় কোনো পুরোনো পতাকার একটি ছিন্ন অংশ। সেই সিল্কের টুকরোর ভাঁজ খুলে বৃদ্ধ বললো:

এই মধ্যেই আমার প্রশংসাপত্র রয়েছে। ১৮৩০ সালে এই ক্রস আমি পেয়েছিলুম। দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্পানিশ, কারলিস্ট

লড়াই থেকে পাওয়া। তৃতীয়টি হচ্ছে ফরাসি সৈন্যদলের। চতুর্থটি পেয়েছিলুম হাঙ্গারি থেকে। তারপর দক্ষিণের বিরুদ্ধে স্টেট্স্এর হয়ে আমি লড়েছিলুম ; সেখানে কাউকেই তারা ক্রস দেয় না।

ফ্যাল্‌কনব্রিজ কাগজটি তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। হুম্! স্কাভিন্সকি ? এই কি তোমার নাম ? হুম্! বেয়োনেট আক্রমণের সময় ছুটো পতাকা কেড়ে নিয়েছিলে। খুব বীর সৈনিক তুমি।

আমি নির্ভরযোগ্য আলোকস্তম্ভ-রক্ষী হতে পারবো।

ঐ মিনারে দিনের মধ্যে একাধিকবার ওঠানামা করতে হবে। তোমার পা-জোড়া মজবুত তো ?

সমস্ত সমতল ভূমি পায়ে হেঁটে আমি পার হয়েছি। *

জাহাজের কাজ সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি ?

তিমি-শিকারের এক জাহাজে আমি তিন বছর কাজ করেছিলুম।

তুমি দেখছি নানা চাকরি করেছো।

শুধু বিশ্রাম আর শান্তি কখনো পাইনি।

কেন ?

বৃদ্ধ তার কাঁধছুটো ঝাঁকিয়ে হতাশার ভঙ্গী করলো। আমার কপালটাই এ-রকম।

কিন্তু তবু তোমাকে আলোকস্তম্ভ-রক্ষীর কাজের পক্ষে বড় বেশি বৃদ্ধ বলে মনে হচ্ছে।

আবেগময় কণ্ঠে সেই আবেদনকারী হঠাৎ বলতে শুরু করলো, ঘুরে-ঘুরে আমি ভারি ক্লান্ত। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন,

---

*পূর্ব-অঞ্চল থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত যে বিশাল পাথুরে অঞ্চল রয়েছে, তাকে 'সমতল ভূমি' বলে উল্লেখ করা হয়।

নানা ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। এ-রকমই কোন চাকরির জন্য আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছি। আমার বয়েস হয়েছে, এবার বিশ্রাম দরকার। নিজেকে এবার আমি বলতে চাই, এই তোমার বন্দর, এখানে তুমি থাকবে। শুধু আপনার ওপরই এটা এখন নির্ভর করছে। আর হয়তো কখনো এ-রকম চাকরি পাবো না। আমি পানামাতেই ছিলুম—কী বরাত জোর! ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে হতাশ করবেন না! কূলে ভিড়তে না পারলে যে-জাহাজের কপালে ভরাডুবি লেখা—আমার অবস্থা ঠিক সেই রকম। শপথ করে বলছি, আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। যদি এক বৃদ্ধকে আপনি আনন্দ দিতে চান—আর ঘুরতে পারি না।

সেই বৃদ্ধের নীল চোখে এমন একাগ্রতা আর অনুনয় ফুটে উঠলো যে ফ্যাল্‌কনব্রিজ বেদনা অনুভব না করে পারলেন না। তাঁর নিজের হৃদয়ও ভারি কোমল আর সরল।

তিনি বললেন, বেশ। তোমাকেই আমি আলোকস্তম্ভ-রক্ষীর কাজে নিযুক্ত করলুম।

সেই বৃদ্ধের সমস্ত চোখমুখ অপরূপ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

অনেক ধন্যবাদ!

আজকেই তুমি আলোকস্তম্ভে যেতে পারবে?

হ্যাঁ, পারবো।

তাহলে বিদায়। শুধু এ-কথাটি মনে রেখো, কর্তব্যে কোনো রকম অবহেলা হলে তৎক্ষণাৎ চাকরি যাবে।

বেশ।

সূর্য জমিটার ওপাশে অস্ত গেছে। উজ্জ্বল দিনের পর গোধূলিহীন রাত্রি নেমেছে। নতুন আলোকস্তম্ভ-রক্ষী সেই

সন্ধ্যাতেই যে কাজে যোগ দিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো—দেখা গেলো আলোকস্তম্ভ থেকে যথাসময়ে উজ্জ্বল আলোর রেখা জলের উপর গিয়ে পড়েছে।

সম্পূর্ণ শান্ত, নিস্তব্ধ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নিখুঁত রাত, স্বচ্ছ কুয়াশায় ভরা। চাঁদের চারপাশে সেই কুয়াশা বিরাট রঙিন একটি রামধনু সৃষ্টি করেছে। সেই রামধনুর ধারগুলো ভাঙা নয়, ভারি কোমল বলে মনে হয়। ঢেউ উঠছে বলেই সমুদ্র যা কাঁপছে। নিচ থেকে দেখলে স্কাভিন্সকিকে একটি ছোট কালো বিন্দু বলে মনে হয়। তার এলোমেলো ভাবনাগুলো জড়ো করে সে এই নতুন আবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু তার মন এমনভাবে আচ্ছন্ন যে, তার ভাবনাগুলোকে একে-একে জড়ো করা সম্ভব নয়। তাড়া-খাওয়া জানোয়ার অবশেষে দুরারোহ পাহাড় কিংবা গুহার নিরাপদ আশ্রয় পেলে যে-রকম সুস্থ বোধ করে, তার মনের অবস্থাটাও অনেকটা সেইরকম। এতদিন পরে সত্যিই সে বিশ্রাম নিতে পারবে! এখন সে নিরাপদ—এই কল্পনা তার মনে অনির্বচনীয় শান্তি নিয়ে এলো। তার পূর্বের ভবঘুরে জীবনের দুর্ভাগ্য আর নিষ্ফলতার কথা মনে করে এই দ্বীপে বসে সে এখন হাসতে পারে। সে ছিলো যেন একটা জাহাজ—ঝড়ে মাস্তুল গেছে ভেঙে, পাল গেছে ছিঁড়ে। আকাশ থেকে পড়ে সমুদ্রের তলায় যেন এতোদিন তলিয়ে ছিলো। তার উপর ঝঞ্ঝাবায়ু ক্রমাগত ঢেউ ছুঁড়েছে, ফেনা ছিটিয়েছে। তবু সে পেয়েছে বন্দর। তার ভবিষ্যতের প্রশান্তির কথা ভাবতে-ভাবতে সেই ঝঞ্ঝাবাত্যার স্মৃতি মন থেকে নিমেষে মিলিয়ে গেলো।

ফ্যাল্‌কনব্রিজের কাছে তার জীবনের আশ্চর্য দুঃসাহসিক

অভিযানের কতকটা অংশ মাত্র সে বলেছে ; আরো কত হাজার-হাজার ঘটনা রয়েছে—তাদের কথা সে জানায় নি। বরাবরই তার জীবনে নিদারুণ কাণ্ড সব ঘটেছে। যতবারই তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বেলে স্থায়ী হয়ে সে বসতে গেছে, ততবারই ঝড় এসে তাঁবুর দড়ি দিয়েছে ছিঁড়ে, আগুন দিয়েছে পুড়িয়ে আর তাকে এনে ফেলেছে ধ্বংসের মুখে ! এই মিনারের উপর থেকে আলোয় উজ্জ্বল ঢেউগুলো দেখতে-দেখতে তার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা একে-একে তার মনে পড়তে লাগলো।

পৃথিবীর চতুর্দিকেই সে অভিযানে বেরিয়েছে। তার সেই ভবঘুরে জীবনে প্রায় সবরকম কাজই করেছে সে। খাটতে সে ভালোবাসে আর সে বিশ্বাসীও—একাধিকবার অর্থও সে উপার্জন করেছে, কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং সাবধানে চলা সত্ত্বেও প্রত্যেকবারেই সেই অর্থ হয়েছে নষ্ট। অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ-খনিতে সে কাজ করেছে, আফ্রিকায় হীরের সন্ধানে খুঁড়েছে মাটি। ঈস্ট ইণ্ডিজে রাইফেলধারী হয়েও চাকরি সে করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় সে গোরু-মোষ নিয়ে খোঁয়াড় করেছিলো—অনাবৃষ্টিতে সমস্ত নষ্ট হয়ে গেলো। ব্রেজিলের আভ্যন্তরীণ বুনো জাতের সঙ্গে ব্যবসা করতে সে চেষ্টা করেছিলো—আমাজনে তার সদাগরি নৌকো গেলো ডুবে। প্রায় উলঙ্গ, নিঃসঙ্গ, হাতিয়ারহীন অবস্থায় বহু সপ্তাহ ধরে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিলো। খাদ্যের মধ্যে ছিলো শুধু বুনো ফল। যে-কোনো মুহূর্তেই বুনো জানোয়ারের হাতে তার মৃত্যু ঘটতে পারতো।

আরকানসাসের হেলেনা সহরে সে কামারশালা বানিয়েছিলো। কিন্তু এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ফলে সমস্ত সহরের সঙ্গে তার কামারশালাও পুড়ে ছাই হলো। তারপর রকি মাউণ্টেন্সএর ইণ্ডিয়ানদের হাতে সে পড়ে ; নিতান্ত বরাত-জোরেই ক্যানেডীয়

শিকারীদের সাহায্যে তার প্রাণ রক্ষা পায়। তারপর বাহিয়া থেকে বার্দোতে যে-সব জাহাজ যাতায়াত করে তাদের একটিতে কিছুদিন সে কাজ করেছিলো। তারপর এক তিমি-শিকারী জাহাজে হারপুন ছোঁড়ার কাজও সে করেছে। উক্ত দুটি জাহাজই ডুবেছিলো। হাভানায় তার সিগার তৈরির এক কারখানা ছিলো। কিন্তু ভমিটো অসুখে সে যখন বিছানায় পড়ে, তার অংশীদার তখন সমস্ত ঠকিয়ে পালায়। অবশেষে সে এ্যাসপিনওয়ালে এসে পৌঁছলো। এখানেই তার জীবনের সমস্ত বিফলতার সমাপ্তি ঘটুক। এই পাথুরে দ্বীপে কে এখন তাকে স্পর্শ করতে পারবে? জল কিংবা আগুন কিংবা মানুষ—কেউ না। মানুষের কাছ থেকে স্কাভিন্সকি কিন্তু বেশি দুঃখ পায়নি। অসতের চেয়ে সৎ লোকই সে বেশি দেখেছে।

বরাবরই মনে হয়েছে, প্রকৃতির সমস্ত শক্তি মিলে তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। পরিচিত লোকেরা বলতো, তার কপালটাই পোড়া। সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার জন্য তার ভাগ্যকেই তারা দায়ী করেছিলো। নিজেও যেন কেমন পাগলাটে হয়ে পড়েছিলো। তার মনে হতো, কোনো অদৃশ্য নিষ্ঠুর শক্তি যেন তার পিছন-পিছন ধাওয়া করে চলেছে। ধাওয়া করে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে, এক সমুদ্র থেকে আর-এক সমুদ্রের উপর। এ-সব কথা সে অবশ্য বলতো না। কে এই অদৃশ্য নিষ্ঠুর শক্তি—কেউ প্রশ্ন করলে শুধু মাঝে-মাঝে রহস্যজনক ভাবে সে শুকতারাকে দেখিয়ে দিতো। আর বলতো, ঐখান থেকেই সে আসে। তার জীবনে যত বিফলতা এসেছে ভাবলে বাস্তবিকই অবাক লাগে।

কিন্তু স্কাভিন্সকির ধৈর্য ইণ্ডিয়ানদের মতো। আর তার মনের এই শান্ত প্রতিরোধ-শক্তির মূলে রয়েছে সত্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস। হাঙ্গারিতে একাধিক বেয়োনেটের খোঁচা তাকে সহ্য

করতে হয়েছে। ঘোড়ার জিনের পা-দানি ধরে ক্ষমা চাইলেই তাকে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না, কিন্তু ঐ অপমান কিছুতেই মানতে সে রাজি হয়নি। ঠিক এই একই ভাবে জীবনের কোনো দুর্ভাগ্যের কাছেই মাথা সে নোয়ায় নি। পিঁপড়ের মতো অসীম ধৈর্য আর পরিশ্রম করে ধীরে-ধীরে পাহাড়ের চড়াই-পথে সে উঠে এসেছে। একশোবার তাকে উপর থেকে ঠেলে ফেলা হয়েছে, কিন্তু আবার শান্তভাবে যাত্রা সে শুরু করেছে—একশো একের বার ধরে নতুন করে যাত্রা শুরু করা! ঐ এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ সে। ঈশ্বর জানেন এই বৃদ্ধ সৈনিক আগুনে পুড়েছে, কত দুঃখ-বেদনায় পোড় খেয়ে শক্ত হয়েছে, কত ভাবে জীবনের কামারশালে হাতুড়ির আঘাত সহ্য করেছে। তবু মন তার শিশুর মতো। কুবা-র সেই মহামারীর সময় তার সমস্ত সম্পত্তি সে বিলিয়ে দিয়েছিলো নিজের জন্য একটি দানাও না রেখে। তারপর সেই মহামারী তাকে আক্রমণ করে।

তার যে অদ্ভুত ক্ষমতা, তাতে সন্দেহ নেই। এতোগুলি আশাভঙ্গের পরেও বিশ্বাস সে হারায় নি। কেবলই সে আশা করে এসেছে, এবারে সব ঠিক হয়ে যাবে। শীতকালে উৎসাহিত হয়ে উঠে বার বার সে বলতো, একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটবেই। আর সে-আশ্চর্য ঘটনার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে সে অপেক্ষা করতো, আর সেই কথা ভেবে গোটা গ্রীষ্মকালটাই দিতো কাটিয়ে।

একটির পর একটি শীত চলে যেতে লাগলো—কিন্তু তার মাথার চুলগুলো সাদা হওয়া ছাড়া আর কোনো ঘটনাই ঘটলো না। অবশেষে বার্ধক্য এলো, তার শক্তিও ক্রমশ আসতে লাগলো কমে। তার ধৈর্যের বাঁধ গেলো ভেঙে, তার চরিত্রের সেই অপরূপ প্রশান্তি গেলো মিলিয়ে। অবশেষে সেই পোড়-খাওয়া সৈনিকের চোখ দিয়ে যে-কোনো তুচ্ছ কারণেই জল ঝরে। এ ছাড়াও

আরো একটি পরিবর্তন দেখা দিলো। মাঝে-মাঝে নিজের দেশের জন্য তার এমন মন-কেমন করতো যে সে স্থির থাকতে পারতো না। নানা ভাবে তার দেশের কথা মনে পড়তো। কখনো সোয়ালো পাখি দেখে, কখনো চড়ুইএর মতো ধূসর পাখি নজরে পড়ায়, কখনো পাহাড়ের চূড়োয় তুষার লক্ষ্য করে, কখনো বা বিগত জীবনের শোনা কোনো গানের করুণ সুর শুনে।

অবশেষে তার মনে শুধু একটি চিন্তাই প্রধান হয়ে জেগে রইলো। সে-চিন্তা বিশ্রামের। এই চিন্তা বৃদ্ধকে একেবারে যেন পেয়ে বসলো, মনের সমস্ত ভাবনাকে ছাপিয়ে রইলো কেবল এই এক চিন্তা। এই ভবঘুরের মনে আর কোনো কামনা-বাসনা রইলো না। একটি শান্তিময় কোনে বিশ্রাম করতে-করতে মৃত্যুর অপেক্ষা করার চেয়ে ভালো কোনো কিছুই সে ভেবে পেলো না। তার খামখেয়ালী ভাগ্য তাকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর উপর নাকে দড়ি দিয়ে এমন ঘুরিয়েছে যে ভালো করে দম নিতে পর্যন্ত সে পারেনি। তাই হয়তো তার মনে ধারণা জন্মেছে, জীবনের সবচেয়ে বড় আরাম হোলো না-ফেরা।

আর সত্যি বলতে কি, জীবনের কাছে এই সামান্য আরাম তার পাওনাই হয়েছে। কিন্তু আশাভঙ্গের পর আশাভঙ্গ হতে-হতে বিশ্রাম পাওয়াকে সে একটা অসম্ভব অবাস্তব কিছু বলেই মনে করে। তাই ভরসা করে সে বিশ্রাম পাবার আশাও করতে পারে না। ইতিমধ্যে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বারো ঘণ্টার মধ্যে সে এমন একটি কাজ পেয়ে গেলো, সমস্ত সৃষ্টির ভিতর থেকে শুধু তারই জন্য যেন বাছাই করে আনা। তাই লণ্ঠন জ্বালাবার সময় তাকে যখন অদ্ভুত আচ্ছন্নতার মধ্যে দেখি, তখন আমাদের আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো এ ঘটনা সত্যি কিনা, আর সাহস করে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সে

পারলো না। কিন্তু এ-ঘটনা যে সত্যি, তার নানা বাস্তব প্রমাণ সে পেলো। উপরের বারান্দায় সে দাঁড়িয়ে রইলো আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগলো। চেয়ে-চেয়ে নিজেকে নিজে সে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করলো। তাকে দেখলে মনে হয়, জীবনে এই যেন সে প্রথম সমুদ্র দেখছে !

লণ্ঠনের আতস-কাঁচ অন্ধকারের উপর এক বিরাট তে-কোনা আলো ফেলছে। সেই আলোর ওপারের অন্ধকারে বৃদ্ধের দৃষ্টি একেবারে হারিয়ে গেলো। সেই দূরের অন্ধকার যেন রহস্যময়, সেদিকে চাইলে কেমন যেন ভয়-ভয় করে! কিন্তু সেই দূরত্ব যেন আলোর দিকেই ছুটে আসছে। একটির পর একটি দীর্ঘ ঢেউ অন্ধকার থেকে যেন গড়িয়ে পড়ছে আর তারপর শব্দ করে দ্বীপের পায়ের তলায় আসছে ছুটে ; আর তারপর তাদের ফেনায়-ভরা পিঠগুলো যাচ্ছে দেখা ; লণ্ঠনের আলোয় তাদের রঙ গোলাপি হয়ে চকচক করছে। জোয়ারের জল ক্রমশ ফুলতে-ফুলতে বালিয়াড়িগুলো ঢেকে দিলো। সমুদ্রের রহস্যময় ভাষা আরো গভীর, আরো জোরালো হয়ে উঠলো। সে-শব্দ কখনো যেন কামান-গর্জন, কখনো যেন বিরাট অরণ্যের আর্তনাদ, আবার কখনো যেন দূরের জনতার চাপা স্বর! মাঝে-মাঝে সমস্ত চুপচাপ ; তারপর বৃদ্ধের কানে যেন ভেসে এলো একটি বিরাট দীর্ঘশ্বাস, তারপর ফুঁপোনো কান্নার ধ্বনি আর তারপর আবার সেই ভয়াবহ আর্তনাদ।

অবশেষে বাতাসে কুয়াশা উড়িয়ে নিয়ে গেলো, কিন্তু তার বদলে নিয়ে এলো ভাঙা-ভাঙা কালো মেঘ ; আর সেই মেঘে চাঁদ গেলো ঢেকে। পশ্চিম থেকে ক্রমশ জোরে-জোরে বাতাস বইতে শুরু করলো। আর ঢেউগুলো যেন ক্রুদ্ধ হয়ে আলোকস্তম্ভের পাথরের উপর পড়তে লাগলো ঝাঁপিয়ে, তারপর তাদের

জিভ দিয়ে তার বনেদের দেয়ালটাকে যেন লেহন করতে শুরু করলো।

দূরে ঝড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারে কম্পিত দূরত্বের মাঝে-মাঝে জাহাজের মাস্তুল থেকে সবুজ আলো চকচক করে উঠছে। সেই সবুজ বিন্দুগুলো উপরে উঠছে আবার যেন তলিয়ে যাচ্ছে। কখনো ডাইনে দুলছে, কখনো বা বাঁয়ে। স্কাভিন্সকি নিজের ঘরে নেমে এলো। ঝড়ের চিৎকার শুরু হয়েছে। বাইরে সেইসব জাহাজের যাত্রীরা রাত্রি আর অন্ধকার আর ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই শুরু করেছে। কিন্তু আলোকস্তম্ভের ভিতরে কোনো চাঞ্চল্য নেই : সেখানে শুধু একটা শান্ত সমাহিত ভাব। পুরু দেয়ালের ভিতর দিয়ে ঝড়ের শব্দও প্রায় শোনা যায় না। ঘড়ির মাপা টিক-ট্যাক শব্দ সেই ক্লান্ত বৃদ্ধকে ঘুম পাড়িয়ে দিলো।

[দুই]

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ লাগলো কেটে যেতে। নাবিকরা বলে, সমুদ্র ক্ষেপে গেলে রাত্রি আর অন্ধকারের ভিতর থেকে তাদের নাম ধরে কে যেন ডাকে! সমুদ্রের অসীম শূন্যতা এভাবে যদি ডাকে, মানুষ বুড়ো হবার সময়েও অন্য এক আরো কালো আর রহস্যময় শূন্যতা থেকে তার ডাক নিশ্চয়ই আসে! যতো সে জীবনের পথে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ততো মধুর লাগে সেই ডাক। কিন্তু সেই ডাক শোনার জন্য নিস্তব্ধতার প্রয়োজন। বার্ধক্য কিন্তু সেই ডাককে একপাশে সরিয়ে রাখতে ভালোবাসে। সে-ডাকে যেন কবরের আভাস আছে।

এই আলোকস্তম্ভ স্কাভিন্সকির কাছে প্রায় একরকম কবরের মতোই হয়ে উঠেছে। এখানকার জীবনের চেয়ে একঘেয়ে আর

কিছু নেই। যুবকরা এখানে চাকরি নেবার কিছুদিন পরেই পদত্যাগ করে পালায়। তাই আলোকস্তম্ভ-রক্ষীরা প্রায়ই এমন মানুষ হয় যারা যুবক নয়, যারা ফুর্তি ভালোবাসে না, যাদের সঙ্গে অন্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। যদি কখনো তাদের মধ্যে কেউ আলোকস্তম্ভ ছেড়ে মনুষ্যসমাজে ফিরে আসে, তাহলে এমন-ভাবে জনতার ভিতর দিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়, যেন গভীর ঘুম থেকে সবে জেগে উঠেছে!

আলোকস্তম্ভ-রক্ষীর জীবনে ছোটোখাটো খুঁটিনাটি ঘটনার সম্পূর্ণ অভাব। এই সব ছোটোখাটো ঘটনার অভিজ্ঞতাই মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখায়। আলোক-স্তম্ভ-রক্ষী শুধু একটা বিরাট জিনিসের সংস্পর্শে আসে—সেই বিরাট জিনিসটার কোনো সঠিক চেহারা নেই। সেখানে শুধু এক আকাশ, আর শুধু এক সমুদ্র। এই দুই অসীমতার মধ্যে মানুষের অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ নির্জনতায় থাকে। সেই ধ্যানের ভিতর থেকে আলোকস্তম্ভ-রক্ষীকে কিছুই জাগিয়ে তোলে না। এমন কি তার কাজও নয়। একটি দিন ঠিক আর-একটি দিনের মতো, যেন বিশেষ একটি প্রার্থনারই পুনরাবৃত্তি। মাঝে-মাঝে আবহাওয়ার পরিবর্তনই যা সামান্য বৈচিত্র্য আনে।

স্কাভিন্সকি কিন্তু জীবনে এতো আনন্দ আর কখনো পায়নি। উষার সঙ্গে-সঙ্গে সে বিছানা ছেড়ে ওঠে, জলখাবার খায়, আতস-কাঁচগুলো পরিষ্কার করে, আর তারপর বারান্দার ধারে বসে জলের উপর বহু দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে যে-ছবি সে দেখে তাতে কখনোই তার চোখ ক্লান্ত হয় না। সমুদ্রের বিরাট আসমানী নীল রঙের ভিতর প্রায়ই একঝাঁক বাতাসে-ফোলা পাল দেখা যায়; সূর্যালোকে এতো উজ্জ্বল হয়ে সেগুলো ঝকঝক করে যে চাওয়া যায় না। মাঝে-মাঝে বাতাসের সাহায্যে একটির পর একটি সারবন্দী

হয়ে তারা চলে, যেন সমুদ্রে-ভাসা সাদা পাখির মালা! লাল পিপেগুলো দেখে খালটা চেনা যায়। হালকা ঢেউয়ে লাল পিপেগুলো ধীরে-ধীরে দুলছে। প্রতিদিন বিকেলে সেইসব নৌকোর পালের মধ্য দিয়ে বিরাট পালকের মতো ধূসর রঙের ধোঁয়া চোখে পড়ে। ওটা ন্যু-ইয়র্কের জাহাজ, যাত্রী আর মাল নিয়ে এ্যাসপিনওয়ালে আসছে। তার পিছনে যেন টেনে চলেছে ফেনার একটি পথ।

বারান্দার অন্যদিকে স্কাভিন্সকি দেখতে পায় এ্যাসপিনওয়াল আর তার ব্যস্ত বন্দর, এতো ছোট যে হাতের চেটোয় কুলিয়ে যাবে। সেই বন্দরের ভিতর যেন মাস্তুল আর নৌকো আর জাহাজের অরণ্য রয়েছে। অল্প দূরে রয়েছে সহরের সাদা আর অন্যান্য রঙের মিনারের চুড়োগুলো। তার আলোকস্তম্ভের উচ্চতা থেকে ঐ বাড়িগুলোকে সামুদ্রিক পাখির বাসা বলে মনে হয়, নৌকোগুলোকে তেলাপোকার মত দেখায়, আর সাদা পাথরের চওড়া পথের উপর মানুষগুলো যেন কয়েকটি বিন্দুর মতো ঘুরে বেড়ায়। খুব সকালে পুব দিক থেকে মৃদু বাতাস বয়। সেই বাতাসে ভেসে আসে জীবনের অস্ফুট গুঞ্জন আর সেই গুঞ্জনের ভিতর সবচেয়ে স্পষ্ট শোনা যায় স্টীমারের বাঁশি। বিকেল ছ-টা বাজে; বন্দরের লোক-চলাচল কমতে থাকে; পাথরের ফাটলে-ফাটলে পাখিগুলো নিজেদের লুকিয়ে ফেলে, ঢেউগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যেন অলস হয়ে আসে; আর তারপর মাটিতে জলে আলোকস্তম্ভে স্তব্ধতা নামে।

সে-স্তব্ধতা কিছুতে ভাঙে না। যে-সব হলদে বালির উপর থেকে ঢেউ সরে এসেছে জলের উপর, সেই বালিগুলো সোনার দাগের মতো চকচক করে। মিনারের সমস্ত দেহকে ঘিরে রয়েছে গাঢ় নীল রঙ। আকাশ থেকে রৌদ্রের বন্যা যেন নেমে আসে

জলে আর বালিতে আর পাথরে। আর সেই সময় মধুর এক নিষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধকে যেন আচ্ছন্ন করে। সে স্বাদ পায় অপরূপ বিশ্রামের। আর যখন মনে পড়ে এই বিশ্রাম চিরকাল চলবে, তখন আর কিছু কামনা তার থাকে না।

নিজের আনন্দ নিয়ে স্কাভিন্সকির যেন নেশা ধরে গেলো। মানুষ উন্নততর অবস্থার সঙ্গে সহজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাই ক্রমশ নিজের বিশ্বাস আর আত্মনির্ভরতা সে ফিরে পেলো। তার মনে হলো, মানুষরাই যখন পঙ্গুদের আশ্রয় দেয়, ঈশ্বরই বা কেন তাঁর পঙ্গুদের আশ্রয় দেবেন না?—সময় কাটতে লাগলো আর ক্রমশই তার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়ে উঠলো। বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিলো এই মিনার, এই লণ্ঠন, এই পাথর, এই বালিয়াড়ি আর এই স্তব্ধতার সঙ্গে। পাখিগুলোর সঙ্গেও নিজেকে সে খাপ খাইয়ে নিলো। পাথরের ফাটলে বসে তারা ডিমে তা দেয় আর সন্ধ্যায় আলোকস্তম্ভের ছাতে এসে জমে। প্রায়ই নিজের খাদ্যের অবশিষ্ট টুকরোগুলি স্কাভিন্সকি তাদের ছুঁড়ে দেয়। দেখতে-দেখতে তারা পোষ মেনে গেলো। কিছুদিন পরে খাবার সময় বৃদ্ধের মনে হতো, সাদা ডানার ঝড় উঠেছে বুঝি! তাকে ঘিরে ফেলতো পাখিগুলো, সেও পাখিদের মাঝখানে যেতো চলে, রাখাল যেমন ভেড়ার পালের মধ্যে যায়।

ভাঁটা পড়লে নিচে বালিতে সে নেমে আসে আর নানারকম ঝিনুক সংগ্রহ করে। ফিরতি পথে ঢেউগুলো এই ঝিনুক ফেলে গেছে। জ্যোৎস্নারাত্রে আলোকস্তম্ভের পাথরের ফাটলে মাছ ধরতে সে যায়, সেখানে অসংখ্য মাছ জমে। এইভাবে এই পাথর আর গাছহীন ছোট দ্বীপটিকে সে ভালোবেসে ফেললো। এই দ্বীপে শুধু ছোট-ছোট একরকম লতাগুল্ম জন্মায়, সেগুলোর

ভিতর দিয়ে এক আশ্চর্য আভা ঠিকরোয়। দ্বীপের এই রিক্ততাকে ঢেকে দেয় দূরের দৃশ্য। বিকেলে বাতাস যখন অতিরিক্ত স্বচ্ছ হয়ে যায়, সমস্ত সরু জমিটা তখন তার নজরে পড়ে। ঘন গাছ-পালায় ঢাকা সেই জমি। সে-সময় স্কাভিন্সকির মনে হয় যেন বিরাট একটি উদ্যান দেখতে পাচ্ছে। সেখানে কোকো গাছের গুচ্ছ, বড়-বড় মুসা গাছ। সেগুলো মিশে গিয়ে যেন চমৎকার তোড়া তৈরি হয়েছে। এ্যাসপিনওয়ালের বাড়ির পিছনে সেই তোড়াগুলো রয়েছে। আরো দূরে, এ্যাসপিনওয়াল আর পানামার মাঝখানে, বিরাট এক অরণ্য। প্রতিদিন সকালে বিকেলে তার উপর লালচে কুয়াশা ঝুলে থাকে; গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আসল অরণ্য এটা। তার এক পা ডুবে আছে স্রোতহীন জলে, তার ভিতর জোট পাকিয়েছে জঙ্গুলে আগাছা আর অসংখ্য অতিকায় আর্কিড, পাম, মিল্ক, আয়রন আর আঠা গাছ। তাদের মিলিত মর্মর যেন সমুদ্রের ডাক।

দূরবীনের ভিতর দিয়ে সে যে শুধু গাছ আর চওড়া-চওড়া কলাপাতা দেখতে পায় তা নয়, অসংখ্য বাঁদর, বড়-বড় সারস আর কাকাতুয়ার ঝাঁকও তার নজরে পড়ে। মাঝে-মাঝে তারা রামধনু-রঙ মেঘের মতো অরণ্যের উপর দিয়ে উড়ে যায়। এ-রকম অরণ্যকে স্কাভিন্সকি ভালোই চেনে। আমাজনে নৌকোডুবি হবার পর ঠিক এ-ধরনের গাছ-লতাপাতার ভিতর দিয়ে অনেক সপ্তাহ তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সে জানে বাইরের এই আশ্চর্য সুন্দর অরণ্যের হাসির পিছনে কত অসংখ্য মৃত্যু আর বিপদ লুকিয়ে আছে। সেখানে রাত কাটাবার সময় একেবারে শিয়রেই বাঁদরের অশরীরী ডাক আর জাগুয়ারের গর্জন সে শুনেছে। গাছের উপর জঙ্গুলে আগাছার মতো গুটিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছে বিরাট বিরাট সাপ; টরপেডো-মাছ আর কুমিরে ভরা অরণ্যের সেসব নিস্তব্ধ হ্রদ তার জানা।

সে জানে কী রকম আতঙ্কে মানুষ ঐ সব অজানা অরণ্যে বাস করে। সে অরণ্যে এমন এক-একটি পাতা আছে, মানুষের চেয়ে যা দশগুণ বড়। সে অরণ্যে আছে রক্তলোভী মশা, গেছো জোঁক আর বিষাক্ত রাক্ষুসে মাকড়সা। ওরকম অরণ্যে বাস করার অভিজ্ঞতা তার আছে, নিজের চোখে সব কিছু সে দেখেছে। নানা বিপদের ভিতর দিয়ে তাকে যেতেও হয়েছে। তাই এই উঁচু নিরাপদ আশ্রয়ে বসে, অরণ্যের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তার সৌন্দর্য সে এখন যেন আরো বেশি করে উপভোগ করে। এই আলোকস্তম্ভ তাকে সব রকম বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। রবিবার কয়েক ঘণ্টার জন্য এখান থেকে সে বাইরে যায়। সে-সময় তার গায়ে রুপোর বোতাম-লাগানো আলোকস্তম্ভ-রক্ষীর নীল কোট, ক্রস্‌চিহ্নগুলি বুকে ঝোলে। গির্জেয় প্রবেশ করার সময় ক্রেওলরা যখন দরজার কাছে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে— আমাদের আলোকস্তম্ভ-রক্ষী মার্কিন হলেও নাস্তিক নয়, বাস্তবিক সম্মান পাবার যোগ্য, তখন বেশ খানিকটা গর্বে তার দুধের মতো সাদা মাথাটা যেন আরো খানিক উঁচু হয়ে ওঠে। প্রার্থনার পর সোজা দ্বীপে সে ফিরে আসে। খুশি হয়েই সে ফেরে। কারণ, ঐ ডাঙার উপর তার কোনো আস্থা নেই।

রবিবারে সহর থেকে কেনা হয় স্পানিশ খবরের কাগজ, না-হয় ফ্যাল্‌কনব্রিজের কাছ থেকে ধার-করা 'ন্যু ইয়র্ক হেরল্ড'। সে তার ভিতর থেকে য়ুরোপের খবর সাগ্রহে খুঁজে বার করে। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে এই মিনারের ভিতর বসে সেই বৃদ্ধের বুক নিজের জন্মভূমির জন্য কেঁপে ওঠে। নৌকোয় যখন তার প্রতিদিনকার খাদ্য ও পানীয় আসে, তখন মাঝে-মাঝে উপর থেকে সে নামে পাহারাদার জন্‌সনের সঙ্গে গল্প করতে। কিন্তু কিছুদিন বাদে সে যেন লাজুক হয়ে উঠলো। খবরের কাগজ পড়তে সহরে

যেতে কিংবা রাজনীতি নিয়ে জন্‌সনের সঙ্গে আলোচনা করতে নিচে নামাও বন্ধ করলো।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটলো। কেউ তার দেখা পেলো না, সেও কারুর সঙ্গে দেখা করলো না। সে যে বেঁচে আছে তার একমাত্র প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগলো আলোকস্তম্ভের তলা থেকে খাদ্য ও পানীয় অদৃশ্য হওয়া দেখে। সেখানকার সমুদ্রে প্রতিদিন যেমন সূর্যোদয় হয়, ঠিক সেইরকম নির্ভুলভাবে প্রত্যেক সন্ধ্যায় লণ্ঠনের আলো জ্বলতে দেখেও জানা গেলো সে বেঁচে আছে। এই বৃদ্ধ পৃথিবী সম্বন্ধে ক্রমেই যে সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে তাতে আর সন্দেহ নেই। এর কারণ, দেশের জন্য মন-কেমন করা নয়—এমন কি স্বদেশের জন্য ব্যাকুলতাও যেন তার নির্বিকার ভাবের মধ্যে হারিয়ে গেছে। স্কাভিন্সকির কাছে এই দ্বীপের উপরেই বিশ্বপ্রকৃতির যেন এইমাত্র সৃষ্টি হলো, এখানেই আবার তা শেষ হবে। মৃত্যুর আগে সে আর এই মিনার ছেড়ে যেতে পারবে না—এই কল্পনা এখন আর তার কাছে নতুন নয়। সে একেবারেই ভুলে গেছে এই মিনারের বাইরের অন্য জিনিসের কথা, তাছাড়া তার মন মরমী হয়ে উঠেছে। তার কোমল নীল চোখের চাউনি শিশুর চোখের মতো। তার দৃষ্টি যেন দূরের কি একটা জিনিসের উপর আবদ্ধ। তার চতুর্দিকের অসাধারণ সহজ অথচ বিরাট আবেষ্টনীর সান্নিধ্যে থেকে এই বৃদ্ধ যেন তার ব্যক্তিত্ব ভুলে যেতে লাগলো। কোনো এক বিশেষ মানুষ হয়ে সে আর বেঁচে নেই, তাকে ঘিরে যা রয়েছে ক্রমশ তার ভিতরেই তার নিজের সত্তা হারিয়ে যেতে লাগলো। তার আবেষ্টনীর বাইরের অন্য কিছুই সে জানে না। শুধু অচেতন ভাবে তার অনুভব-শক্তি জেগে রইলো। শেষকালে তার মনে হলো সমস্ত আকাশ, জল, এই দ্বীপ, মিনার, সোনালি বালির বেলাভূমি, নৌকোর ফোলা

পাল, সমুদ্রের পাখি, জোয়ার-ভাঁটা—এই সমস্ত মিলে একটি অখণ্ড শক্তিমান সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে, রহস্যময় বিরাট এক জীবনে! সেই রহস্যের ভিতর ক্রমশ সে তলিয়ে যাচ্ছে আর উপলব্ধি করছে সেই জীবনকে, নিজেকেই নিজে যে বাঁচিয়ে রাখে। সে ডুবে চলেছে আর দোলায় দুলছে আর ভুলে যাচ্ছে নিজেকে। আর ক্রমশ সঙ্কীর্ণ-হয়ে-আসা নিজের জীবনের মধ্যে সেই অর্ধ-সচেতন ও অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় সে এমন এক বিশ্রামের সন্ধান পেয়েছে যা প্রায় অর্ধেক মৃত্যুর মতোই বিরাট।

[তিন]

কিন্তু ঘুম একদিন ভাঙলো।

একদিন ডিঙিটা খাদ্য আর পানীয় পৌঁছে দিয়ে চলে যাবার ঘণ্টাখানেক বাদে নেমে সে দেখলো, একটা বাড়তি মোড়ক রয়েছে। সেই মোড়কের গায়ে যুক্তরাজ্যের ডাক-টিকিট আঁটা আর খসখসে কাপড়টার গায়ে ঠিকানা লেখা : স্কাভিন্সকি, এস্‌কোয়ার।

কৌতূহলী হয়ে কাপড়টা কেটে সে দেখলো, বই রয়েছে। একটা বই তুলে চোখ বুলিয়ে সে রেখে দিলো। থরথর করে তার হাতদুটো কাঁপতে আরম্ভ করেছে। দু-হাতে চোখ সে ঢেকে ফেললো, যেন যা দেখেছে তা অবিশ্বাস্য। তার মনে হলো সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে!

বইগুলো পোল ভাষায় লেখা—এর মানে কী? কে তাকে বই পাঠাতে পারে? তার মনেই নেই চাকরির প্রথমে মার্কিন প্রতিনিধির কাছ থেকে ধার করে আনা 'হেরল্ডে'এ, ন্যু-ইয়র্কে পোলিশ সমিতি প্রবর্তনের কথা পড়ে তৎক্ষণাৎ চাঁদা হিসেবে সে নিজের মাইনের অর্ধেক তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলো। এখানে তার টাকা-পয়সার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই সমিতি তাকে

ধন্যবাদ জানিয়ে বইগুলো পাঠিয়েছে। অতএব.বইগুলো নিতান্ত স্বাভাবিক উপায়েই এসেছে। কিন্তু প্রথমে এ-সব কথা তার মনে পড়লো না। তার নির্জনতার মাঝে, এ্যাসপিনওয়ালের আলোক-স্তম্ভের ভিতর পোল ভাষার বই! এ-ঘটনা তার কাছে যে একেবারে অস্বাভাবিক! ·অতীত থেকে হঠাৎ যেন এক-ঝলক বাতাস বইলো। যেন অঘটন ঘটলো।. নাবিকদের মতো এখন তার মনে হলো কেউ যেন তার নাম ধরে ডাকছে। সে-স্বর তার অতি প্রিয়। সে-স্বর প্রায় ভুলেই সে ছিলো। চোখ বুজে খানিক সে বসে রইলো। তার ভয় হলো চোখ খুললেই এই মায়া মিলিয়ে যাবে।

বিকেলের রোদে সেই খোলা মোড়কটা তার চোখের সামনে ঝকঝক করছে। তার ভিতরে রয়েছে একটি বই। সেদিকে হাত বাড়াবার সময় সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজের হৃদয়স্পন্দন সে শুনতে পেলো। বইটা কবিতার, সে দেখলো। তার মলাটে বড়-বড় হরফে বইটার নাম ছাপা, নিচে রয়েছে লেখকের নাম। এ-বই সেই মহাকবির * রচনা, ১৮৩০ সালে যাঁর লেখা প্যারিসে সে পড়েছিলো। ভবিষ্যতে আলজিয়ার্স আর স্পেনে লড়াই করার সময় এই মহাকবির ক্রমবর্ধমান যশের খবর সে পেয়েছিলো। কিন্তু সে-সময় বন্দুক নিয়ে তাকে এতো ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো যে বই পড়ার সময় পায়নি। ১৮৪৯ সালে সে আমেরিকায় যায়। আর বলতে গেলে তারপর থেকে তার রোমাঞ্চকর জীবনে কোনো পোল্যাণ্ডবাসীর সাক্ষাতই মেলেনি। পোল্যাণ্ডের কোনো বইও চোখে পড়েনি। তাই উত্তেজনা তার আরো বেড়ে গেলো, বুকের স্পন্দন হলো দ্রুততর।

বইটির প্রথম পাতা সে খুলে ধরলো। তার মনে হলো এই

---

* মিটস্‌কিয়েভিচ্—পোল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি।

নির্জন দ্বীপে এবারে বুঝি এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটবে! সত্যিই চতুর্দিক আশ্চর্য শান্ত নিস্তব্ধতায় ভরে গেছে। এ্যাসপিনওয়ালের ঘড়িগুলোয় পাঁচটা বাজছে। পরিষ্কার আকাশে কোনো মেঘ অন্ধকার করে আসছে না। মাত্র কয়েকটি পাখি বাতাসের ভিতর ভেসে চলেছে। সমুদ্রকে দোলনায় দুলিয়ে কে যেন ঘুম পাড়িয়েছে। তীরের উপর ঢেউগুলি অস্ফুট মর্মর তুলছে। সেই শব্দ মৃদু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বালির উপর। দূরে এ্যাসপিনওয়ালের সাদা বাড়ি আর আশ্চর্য তালগাছগুলো যেন হাসছে। সত্যি বলতে কি, সেখানেও যেন কি একটা আছে—প্রশান্ত আর গম্ভীর। অকস্মাৎ প্রকৃতির সেই প্রশান্তির মধ্যে বৃদ্ধের কম্পিত স্বর শোনা গেলো। যেন ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সে আবৃত্তি করে পড়তে লাগলো :

তুমি আমার জীবনের মতো প্রিয়
　　হে আমার জন্মভূমি লিটভা! *
যে তোমাকে হারিয়েছে কেবল সে-ই বলতে পারে
　　তুমি কত প্রিয়।
আজ তোমার নিখুঁত সৌন্দর্য দেখছি আর
　　প্রকাশ করছি সে-কথা, কারণ তোমার জন্য
　　মন আমার ব্যাকুল।

স্কাভিন্সকির গলা ধরে এলো। তার চোখের সামনে অক্ষরগুলো যেন নেচে বেড়াতে লাগলো। তার বুকের ভিতরকার বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে এলো একটি ঢেউ, সে-ঢেউ ক্রমশ উপরে উঠতে-উঠতে তার স্বর বন্ধ করে দিলো, তার কণ্ঠরোধ করলো। কিছুক্ষণ নিজেকে সামলে রেখে সে আবার পড়ে চললো :

* লিথুয়ানিয়া

হে পবিত্র ভূমি ! উজ্জ্বল চেন্‌স্‌টোহোভাকে
তুমি পাহারা দাও
আর অস্ট্রাব্রামায় নিজের দীপ্তি ছড়িয়ে
নভ্‌গ্রোডেকএর কেল্লা আর তার
সৎ মানুষদের তুমি বাঁচিয়ে রেখো।
শৈশবে তোমার কাছেই আমাকে রেখে
অশ্রুর মধ্যে মা বিদায় নিয়েছিলেন
আর নিস্পন্দ দৃষ্টিতে প্রথম আকাশ দেখে
আমার জীবনের জন্য
তোমার পবিত্র আঙ্গিনায় ঈশ্বরকে
প্রণাম করেছিলুম।
যে-আশ্চর্য মন্ত্রে আমার দেহে প্রাণ দিয়েছিলে
সেইরকম আর-এক মন্ত্রবলে
আমায় জন্মভূমির বুকে
আবার ফিরিয়ে নাও।

যে-ঢেউ এতোক্ষণ বুকের মধ্যে উঠেছিলো এবার তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে উপেক্ষা করে তা ভেঙে গেলো। ফুঁপিয়ে উঠে বৃদ্ধ মাটিতে আছড়ে পড়লো। সমুদ্রের বালির সঙ্গে এসে মিশলো তার তুষার-ধবল চুল। তার দেশকে শেষ দেখবার পর চল্লিশটি বছর কেটে গেছে। ঈশ্বর জানেন, আরো কত বছর আগে মাতৃ-ভাষা সে শুনেছে। নিজে থেকেই সেই ভাষা আজ তার কাছে এসে পৌঁছেছে ; ভেসে এসেছে সমুদ্রের উপর দিয়ে। তাকে আবিষ্কার করেছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে অসীম নির্জনতার ভিতর। কী সুন্দর এই ভাষা, কী প্রিয়, কী মধুর ! যে-কান্না তার বুকের ভিতর ফুলে-ফুলে উঠছিলো তার ভিতর কোনো যন্ত্রণা নেই। আছে শুধু হঠাৎ-জাগা অসীম এক ভালো-লাগা।

সেই ভালো-লাগার পাশে অন্য সব কিছুই যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে। ফুলে-ফুলে কান্নায় সে ভেঙে পড়লো, আর এই পাথুরে দ্বীপের নিঃসঙ্গ বার্ধক্যের মধ্যে একেবারে নিজের স্বদেশকে ভুলে ছিলো বলে ক্ষমা চাইতে লাগলো। হঠাৎ যেন এক আশ্চর্য ঘটনার ভিতর দিয়ে তার স্বদেশ-প্রেম ফিরে এলো।. তাই আনন্দে নেচে উঠলো তার মন।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত অদৃশ্য হয়ে চললো। সে কিন্তু উঠলো না। আলোকস্তম্ভের চতুর্দিকে পাখিগুলো উড়ছে, যেন তাদের এই বৃদ্ধ বন্ধুর জন্য ভয় পেয়ে তারা আর্তনাদ করছে। তাদের খাওয়াবার সময় এগিয়ে এসেছে। তাই কতকগুলো পাখি আকাশ থেকে ডানায় ভর দিয়ে তার কাছে নেমে এলো। তারপর তারা আসতে লাগলো দলে-দলে। ঠোঁট দিয়ে তারা মাঝে-মাঝে তাকে ঠোকরাতে লাগলো, তার মাথার উপর লাগলো ডানা ঝাপটাতে। ডানার শব্দে সে জেগে উঠলো।

প্রাণ ভরে সে কেঁদেছে। তাই এখন তার মনে প্রশান্তি আর স্ফূর্তি আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু তার চোখদুটি যেন আবেগে উজ্জ্বল। দ্বিধা না করে তার সমস্ত খাদ্যই পাখিদের সে বিলিয়ে দিলো। হৈ-চৈ করে পাখিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। আবার সে বইটা তুলে নিলো। পানামার উদ্যানে আর অরণ্যের ওপাশে ইতিমধ্যে সূর্য পৌঁছেছে, তারপর সেই সরু জমির ওপাশে ধীরে-ধীরে ডুবে যাচ্ছে অন্য এক সমুদ্রে উঠার জন্য। অতলান্তিক এখনো কিন্তু আলোয় ভরা। খোলা আকাশের নিচে এখনো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সে আবার পড়ে চললো :

আমার এই পীড়িত হৃদয়কে
তোমার পাহাড়ে আর অরণ্যে নিয়ে চলো।
নিয়ে চলো সবুজ মাঠে।

অবশেষে গোধূলির ভিতর সাদা কাগজের উপরকার অক্ষরগুলি হারিয়ে গেলো। এখানকার গোধূলি চোখের পাতা ফেলতে-না-ফেলতেই যেন শেষ হয়। কবিতার সেই পংক্তিটি—'উজ্জ্বল চেন্‌স্‌টোহোভাকে তুমি পাহারা দাও' তার সমস্ত মনকে ভরে তুললো আর তাকে যেন নিয়ে গেলো নানা ফসলের রঙিন নানা ক্ষেতে। আকাশের উপর সোনালি আর লাল রঙের আঁচড় তখনো জ্বলছে আর সেই ঔজ্জ্বল্যের উপর দিয়ে সে যেন উড়ে চলেছে তার পরিচিত প্রিয় দেশে। পাইন-অরণ্য তার কানে মর্মর তুলেছে। তার দেশের ঝর্ণার কুল-কুল স্বর যাচ্ছে শোনা। যেমনটি আগে ছিলো ঠিক সেইরকম সব কিছুই রয়েছে। তারা সবাই যেন তাকে প্রশ্ন করলো: মনে পড়ে কি আমাদের ?

তার মনে পড়ে না! বিশাল মাঠ সে দেখতে পাচ্ছে, সেই মাঠের মাঝখানে অরণ্য আর গ্রাম ছড়িয়ে রয়েছে। রাত হয়ে গেলো। এসময় সমুদ্রের অন্ধকারে তার লণ্ঠনের আলো পড়বার কথা; কিন্তু এখন সে তো নিজের জন্মভূমির গ্রামে রয়েছে। তার সাদা মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। আর সে স্বপ্ন দেখছে। এলোমেলো ভাবে তার চোখের উপর দিয়ে ছবির পর ছবি চলেছে ভেসে। যে-বাড়িতে সে জন্মেছিলো, সে-বাড়িটা তার নজরে পড়লো না। লড়াইতে সেটা গুঁড়িয়ে গেছে। তার বাবা-মাকে সে দেখতে পেলো না। তার শৈশবেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। তবু গ্রামের চেহারা দেখে মনে হয়, সে বুঝি গতকাল ছেড়ে এসেছে! কুটিরের জানলায়-জানলায় সেই আলো, সেই ঢিবি, সেই কারখানা, সেই দুটো পুকুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে; সমস্ত রাত ধরে সেই ব্যাঙের ডাকে কান পাতা দায়।

একবার সমস্ত রাত ধরে গ্রামটিকে সে পাহারা দিয়েছিলো।

অতীতের সেই স্মৃতি নানা ছবি হয়ে যেন তার সামনে পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো। উলানএ আবার সে পৌঁছেছে, আবার দাঁড়িয়েছে পাহারা দিতে। কিছুদূরে পাঠশালা, বিহ্বল হয়ে সে দেখতে লাগলো। রাত্রির নিস্তব্ধতার ভিতর কী হল্লা আর গান আর চিৎকার চলেছে! বেহালার সঙ্গে আরো নানা যন্ত্র গলা মিলিয়েছে। আর একটি স্বর যেন ভেসে উঠেছে, 'উ-হা! উ-হা!'

তারপর এই উলান গ্রামের লোকেরা ঘোড়ার নাল দিয়ে আগুনটা ফেলে দিলো। ঘোড়ার উপর বসে-বসে বেজায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ধীরে-ধীরে প্রহর বয়ে চলেছে। অবশেষে আলোগুলি নিভলো। যতদূর এখন দৃষ্টি চলে শুধু কুয়াশা। সে কুয়াশা বুঝি ভেদ করা যাবে না! মাঠ থেকে কুয়াশার দল এইবার উঠে মেঘ হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে যেন আলিঙ্গন করছে। দেখলে তোমার মনে হবে পুরো একটি সমুদ্রই বুঝি। ওগুলো কিন্তু মাঠ। এখনই অন্ধকারের ভিতর পাখির ডাক শোনা যাবে, আর বন-জঙ্গলের ভিতর থেকেও ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করবে। কী শীতল আর শান্ত রাত! সত্যি কথা বলতে কি, পোল্যাণ্ড ছাড়া এ-রকম রাত আর কোথাও নেই! বাতাস না থাকা সত্ত্বেও দূরের পাইন-অরণ্য থেকে মর্মর উঠেছে। যেন দূরাগত সমুদ্রের ডাক। এখনই ঊষার আলোয় পূর্বাকাশ সাদা হয়ে যাবে। সত্যিই তো, বেড়ার ওপাশে মুর্গিগুলো ডাকতে শুরু করেছে। কুটির থেকে কুটিরে একের উত্তরে আর একজন সাড়া দিচ্ছে। উপরের আকাশে সারসগুলো ডেকে চলেছে। সমস্ত উলান গ্রাম যেন আরো সুন্দর আর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কে যেন আগামী কালের লড়াইয়ের কথা বলছিলো। অন্য সব কাজের মতো সে-লড়াইও শেষ হবে বৈকি—শোনা যাবে হল্লা, উড়বে পতাকা। তার তরুণ রক্ত যেন দামামা-ধ্বনির মতো কেঁপে-

কেঁপে উঠছে। রাত্রি তাকে শীতল করা সত্ত্বেও রক্ত যেন ফুটছে। কিন্তু ঐ তো ভোর হয়ে এলো। ইতিমধ্যেই অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। আর সেই ছায়ার ভিতর থেকে যেন বেরিয়ে আসছে অরণ্য আর ঝোপঝাপ, সারিসারি বাড়ি, কলকারখানা, পপলার গাছ। কুয়োটা কিচকিচ. করছে, যেন মিনারের উপর থেকে ধাতুর পতাকা শব্দ করে উড়ছে। গোলাপি আলোয় উজ্জ্বল এই দেশকে কী ভালোই সে বাসে! পৃথিবীতে কেবল ঐ একটি দেশই আছে, কেবল ঐ একটিমাত্র দেশ!

চুপ! সেই সজাগ পাহারাদারের কানে এলো কার যেন পায়ের শব্দ। না, অন্য কিছু নয়। এবারে তার জায়গায় পাহারা দিতে অন্য লোক আসছে।

অকস্মাৎ স্কাভিন্সকির মাথার উপর থেকে কে যেন বলে উঠল—

আরে বুড়ো, তুমি এখানে! উঠে পড়। ব্যাপার কী?

চোখ খুলে তার সামনের লোকটিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে বৃদ্ধ দেখতে লাগলো। স্বপ্নে-দেখা ছবিগুলি এখনো তার মনের ভিতর যেন ভিড় করে রয়েছে। অবশেষে আবছা হয়ে সমস্ত স্বপ্নটাই মিলিয়ে গেলো। তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দরের পথপ্রদর্শক জন্‌সন্‌।

জন্‌সন্‌ প্রশ্ন করলো, ব্যাপার কী? তোমার কি অসুখ হয়েছে?

না।

লণ্ঠন জ্বালাতে তুমি ভুলে গিয়েছিলে। তাই তোমার চাকরি গেছে। সেণ্ট জেরোমএর একটি জাহাজ পাথরে ধাক্কা খেয়ে ডুবেছে। কী ভাগ্যি কেউ মরেনি! নইলে তোমাকে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হতো। আমার সঙ্গে নৌকোয় উঠে বস। মার্কিন প্রতিনিধির কাছ থেকে বাকিটা শুনো।

তার কথা শুনতে-শুনতে বৃদ্ধ বিবর্ণ হয়ে গেলো। সত্যিই তো, গত রাত্রে লণ্ঠনটা সে জ্বালাতে ভুলে গিয়েছে!

কয়েকদিন পরে স্কাভিন্সকিকে দেখা গেলো এ্যাসপিনওয়াল থেকে ন্যু-ইয়র্কগামী এক জাহাজের ডেকএ। বেচারার চাকরি গেছে। তার সামনে আবার ভবঘুরের নতুন রাস্তা প্রসারিত। ঝড়ে আবার সেই পাতাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, নানা দেশ নানা সমুদ্রের উপর দিয়ে। সে-ঝড় নিজের খেয়ালমতো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এই ক-দিনে বৃদ্ধের স্বাস্থ্য ভয়ানক ভেঙে গেছে, তার সোজা শরীরটা গেছে দুমড়ে। শুধু তার দু-চোখে উজ্জ্বল এক আলো। তার জীবনের নতুন পথের সঙ্গী শুধু বই। মাঝে-মাঝে সেই বইটিকে সে বুকের উপর চেপে ধরছে। কেবলই ভয় হচ্ছে, এই বুঝি বইটিও তাকে ছেড়ে চলে যায়!

অনুবাদ—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



ভাই-ভাই

বি. বিয়র্নসন

শিক্ষকমশায়ের নাম ছিলো বার্ড। তার একটি ভাই ছিলো। নাম এ্যাণ্ডার্স। দুজনে খুব ভাব। একসঙ্গে তারা সৈন্যদলে নাম লেখালো, সহরে বাস করলো একসঙ্গে, একসঙ্গে যুদ্ধে গেলো, রইলো একই সৈন্যদলে, আবার দুজনই প্রমোশন পেলো কর্পোর‍্যাল পদে। যুদ্ধ থেকে যখন তারা বাড়ি ফিরলো, সবাই বললো ফিরে এসেছে দুটি নওজোয়ান।

তারপর তাদের বাপ মারা গেলো। তিনি রেখে গেলেন অনেক সম্পত্তি। সে আবার এমন সম্পত্তি যা ভোগ করা ভারি শক্ত। তাই তারা স্থির করলো, ঐ সম্পত্তি নিয়ে কিছুতেই কোনো বিরোধ তারা ঘটতে দেবে না। বরং সব সম্পত্তি তারা নিলামে বেচে দিয়ে টাকাটা সমান ভাগ করে নেবে। তারপর যার যতোটা ইচ্ছে কিনে নেবে। সেই ব্যবস্থাই করা হলো।

কিন্তু বাবার ছিলো একটা বড় সোনার ঘড়ি। আশেপাশে সবাই সে-ঘড়ির খবর জানতো, কারণ ও-অঞ্চলের লোকেরা সোনার ঘড়ি বলতে ঐ একটিই দেখেছে। সেই ঘড়িটি যখন নিলামে উঠলো অনেক ধনী লোকেই সেটা কিনতে চাইলো। কিন্তু দুই ভাই-ই যখন নিলাম ডাকতে শুরু করলো তখন তারা সবাই সরে দাঁড়ালো। এদিকে বার্ড ভাবছে, ঘড়িটা যাতে সে পেতে পারে এ্যাণ্ডার্স নিশ্চয়ই সেইমতো কাজ করবে। আবার এ্যাণ্ডার্সও বার্ডের সম্বন্ধে সেই এক কথাই ভাবছে। ক্রমে ড়াক উঠতে লাগলো। দুজনেই ডাকে আর দুজনের দিকে কটমট করে

তাকায়। ঘড়ির দাম যখন কুড়ি ডলারে উঠলো তখন বার্ডের মনে হলো, ছোট ভাই কাজটা ভালো করছে না। সেও ডাক বাড়াতে বাড়াতে প্রায় ত্রিশে উঠলো। কিন্তু এ্যাণ্ডার্স তাতেও হটলো না দেখে বার্ড মনে-মনে ভাবলো, ওকে যে আমি কতো ভালোবাসি সে কথা আজ এ্যাণ্ডার্স ভুলে গেছে; তা ছাড়া সে তো বড় ভাই। ঘড়ির দাম উঠলো ত্রিশে। এ্যাণ্ডার্স তবু ডাকছে। বার্ড তখন এক ডাকে দাম তুললো চল্লিশ ডলারে। ভাইয়ের মুখের দিকে এবার সে তাকিয়েও দেখলো না।

নিলাম-ঘরের আবহাওয়া যেন ভারী হয়ে উঠেছে। বেলিফ শুধু টাকার অংকগুলো বলে চলেছে একটানা সুরে। সেখানে দাঁড়িয়ে এ্যাণ্ডার্স ভাবলো, বার্ড যদি ঘড়িটা তাকে দিতে গররাজি হয় তাহলে সে-ই বা ওটা নিতে পারবে না কেন? সে আবার ডাক বাড়ালো। বার্ডের মনে হলো, এতখানি অপমানিত সে এর আগে কখনো হয়নি। চাপা গলায় সে পঞ্চাশ ডলার ডাকলো। সেখানে লোক জমেছিলো অনেক। এ্যাণ্ডার্স নিজের মনে বললো, সব্বায়ের সামনে বার্ড তাকে হারিয়ে দেবে তা সে কিছুতেই হতে দেবে না। সে আবার ডাক চড়িয়ে দিলো। বার্ড হো হো করে হেসে উঠলো:

আমি দাম দিলাম একশো ডলার আর সেইসঙ্গে আমার ভ্রাতৃত্ব। এই কথা ক-টি বলেই সে ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

একটু পরে নিলামে নতুন-কেনা ঘোড়াটার পিঠে সে যখন জিন কসছিলো, তখন একটি লোক ঘর থেকে বেরিয়ে তার পাশে এলো।

ঘড়িটা আপনিই পেয়েছেন; এ্যাণ্ডার্স আর ডাকেনি।

খবরটা শোনামাত্রই তার বুকের ভিতরটা যেন অনুশোচনায় মোচড় দিয়ে উঠলো। মনে পড়লো ভাইয়ের কথা; ঘড়ির কথা

মুছে গেলো মন থেকে। ঘোড়ায় জিন আঁটা হয়ে গিয়েছিলো। তবু ঘোড়ার পিঠে হাত রেখে সে দাঁড়িয়েই রইলো। ঘোড়ায় চড়বে কি না ঠিক করতে পারছে না যেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো আরো অনেকে। এলো এ্যাণ্ডার্স'ও। সে যখন দেখতে পেলো বার্ড ঘোড়ার পিঠে জিন এঁটে যাবার জন্য প্রস্তুত, সে তখন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলো না বার্ডের মনের খবর।

সে চিৎকার করে বললো, ঘড়িটার জন্য ধন্যবাদ, বার্ড! তোমার ভাই আর কোনোদিন তোমার ছায়া মাড়াবে না!

তোমার দরজায়ও আমার ছায়া পড়বে না কোনদিন! বললো বার্ড। তারপর মুখ কালো করে ঘোড়ায় চড়ে বসলো।

সেইদিন থেকে বাবার সঙ্গে এতোকাল যে-বাড়িতে তারা বাস করে এসেছে সে বাড়ির দরজা আর কেউ কোনোদিন মাড়ালো না।

এর কিছুদিন পরেই এ্যাণ্ডার্স' এক জোতদারের মেয়েকে বিয়ে করলো। কিন্তু বিয়েতে বার্ডকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করলো না। বার্ডও গির্জেয় গেলো না। বিয়ের প্রথম বছরেই এ্যাণ্ডার্স' তার একটিমাত্র গাভীকে হারালো। বাড়ির উত্তর দিকে গাভীটা দিগড়ি দেওয়া ছিলো। সকালে দেখা গেলো সেখানেই সেটা মরে আছে। কিসে যে গাভীটা মরলো তা কেউ বলতে পারলো না। দুর্ঘটনা আরো অনেক ঘটলো। তার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগলো। কিন্তু সবচেয়ে বড় আঘাত সে পেলো যখন একদা শীতের রাত্রে তার খড়ের ঘরটা সম্পূর্ণ পুড়ে গেলো। কী করে যে আগুন লাগলো তা কেউ বলতে পারলো না।

এ্যাণ্ডার্স' বললো, এ-কাজ এমন কেউ করেছে যে আমার ক্ষতিই চায়। সারারাত সেদিন সে কাঁদলো। একেবারেই ফকির হয়ে গেলো সে। কাজ করবার কোনো প্রবৃত্তিই তার রইলো না।

অগ্নিকাণ্ডের পরদিন বার্ড তার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। এ্যাণ্ডার্স বিছানায় শুয়ে ছিলো। বার্ড ঘরে ঢুকতেই তড়াক করে উঠে বসলো।

কী চাও তুমি এখানে? প্রশ্ন করেই সে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো।

একটু চুপ করে থেকে বার্ড জবাব দিলো:

আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই এ্যাণ্ডার্স; তোমার অবস্থা বড় খারাপ হয়ে পড়েছে।

তুমি যা চেয়েছিলে তার চেয়ে খারাপ কিছু হয় নি! চলে যাও এখান থেকে—নইলে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারবো না হয়তো।

তুমি ভুল করছো এ্যাণ্ডার্স; আমি দুঃখিত—

তুমি চলে যাও বার্ড; নইলে কী যে ঘটবে তা ভগবানই জানেন!

বার্ড কয়েক পা পিছিয়ে গেলো। কাঁপা গলায় বললো, তুমি যদি ঘড়িটা চাও তো নিয়ে নাও।

ছোট ভাই আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, চলে যাও বার্ড, চলে যাও!

এর পর আর সেখানে থাকা চলে না। বার্ড চলে গেলো।

এ ক-দিন বার্ডের অবস্থা কেমন ছিলো তাই বলি। ভাইয়ের দুর্ঘটনার কথা শোনামাত্রই তার মনের অবস্থার পরিবর্তন হলো। কিন্তু অহংকার তার পথরোধ করে দাঁড়ালো। গির্জেয় যাবার ইচ্ছে জাগলো তার মনে। সেখানে অনেক ভালো শপথ সে গ্রহণ করলো। কিন্তু সাহসের অভাবে তার কোনোটাই কাজে পরিণত হলো না। মাঝে-মাঝে সে এতোদূর এগিয়ে যেতো যে বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যেতো। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কেউ

হয়তো বের হতো বাড়ি থেকে, নয়তো কোনো অতিথি-অভ্যাগত থাকতো সেখানে, অথবা এ্যাণ্ডার্স হয়তো বাইরে বসে কাঠ কাটতো—একটা-না-একটা বাধা এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়াতো।

কিন্তু শীতের শেষের এক রবিবারে সে আবার গির্জেয় গেলো। সেদিন এ্যাণ্ডার্সও সেখানে ছিলো। বার্ড তাকে দেখতে পেলো। সে অনেক কালো আর রোগা হয়ে গেছে। দুই ভাই একত্র থাকাকালে যে কাপড়-চোপড় সে পরতো তাই সে পরেছে সেদিন। অথচ সেসবই এখন পুরোনো হয়ে গেছে, আর নানা জায়গায় তালি মারা। যতোক্ষণ প্রার্থনা চললো এ্যাণ্ডার্স একদৃষ্টিতে পুরোহিতের দিকে চেয়ে রইলো। বার্ডের মনে হলো, ও বেশ শান্তশিষ্ট ; তার মনে পড়ে গেলো ছেলেবেলার কথা, এ্যাণ্ডার্স তখন কী ভালোই ছিলো! সেদিন বার্ড প্রার্থনায় পর্যন্ত যোগ দিলো ; ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করলো, যাই কেন ঘটুক না, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সব ব্যাপার সে এবার মিটিয়ে ফেলবে। এই প্রতিজ্ঞাই তার সারা অন্তরকে ছেয়ে রইলো। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর তার মনে হলো, এখনই সে গিয়ে ভাইয়ের পাশে বসবে ; কিন্তু কে যেন তার সামনে এসে দাঁড়ালো, আর এ্যাণ্ডার্সও মুখ তুলে একবার তাকালোও না। প্রার্থনা শেষ হবার পরেও বাধা-বিপত্তি রয়েই গেলো ; চারদিকে অনেক লোক রয়েছে ; এ্যাণ্ডার্সের স্ত্রী রয়েছে, অথচ তার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তাই সে স্থির করলো, বাড়িতে গিয়ে এ্যাণ্ডার্সের সঙ্গে দেখা করে শান্তভাবে তার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করাই ভালো।

সন্ধ্যার পরে সে যাত্রা করলো। একেবারে ঘরের দরজা পর্যন্ত গেলো। সেখানে থেমে কান পেতে শুনতে পেলো, এ্যাণ্ডার্সের স্ত্রী তারই নাম করছে।

স্ত্রী বলছে, আজ তিনি প্রার্থনায় গিয়েছিলেন। আমি নিশ্চয় জানি, তিনি তোমার কথাই ভাবছিলেন।

এ্যাণ্ডার্স জবাবে বললো, না না, আমার কথা সে ভাবছিলো না। তাকে আমি জানি ; সে শুধু নিজের কথাই ভাবে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো কথা শোনা গেলো না। সেই রাত্রেও সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বার্ড ঘামতে লাগলো। ঘরের ভিতরে এ্যাণ্ডার্সের স্ত্রী কেটলি নিয়ে কাজ করছে। উনুনে আগুন জ্বলছে শোঁ-শোঁ করে। একটি ছেলে কাঁদছে মাঝে-মাঝে। এ্যাণ্ডার্স তাকে দোলা দিচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে এ্যাণ্ডার্সের স্ত্রী আবার কথা বললো :

আমার মনে হয় মুখে স্বীকার না করলেও তোমরা দুজনেই দুজনের কথা ভাবছো।

এ্যাণ্ডার্স বললো, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করো।

একটু পরেই সে বাইরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। বার্ড তাড়াতাড়ি জ্বালানি কাঠের চালাটার মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। কিন্তু সেই সময়েই এ্যাণ্ডার্সও সেখানে গিয়ে হাজির হলো কিছু জ্বালানি কাঠ নিতে। ঘরের এক কোনে দাঁড়িয়ে বার্ড তাকে বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলো। রবিবারের শতচ্ছিন্ন পোশাকগুলো খুলে সে পরেছে তার ইউনিফর্ম। ঠিক অমনি একটা ইউনিফর্ম বার্ডেরও আছে। তারা পরস্পরকে কথা দিয়েছিলো, পোশাকগুলো কখনো পরবে না, ছেলেদের জন্য রেখে যাবে পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে। এ্যাণ্ডার্সের পোশাকটা এখন জীর্ণ হয়ে গেছে। তার অনেক জায়গায় জোড়াতালি মারা। তার সুগঠিত শক্ত চেহারাটাকে মনে হচ্ছে যেন ছেঁড়া কম্বলে মোড়া। এদিকে বার্ড নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে, তার পকেটের সোনার ঘড়িটা টিক-টিক করে বাজছে। এ্যাণ্ডার্স

জ্বালানি কাঠের কাছে গিয়েও তখুনি নিচু হয়ে কাঠের বোঝাটা না তুলে স্তূপাকৃত কাঠের উপর হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকালো। সারা আকাশে ঝকমক করছে তারার দল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আপন মনেই বলে উঠলো, ভগবান, হে ভগবান!

যতোদিন বেঁচে ছিলো, এই কথাগুলো বার্ড কোনোদিন ভুলতে পারেনি। একবার সে এগিয়ে যেতে চাইলো, কিন্তু ঠিক তখুনি ছোট ভাই একবার কেসে উঠলো। ফলে তার যাওয়া হলো না। জ্বালানি কাঠ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো এ্যাণ্ডার্স। সে বার্ডের এতো কাছ দিয়ে চলে গেলো যে জ্বালানির ডালপালাগুলো তার মুখ ছুঁয়ে গেলো।

আরো দশ মিনিট সে চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। আরো কতোক্ষণ সে সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো বলা যায় না। একে তার এই মানসিক অবস্থা, তার উপর একটা ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে তার সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করলো। বাধ্য হয়ে সে তাই বেরিয়ে গেলো। নিজের মনেই আর-একটা মতলব ঠিক করলো। ঘরের কোনের পিপে থেকে কয়েক টুকরো কয়লা সে তুলে নিলো। খুঁজে বের করলো আলকাতরা-মাখানো একটুকরো পাইন কাঠ। তারপর খড়ের ঘরে ঢুকে দরজা জানলা বন্ধ করে আলো জ্বালালো। মশালের আলোয় সে খুঁজতে লাগলো সেই হুকটা, খুব ভোরে গম ঝাড়তে এসে এ্যাণ্ডার্স যেটার গায়ে তার লণ্ঠনটাকে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর সোনার ঘড়িটা হাতে নিয়ে সেই হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। এতোক্ষণে তার মনটা এমন হাল্‌কা বোধ হতে লাগলো যে সে বরফের উপর দিয়েও ছেলেমানুষের মতো ছুটতে লাগলো।

পরদিন সে শুনতে পেলো, সেই রাতেই খড়ের ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হয়তো ঘড়িটা ঝুলিয়ে রাখবার সময় যে মশাল সে জ্বেলেছিলো তার থেকেই ছিটকে পড়েছিলো আগুনের ফুল্‌কি।

খবর শুনে বার্ড এতোই অভিভূত হয়ে পড়লো যে অসুস্থ মানুষের মতো সারাদিন সে একা কাটালো, আর প্রার্থনার বই বের করে ক্রমাগত গান করতে লাগলো। বাড়ির লোকেরা ভাবলো, নিশ্চয়ই তার কিছু হয়েছে। সন্ধ্যার দিকে সে বাইরে বের হলো। চারিদিক জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে। ধীরে ধীরে সে হাজির হলো ভাইয়ের বাড়িতে। অগ্নিকাণ্ডের ভস্মস্তূপের ভিতর খুঁজে খুঁজে বের করলো একতাল গলানো সোনা—ঘড়িটার একমাত্র চিহ্ন।

এইটি হাতে নিয়েই সে ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলো, ভেবেছিলো সব তাকে খুলে বলবে, মিটিয়ে ফেলবে সব বিরোধ। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় তার ফলে যা ঘটেছে তা তো আগেই বলা হয়েছে।

একটি ছোট মেয়ে তাকে ছাইয়ের গাদা হাতড়াতে দেখেছে নাচের আসরে যাবার পথে। কয়েকটি ছেলে তাকে দেখেছিলো রবিবার সন্ধ্যায় তার ভাইয়ের বাড়ির দিকে যেতে। পরদিন সোমবারে তার বিস্ময়কর ব্যবহারের কথাও সবার মনে পড়লো। তাছাড়া সবাই জানতো যে তারা দুই ভাই ছিলো পরম শত্রু। কাজেই সব কথা উপরওয়ালার কাছে পেশ করা হলো। একটা তদন্তও হলো। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারলো না। মানুষের মনের সন্দেহ তবু গেলো না। ফলে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার পথও যেন বন্ধ হয়ে গেলো।

খড়ের ঘর পুড়ে যাবার পরে এ্যাণ্ডার্সের মনেও বার্ডের কথা উঁকি দিয়েছিলো, কিন্তু কোনো কথাই সে বলেনি। পরদিন সন্ধ্যায়

বাড়ি ফিরে সে মনে-মনে বললো : নিশ্চয় বার্ডের অনুশোচনা হয়েছে, কিন্তু ভাইয়ের বিরুদ্ধে এই সাংঘাতিক অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। তারপরই সে শুনলো, অগ্নিকাণ্ডের দিন সন্ধ্যায় অনেকেই বার্ডকে তার বাড়ির দিকে যেতে দেখেছিলো। কাজেই তদন্তে কিছু প্রকাশ না পেলেও তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে বার্ডই আসল অপরাধী।

মামলার শুনানির দিন দুজনই হাজির হলো। বার্ড গেলো ভালো জামাকাপড় পরে, আর এ্যাণ্ডার্স গেলো ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে। এ্যাণ্ডার্স ঢুকতেই বার্ড তার দিকে চাইলো। এ্যাণ্ডার্সের মনে হলো, সে-দুটি চোখে যেন রয়েছে কতো আকুতি। এ্যাণ্ডার্স ভাবলো, বার্ড নিশ্চয়ই চাইছে আমি যেন কিছু না বলি। পরে তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো এ ব্যাপারে সে বার্ডকে সন্দেহ করে কি না, তখন সে স্পষ্ট কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে বললো, না !

সেদিনের পর থেকেই এ্যাণ্ডার্স সমানে মদ খেতে শুরু করলো। অচিরেই তার শরীরও ভেঙে পড়লো। আর, মদ না খেয়েও অধিকতর শোচনীয় অবস্থা হলো বার্ডের। তার চেহারা এতো খারাপ হয়ে গেল যে লোকে তাকে দেখে চিনতেই পারে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটি গরিব স্ত্রীলোক বার্ডের ছোট্ট ভাড়াটে ঘরে ঢুকে তাকে তার সঙ্গে যেতে বললো। দেখেই বার্ড তাকে চিনলো ; সে তার ভাইয়ের স্ত্রী। বার্ড তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলো ব্যাপার কী। তার মুখ মড়ার মতো সাদা হয়ে গেলো। কোনো কথা না-বলে সে জামা পরে তার সঙ্গে রওনা হলো। এ্যাণ্ডার্সের জানলা দিয়ে একটা ম্লান আলো আসছিলো। আলোটা কখনো কাঁপছে, কখনো ঢেকে যাচ্ছে। বরফ পড়ে পথ-ঘাট সব ঢেকে গেছে। সুতরাং সেই আলো লক্ষ্য করেই ওরা পথ চলতে লাগলো। বার্ড যখন আবার সে-বাড়ির দরজায় গিয়ে

দাঁড়ালো, একটা বিশ্রী গন্ধ এসে তাকে প্রায় অসুস্থ করে তুললো। ভিতরে ঢুকে দেখলো, একটা ছোট ছেলে উনুনের পাশে বসে পোড়া কয়লা খাচ্ছে। তার সারা মুখ কালিমাখা। তবু সে মুখ তুলে দু-পাটি সাদা দাঁত বের করে হেসে উঠলো। ওটি ছোট ভাইয়ের ছেলে।

বিছানায় নানারকম কাপড় চাপা দিয়ে শুয়ে আছে এ্যাঙ্গার্স। মলিন কংকালসার চেহারা তার। উঁচু কপালটা চকচক করছে। ফাঁকা দৃষ্টি মেলে সে তাকালো দাদার দিকে। বার্ডের হাঁটুদুটো ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলো। বিছানার পায়ের কাছে বসে সে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। ছোট ভাই একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো। কোনো জবাব দিলো না। অবশেষে সে তার স্ত্রীকে বাইরে যেতে বললো, কিন্তু বার্ড তাকে ইংগিতে থাকতে বললো।

তারপর দুই ভাইয়ে অনেক কথা হলো। ঘড়ি নিলামের দিন থেকে আরম্ভ করে আজকের এই শেষ সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত যার যা কথা সব খুলে বললো। কথার শেষে বার্ড একতাল সোনা বের করলো। এই সোনাটুকু সে সব সময় সঙ্গে নিয়েই ফিরতো। আলোচনার ভিতর দিয়ে এই সত্যই প্রকাশিত হলো যে, এই ক-বছরের ভিতর একটি দিনের জন্যও তারা কেউ সত্যিকারের সুখী হতে পারে নি।

এ্যাঙ্গার্স বেশি কথা বলতে পারলো না, কারণ সে-শক্তি আর তার ছিলো না। কিন্তু এ্যাঙ্গার্স যতোদিন অসুখে ভুগলো বার্ড কখনো তার রোগশয্যার পাশ থেকে গেলো না।

শেষে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এ্যাঙ্গার্স বললো, আজ আমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছি। দ্যাখো বার্ড, এবার থেকে আমরা আগেকার দিনের মতোই সব সময় এক সঙ্গে থাকবো, কখনো কেউ কাউকে ছেড়ে যাবো না।

কিন্তু সেইদিনই সে মারা গেলো।

তার বিধবা স্ত্রী আর শিশুটিকে বার্ড তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো। তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করলো। কিন্তু সেদিন শয্যাপার্শ্বে দুই ভায়ের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিলো, ঘরের আর রাতের অন্ধকার পার হয়ে তা বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। সে-অঞ্চলের সবাই সে-কথা জানতে পেলো। সেই থেকে সকলেই বার্ডকে সম্মান করতে লাগলো। তারা তাকে সম্মান করতো এমন একটি লোক ভেবে, যে মহৎ দুঃখের শেষে আবার ফিরে পেয়েছে মনের শান্তি; অথবা দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে যে আবার ফিরে এসেছে ঘরে। আর তাদের সকলের সহৃদয়তার গুণে বার্ডও ফিরে পেলো তার মনের জোর। মহৎ হলো তার অন্তর। সকলের সেবা করবার আশায় প্রধান কর্পোর্যাল হলো স্কুলের শিক্ষক। ছেলেমেয়েদের সে সবচেয়ে বেশি করে শেখাতো ভালোবাসা, আর নিজের জীবনে সেই শিক্ষাকে রূপ দিতো। ক্রমে ছেলেমেয়েরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করলো খেলার সাথীর মতো, তাদের পিতার মতো।

অনুবাদ—মণীন্দ্র দত্ত

বিশ বছর পরে

ও. হেনরি

তখন রাত বেশি হয়নি, দশটা বাজতে মিনিট কয়েক বাকি, কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিলো আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিলো বলে রাস্তা তখনই জনশূন্য হয়ে গিয়েছিলো। বীটের পাহারাওলা ভারিক্কি চালে রাস্তায় পায়চারি করছিলো, কিন্তু তার এ ভারিক্কি চাল অপরকে দেখাবার জন্যে নয়, এ তার স্বভাবসিদ্ধ; কারণ রাস্তায় তখন লোক-চলাচল নেই বললেই চলে।

রাস্তার দু-পাশের বাড়িগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে, বাড়িগুলোর দরজা বন্ধ আছে কি না পরীক্ষা করতে-করতে, হাতের লাঠিটা নানা বিচিত্র কায়দায় ঘুরোতে-ঘুরোতে সে চলছিলো। মাঝে-মাঝে মাথাটা ঘুরিয়ে পেছন পানে অতিক্রান্ত পথের উপর নজর বুলিয়ে সে যখন তার বিরাট কলেবর নিয়ে হেলে দুলে চলছিলো তখন তাকে দেখে সহরের শান্তিরক্ষক বলে ধারণা করে নিতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়। রাত গভীর হবার আগেই ঐ এলাকায় সব নিঃঝুম হয়ে পড়ে। মাঝে-মাঝে হয়তো কোনো সিগার-স্টোর বা রেস্তোরাঁর আলো নজরে পড়তে পারে, কিন্তু তখনকার বেশির ভাগ দোকান-পাটই অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

একটা বড় বাড়ির মাঝামাঝি এসে পুলিশম্যান হঠাৎ তার দ্রুতগতি শিথিল করলে। একটি লোহালক্কড়ের দোকানের অন্ধকার দুয়ারে হেলান দিয়ে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার সিগারেট, কিন্তু তখনো তাতে আগুন ধরানো হয়নি।

পুলিশম্যানকে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটি তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললে: সন্দেহ করবার কিছু নেই, অফিসার। আমি এক বন্ধুর জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি। বিশ বছর আগে তার সঙ্গে কথা হয়েছিলো আজ এখানে দেখা করবার। কথাটা খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে, না?...কিন্তু আমি যে মিথ্যা বলছি নে এ সম্বন্ধে তুমি যদি নিঃসন্দেহ হতে চাও, তবে আমি সমস্ত ব্যাপারটা তোমায় বলতে রাজি আছি। ঠিক এই জায়গায় একটি রেস্তোরাঁ ছিলো বিশ বছর আগে, তার নাম ছিলো বিগ্ জো ব্রাডিস্ রেস্তোরাঁ।

হ্যাঁ, পাঁচ বছর আগেও এখানে সেই রেস্তোরাঁটা ছিলো,—পুলিশম্যান বললে,—তারপর সেটা ভেঙে ফেলা হয়। দুয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো লোকটি দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালে। দেশলাইয়ের আলোয় তার মুখটা দেখা গেলো: ফ্যাকাশে মুখ, চৌকো চোয়াল, চোখদুটি খুব তীক্ষ্ণ, ডানদিকের ভুরুর নিচে একটা কাটা দাগ। তার স্কার্ফপিনটায় বেখাপ্পাভাবে বসানো বড়ো একটি হীরে,—অন্ধকারে ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলছে।

বিশ বছর আগে ঠিক এই তারিখে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে লোকটি বলতে শুরু করে,—রাত্রিবেলায় আমি আর আমার বন্ধু জিমি ওয়েল্‌স্ একসঙ্গে বসে এই রেস্তোরাঁয় আহার করেছিলুম। জিমি ছিলো আমার সেরা বন্ধু—অমন ছেলে দুনিয়ায় দ্বিতীয় খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা দু-জনে দুই ভাইয়ের মতো এই ন্যু ইয়র্ক সহরে একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলুম। আমার বয়েস ছিলো তখন আঠারো, আর জিমির কুড়ি। পরের দিন সকাল-বেলায় ভাগ্য পরীক্ষা করতে আমার পশ্চিমে যাত্রা করবার কথা। জিমিকে কিছুতেই ন্যু ইয়র্ক ছাড়তে রাজি করাতে পারলুম না। তার মত অনুযায়ী ন্যু ইয়র্কের চেয়ে ভালো জায়গা নাকি

পৃথিবীতে আর নেই। যাই হোক,—সে-রাত্রে আমরা পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম যে, যেখানেই আমরা থাকি না কেন আর যেমনই আমাদের অবস্থা হোক না কেন, ঠিক বিশ বছর পরে আমরা আবার এই তারিখে এখানে মিলিত হবো। আমরা হিসেব করে দেখেছিলুম যে, বিশ বছরের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই ভাগ্য একরকম নির্ধারিত হয়ে যাবে, তা সে যা-ই হোক না কেন।

ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। পুলিশম্যান বললে, মাঝখানে সময়ের ব্যাবধান অনেকটা—খুব বেশিই বলতে গেলে।···আচ্ছা, ছাড়াছাড়ি হবার পর বন্ধুর কাছ থেকে কোনো খবর পাননি?

হ্যাঁ, কিছুকাল আমরা পরস্পরকে চিঠি-পত্র লিখেছিলুম,—লোকটি উত্তর দেয়,—কিন্তু বছর-দুই পরে আমরা পরস্পরের আর কোনো সন্ধান পাইনি। জানোই তো, পশ্চিমে কাজের ক্ষেত্রটা খুব বিরাট, আর আমাকে নানান কাজে কেবলই চরকির মতো চারদিকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, জিমি যদি জীবিত থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসবে—কারণ জগতে তার মতো বিশ্বস্ত বন্ধু খুব কমই দেখা যায়। সে যে কখনো তার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলবে না এ আমি জানি। হাজার মাইল দূর থেকে আমি আজ এখানে এসেছি প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্যে। আমার এ কষ্ট সার্থক হবে যদি জিমি এসে দেখা করে। লোকটি পকেট থেকে একটি সুন্দর ঘড়ি বার করলে,—ডালাটা তার ছোট-ছোট হীরেয় খচিত। ঘড়ির দিকে চেয়ে সে বললে, দশটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। রেস্তোরাঁর দরজার কাছে আমরা যখন পরস্পরের কাছে বিদায় নিই, তখন ঠিক দশটাই বেজেছিলো।

পশ্চিমে আপনার কাজকর্ম বেশ ভালোই চলছিলো, তাই না? পুলিশম্যান শুধোয়।

এই ক-বছরে আমি যে সাফল্য অর্জন করেছি তা আশাতীত। আশা করি, জিমিও তার অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছে—আমার মতো না-হোক খানিকটা অন্তত। জিমি ছিলো একটু আলসে ধরনের, কাজকর্মে তার খুব উৎসাহ ছিলো না। আর একটু ভালোমানুষও বটে। পয়সা রোজগার করতে গিয়ে আমায় এমন সব লোকের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছে, যাদের বুদ্ধির কাছে বড় বড় ধুরন্ধরেরাও হার মেনে যাবে। ন্যু ইয়র্কে বুদ্ধির চর্চা করবার দরকার হয় না মোটে। লোকে এখানে বেশি দিন থাকলে গর্দভ বনে যায়। কিন্তু পশ্চিমে বুদ্ধি ছাড়া এক পা-ও চলা যায় না। ওখানে কিছুদিন থাকলে আপনা থেকেই বুদ্ধিটা শান-দেওয়া ক্ষুরের মতো ধারালো হয়ে ওঠে।

পুলিশম্যানটি তার হাতের রুল ঘোরাতে-ঘোরাতে দুই-এক পা এগিয়ে গেলো: আমি এখন তাহলে চলি। আশা করি আপনার বন্ধু এক্ষুনি এসে পড়বে। আপনি কি তার জন্যে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন?

হ্যাঁ, অপেক্ষা করবো বৈকি। অন্তত আধ ঘণ্টা তো বটেই। জিমি যদি বেঁচে থাকে, ততোক্ষণে সে এসে পড়বে নিশ্চয়ই। গুডনাইট, অফিসার।

গুডনাইট স্যর। পথ চলতে-চলতে পুলিশম্যান শুভরাত্রি জানালে।

বৃষ্টি এখন একটু জোরে নেমে এসেছে, আর বাতাসের বেগও বেড়ে গেছে যেন। তখনো যে-কজন পথচারী পথের উপর ছিলো, তারা অত্যন্ত বিব্রতভাবে কোটের কলার উঁচু করে তুলে, হাতদুটো পকেটে ভরে হন হন করে চলতে শুরু করলো। আর

সেই লোকটি,—বাল্যবন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে যে হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে,—লোহার দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করবার পর লম্বা ওভারকোট গায়ে একজন দীর্ঘাকৃতি লোক রাস্তার ও-ধার থেকে হনহন করে এগিয়ে এলো। ওভারকোটের কলারে তার কান পর্যন্ত ঢাকা। সে সোজা এগিয়ে এলো পশ্চিম-ফেরৎ সেই লোকটির কাছে।

কে, বব্ নাকি? সংশয়ের সুরে জিজ্ঞেস করলে আগন্তুক।

কে, জিমি ওয়েল্‌স্? উৎফুল্লভাবে দুয়ারের দেহলির কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটি এগিয়ে গেলো।

কী সৌভাগ্য আমার! আগন্তুক অপর জনের হাতদুটি সোৎসাহে নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে।

আমি জানতুম তোমায় এখানে নিশ্চয়ই দেখতে পাবো, যদি তুমি আজও জীবিত থাকো।...বিশ বছর অনেক সময়,—নয় কি! পুরোনো রেস্তোরাঁ উঠে গেছে—থাকলে ভারি ভালো হতো, আমরা আরেকবার একসঙ্গে আহার করতুম। পশ্চিমে তোমার সুবিধে কেমন হয়েছে, বব্?

সুবিধে? আমি যা চেয়েছিলুম, সবই পেয়েছি। তুমি কিন্তু ভারি বদলে গেছো, জিমি। তোমায় দেখে চিনতে পারাই মুশকিল —মাথায় প্রায় দু-তিন ইঞ্চি বেড়ে গেছো।

হ্যাঁ, কুড়ি বছর বয়েসের পর আমি একটু বেড়েছি বটে।

ন্যু ইয়র্কে তোমার চলছে ভালো?

মাঝামাঝি। সরকারি একটা চাকরি করি। কোনো রকমে দিন চলে যায়। এসো বব্, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই। চলো, আমার চেনা একটা জায়গায় তোমায় নিয়ে যাই। সেখানে বসে পুরোনো দিনের কথা সব গল্প করা যাবে।

দু-জনে হাত-ধরাধরি করে রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলো। পশ্চিম-ফেরৎ লোকটি সাফল্যের গর্বে তার এই বিশ বছরের ইতিহাস বলতে শুরু করলে। ওভারকোট-পরা অপর ব্যক্তি বেশ কৌতূহলী হয়েই তার কাহিনী শুনতে লাগলো।

রাস্তার মোড়ে একটা ওষুধের দোকান বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছে। যখন তারা ঐ আলোর সামনে এসে উপস্থিত হলো, তখন উভয়েই মুখ ফিরিয়ে একে অন্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

পশ্চিম-ফেরৎ লোকটি থমকে এক হ্যাঁচকায় হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে। ক্রুদ্ধ গলায় বললে, তুমি তো জিমি ওয়েল্‌স্‌ নও! বিশ বছর লম্বা সময় বটে, কিন্তু এতো লম্বা নয় যে, টিকোলো নাককে বদলে থ্যাবড়া করে দেবে।

তা না দিক, কিন্তু ভালো লোককে বদলে মন্দ করে দেয় তো! লম্বা লোকটা বললে, দশ মিনিট আগে তুমি ধরা পড়েছো, অতি-চালাক বব্। শিকাগো পুলিশের সন্দেহ ছিলো তুমি হয়তো এখানে এসেছো, তাই আমাদের তার করে জানিয়েছে তোমার সঙ্গে তারা একটু আলাপ করতে চায়। ভালোমানুষের মতো যাবে, না গণ্ডগোল করবে পথে?…হ্যাঁ, তোমার বুদ্ধি আছে, দেখছি। গোলযোগ করে লাভ নেই। তা দ্যাখো, থানায় যাবার আগে এই চিঠিটা তোমায় দেবার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়েছি আমি। এই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চিঠিটা তুমি পড়তে পারো। চিঠিটা দিয়েছে কনস্টেবল জিমি ওয়েল্‌স্‌।

পশ্চিম-ফেরৎ লোকটি কম্পিত হাতে চিঠিখানা খুললে। যখন সে ওটি পড়তে শুরু করলে, তখন অনেক চেষ্টা করে সে হাত স্থির, অচঞ্চল রাখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পড়া শেষ করার সময় তার হাত ঈষৎ কেঁপে উঠলো আবার। চিঠিটা ছোট্ট। তাতে লেখা:

বব, আমি ঠিক সময়েই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়েছিলুম। যখন তুমি সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বাললে, আমি দেখলুম, শিকাগো পুলিশ যার সন্ধান করছে, তোমার মুখ অবিকল তারই মতো। নিজের হাতে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে আমার ইচ্ছে হলো না, তাই তোমার কাছে বিদায় নিয়ে সাধারণ পোশাক-পরা একজন পুলিশ কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিলুম। প্রীতি ইত্যাদি।

তোমার জিমি।

অনুবাদ—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চোরাই চিঠি

এডগার এ্যালান পো

স্থান: ৩৩নং রু ডুনো, ফুবোর্গ, স্যাঁৎ জারমেন, প্যারিস; আমার বন্ধু আগস্ত ডুপোঁর বাসার পিছন দিকের ছোট্ট লাইব্রেরি ঘর। কাল: ১৮—সালের শরৎ কালের একটি সন্ধ্যা। বাইরে সবে অন্ধকার নেমেছে, হু হু বাতাস বইছে। ঘরের মধ্যে বন্ধুর সাহচর্য, মাথায় কল্পনাবিলাস ও মুখে পাইপের মধুর আরাম। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা। অন্য যে-কেউ আমাদের দেখলে ভাববে আমাদের নিবিড় ও ঐকান্তিক আগ্রহ কেবল তামাকের প্রতি, যার কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার রাশি সারা ঘরটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আসলে সন্ধ্যার আগে বন্ধুর সঙ্গে যে-বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে, সেই বিষয়বস্তু নিয়েই আমি মানসিক রোমন্থন করছি। বিষয়টা আর কিছু নয়, রু মর্গের ঘটনাবলী আর মেরি রজেটের মৃত্যুরহস্য। এমনি সময় দরজাটা ঠেলে বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলেন প্যারিস পুলিশবাহিনীর কর্তা মসিয়েঁ জি—।

আমরা সাদর সম্ভাষণ জানালাম আগকন্তুকে; কেননা লোকটির চরিত্রের আধাআধি যেমন বিতৃষ্ণাকর, আবার আধাআধি তেমনি আনন্দদায়ক বটে। এছাড়া, অনেক বছর পরে দেখা। আমরা অন্ধকারে বসে ছিলাম। আলোটা জ্বালবার জন্যে ডুপোঁ উঠে দাঁড়ালো। মঁসিয়ে জি—বললেন, একটা কষ্টকর ও জটিল সরকারি ব্যাপারে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে, বা আমার বন্ধুর মতামত নিতে এসেছেন। ডুপোঁ আলোটা না

জ্বেলেই বসে পড়লো, বললে,—বুঝলাম, মনটাকে সন্নিবিষ্ট করতে হবে : এর পক্ষে অন্ধকারই ভালো।

পুলিসের প্রিফেক্ট বললেন,—এই তোমার এক অদ্ভুত খেয়াল। আসলে নিজের ধ্যান-ধারণার বাইরে যা কিছু সবই প্রিফেক্টের কাছে অদ্ভুত খেয়াল বলে নির্দিষ্ট হতো। এর ফলে তাঁর চারদিকে অসংখ্য অদ্ভুতের পাহাড় জমে থাকতো সর্বদা।

ঠিক বলেছো,—এই বলে ত্বপোঁ তাঁর কাছে এগিয়ে দিল একটি তামাকের পাইপ আর একটা নরম চেয়ার।

আমি প্রশ্ন করলাম,—ব্যাপারটা কী? খুন-টুন নয় তো?

না, না, না, না—সেসব কিছুই নয়, ব্যাপারটা জলের মতো সোজা, এ আমরা নিজেরাই গুছিয়ে আনতে পারি। তবে আমি ভাবলাম, ত্বপোঁর হয়তো সব ঘটনাটা শুনতে ভালোই লাগবে। মানে, ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত কিনা!

ত্বপোঁ বললে,—বটে? সহজও বটে, আবার অদ্ভুতও বটে, তাই না?

এই যা বলেছ। তবে কিনা, খুব একটা কিছু নয়। আসলে কী জানো,—ব্যাপারটা এত সহজ বলেই আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে, রহস্যটা কিছুতেই ভেদ করতে পারছি নে।

হয়তো রহস্য কিছুই নেই, আমার বন্ধু উত্তর দিলো,—হয়তো সহজ বলেই শক্ত!

এইতো আবার বাজে বকতে শুরু করলে! হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লেন প্রিফেক্ট।

ত্বপোঁ বললে,—বাজে কথা নয়, সত্যি হয়তো রহস্যটা একটু অতিরিক্ত রকমের সোজা!

নাও, এবার সামলাও! এমন হেঁয়ালি কথা কে কবে শুনেছে!

না না, সত্যি হয়তো তোমার সমস্যাটা বড় বেশি রকমের স্পষ্ট!

দুপোঁর কথা বড়ো বেশি উদ্ভট হয়ে উঠছে। হাসির দমক সামলাতে সামলাতে প্রিফেক্ট বললেন,—মারবে তুমি আমাকে হাসিয়ে হাসিয়ে!

আমি মাঝে পড়ে বললাম,—যাই হোক, ব্যাপারটা কী শুনিই না!

বেশ, বলছি তবে। প্রিফেক্ট গুছিয়ে বসলেন চেয়ারে, পাইপে দিলেন কয়েকটা সুদীর্ঘ চিন্তান্বিত টান। তারপর বলতে লাগলেন,—অল্প কথায় ব্যাপারটা বলছি, তবে গোড়াতেই আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি যে ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, কারুর কাছে আমি ভেঙেছি এ যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তো চাকরিটি আমার যাবে।

আমি বললাম,—বলুন।

দুপোঁ বললে,—কিংবা বোলো না।

না, না, শোনো মন দিয়ে। মস্ত এক অভিজাত মহল থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খবর দেয়া হয়েছে যে রাজপ্রাসাদ থেকে একটা অমূল্য দলিল চুরি গেছে। কে যে এ-কাজ করেছে তাও অজানা নেই, দলিলটা হস্তগত করতে তাকে দেখা গেছে এবং এটা এখনো তার কাছেই আছে।

হুঁ, কিন্তু শেষেরটা জানা গেলো কী করে? দুপোঁ প্রশ্ন করলে।

প্রিফেক্ট উত্তর দিলেন,—দলিলটার প্রকৃতি থেকেই এটা বোঝা যায়। যে চুরি করেছে তার কাছে যদি এটা এখন না থাকতো অর্থাৎ যে জন্যে এটাকে চুরি করা সেকাজে যদি এটাকে লাগানোই হতো, তাহলে যে-সব পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, সেগুলো এখনো হয়নি।

আমি বললাম,—আর একটু পরিষ্কার করে ব্যাপারটা ভাঙুন না।

প্রিফেক্ট কূটনৈতিক চালে মাথা নেড়ে বললেন,—এটুকু অবশ্য বলতে বাধা নেই যে, এই কাগজটার যে অধিকারী, কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অসীম ক্ষমতারও সে অধিকারী।

এখনো কিছুই বুঝতে পারছি নে,—মুখ ফেরালো ছপোঁ।

বুঝতে পারছ না! ধরো এই কাগজটা তৃতীয় কোনো অজানা ব্যক্তির কাছে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে একজন বড় ঘরের মস্ত সম্মানী ব্যক্তির মান-সম্মান ধুলোয় লুটোবে। তাঁর সম্মান এমনি ভয়ানকভাবে বিপন্ন বলেই এই কাগজটা যে চুরি করেছে সে তাঁকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম,—কিন্তু চোরের এই যে ক্ষমতা এ তো সম্ভব কেবল চোর যদি জানতে পারে যে, সে-ই যে চোর যার জিনিস চুরি গিয়েছে সে তা জানে। এমন সাহস কোন্ চোরের আছে যে—

মসিয়েঁ জি—বললেন,—সব খুলেই তাহলে বলি : চোর হচ্ছে মন্ত্রী ডি—। মানুষের পক্ষে সম্ভব অসম্ভব এমন কোনো কাজ নেই যা করতে এ লোক ডরায়। চুরিটা সে করেছেও এমনিভাবে যাতে সাহসের দরকার যেমনি, তেমনি দরকার বুদ্ধির। স্পষ্টই বলি, কাগজটা হচ্ছে একটা চিঠি, রাজপ্রাসাদের একজন বিখ্যাত মহিলাকে লেখা। প্রাসাদের মধ্যে নিজের ঘরে যখন চিঠিটি তাঁর হাতে আসে, তখন সে-ঘরে আর কেউ ছিল না। একলা চিঠিটি পড়ছেন, হঠাৎ বাধা উপস্থিত হলো। ঘরে ঢুকলেন তৃতীয় ব্যক্তিটি, বিশেষ করে যাঁর কাছ থেকেই এই চিঠি তিনি গোপন রাখতে চান। একবার তাড়াতাড়ি বৃথা চেষ্টা করলেন চিঠিটা একটা ড্রয়ারের মধ্যে পুরতে ; না পেরে খোলাখুলি চিঠিটা একটা টেবিলের ওপর ফেলে রাখলেন। চিঠির বিষয়বস্তু ছিলো পিছন দিকে, ঠিকানাটা ছিলো ওপরে। তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। এমন সময় ঢুকলেন মন্ত্রী ডি—। তাঁর কুটিল চোখে মুহূর্তে ধরা পড়লো

চিঠিটা, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন ঠিকানার হাতের লেখাটা কার। মহিলাটির অপ্রস্তুত ভাব তাঁর চোখ এড়ালো না, বুঝতে দেরি হলো না মহিলাটির গোপন রহস্য। স্বভাবসুলভ ব্যস্ততার সঙ্গে ডি—কয়েকটা কাজের কথা সারলেন, তারপর টেবিলের চিঠিটার মতো অনেকটা এক রকম দেখতে একটা কাগজ পকেট থেকে বের করে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে পড়ার ভাণ করে সেটাকে টেবিলের ওপর ঠিক চিঠিটার কাছে রাখলেন। তারপর আরো মিনিট-পনেরো নানা সরকারি আলোচনা করলেন। শেষ পর্যন্ত বিদায় নেবার সময় টেবিল থেকে নিজের কাগজটা তুলে নেবার বদলে অপর চিঠিটাই তুলে নিলেন। চিঠির মালিকের চোখে সবই ধরা পড়লো, কিন্তু পাশেই তৃতীয় পুরুষের উপস্থিতি, টুঁ শব্দটি করতে পারলেন না। নিজের বাজে কাগজটা টেবিলে ফেলে আসল চিঠিটি পকেটে পুরে চম্পট দিলেন।

চমৎকার!—আমার দিকে তাকিয়ে দুপোঁ বললে,—তুমি যা চাইছিলে ঠিক তাই হয়েছে। এখানে চোর ঠিক জানলো যে যার জিনিস সে চুরি করছে সে চোরকে জেনেছে। মালিকের ওপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।

ঠিক বলেছ, প্রিফেক্ট বললেন,—আর এই যে ক্ষমতা ডি—পেয়েছেন, নানা সাংঘাতিক রাস্তায় এর সুযোগও গত ক-মাস ধরে তিনি নিচ্ছেন। যাঁর চিঠি, দিনের পর দিন ধরে তিনি বুঝতে পারছেন যে চিঠির উদ্ধার না হলে উপায় নেই। কিন্তু সোজাসুজি তা সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি কাজটার ভার আমার হাতে দিয়েছেন।

ধোঁয়ার ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যে থেকে দুপোঁ বললে,—এর চেয়ে উপযুক্ত লোক তিনি যে পেতেন না আমি নিঃসন্দেহ।

গর্বে ফুলে পুলিশের কর্তা বললেন,—ঠাট্টা করছ, তাই না?

কিন্তু কে না জানে, উপযুক্ত লোকের হাতেই কাজের ভারটা পড়েছে?

আমি বললাম,—আপনার কথায় স্পষ্ট বোঝা গেল চিঠিটা এখনো ঐ মন্ত্রীর হাতেই রয়েছে। যতক্ষণ চিঠিটা ওঁর হাতে আছে ততক্ষণই ওঁর ক্ষমতা। চিঠিটা শেষপর্যন্ত কাজে লাগালেই ক্ষমতাও সঙ্গে সঙ্গে ফুরোলো।

মসিয়েঁ জি—বললেন,—কথাটা খাঁটি। আর এর ওপর ভিত্তি করেই আমি কাজ শুরু করেছি। আমার প্রথম কাজ হলো মন্ত্রীর হোটেলটা পুংখানুপুংখভাবে তল্লাস করা; কিন্তু তাতে প্রধান বাধা হলো এই যে, এ কাজ তো মন্ত্রীমশাইকে জানিয়ে করা চলবে না! আমাদের মতলব যদি মন্ত্রী টের পায় তার ফল যে ভয়াবহ হতে পারে, এমন সাবধানও আমাদের করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এ-রকম গোপন অনুসন্ধানে আপনারা তো সিদ্ধহস্ত। প্যারিসের পুলিশের কাছে এ তো কিছুই নয়!

যথার্থ, যথার্থ। এ জন্যে আমি একটুও ঘাবড়াই নি। তাছাড়া মন্ত্রীর জীবনযাত্রার প্রণালীও আমার পক্ষে খুব সুবিধাজনক হয়েছে। প্রায়ই তিনি সারারাত বাড়ির বাইরে থাকেন। হোটেলে তাঁর চাকরবাকরের সংখ্যাও বেশি না। এমনিতেই তারা প্রভুর ঘর থেকে অনেকটা দূরে শোয়, তার ওপর তাদের মদ খাইয়ে নেশায় বেহুঁস করা শক্ত নয়। আপনারা জানেন, আমার কাছে এমন চাবি আছে যা দিয়ে প্যারিসের যে-কোনো ঘরের বা বাক্সের তালা খোলা যায়। গত তিন মাসের মধ্যে এমন একটা রাত যায়নি যে-রাত্রে মন্ত্রী ডি—র ঘরবাড়ি খানাতল্লাস করা হয়নি, এর অধিকাংশ রাত্রে আমি নিজের হাতে তাঁর বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। আমার একটা নাম আছে, তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি আশা আছে মোটা পুরস্কারের। যতদিন না পর্যন্ত

আমি স্থিরনিশ্চয় হয়েছি যে চোর আমার চেয়েও পাকা লোক ততদিন আমি খানাতল্লাসী বন্ধ করি নি। যেখানে কাগজটা লুকোনো সম্ভব, সারা বাড়িতে এমন কোনো গোপন অংশ আমি বাদ রাখিনি।

আমি প্রস্তাব করলাম,—কিন্তু এ নিশ্চয় সম্ভব নয় যে চিঠিটা যখন ওঁর কাছে আছে, তখন নিজের বাড়িতে না রেখে অন্য কোথাও সেটা উনি লুকিয়ে রেখেছেন ?

এতক্ষণে ডুপোঁ কথা বললো। সে বললে,—একেবারেই অসম্ভব। বর্তমানে রাজসভার আবহাওয়া যে-রকম ঘোরালো হয়ে উঠেছে, এছাড়া মন্ত্রী ডি—ও যে-রকম নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে গুজব রটেছে, তাতে করে এমনি একটা চিঠির মালিক হবার গুরুত্ব ডি—র কাছে যেমনি, তেমনি গুরুত্ব এক মিনিটে চিঠিটাকে বার করে দেবার—

বার করে দেবার মানে ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মানে হচ্ছে, চিঠিটাকে নষ্ট করে ফেলার,—ডুপোঁ বললে।

হুঁ ! আমি বললাম,—চিঠিটা তাহলে নিশ্চয়ই মন্ত্রীর ঘরেই আছে। উনি যে ওটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফেরেন না, এটাও নিশ্চয়ই সত্যি।

নিশ্চয়ই,—প্রিফেক্ট বললেন ; আমার লোকেরা বার-দুই তাঁর সঙ্গে ধাক্কা খাবার ছল করে তাঁর জামাকাপড় শরীর তল্লাস করেছে আমার চোখের সামনে, কোনো ফল হয়নি।

ডুপোঁ বললে,—ভায়া, এতটা কষ্ট না করলেও পারতে। ডি—তো আর একেবারে বোকা নন, চিঠিটা সঙ্গে রাখলে এমনিভাবে পথে-ঘাটে সেটা যে খোয়া যেতে পারে, এটুকু বুদ্ধি তাঁর আছে।

প্রিফেক্ট হেসে বললেন,—না, একেবারে বোকা নন। তবে

কিনা, লোকটি আবার কবি। কবিতে আর বোকাতে তফাৎ বেশি নেই, কবির পরেই মূর্খ।

ত্বপোঁ তার পাইপে কয়েকটা লম্বা টান দিলে, তারপর বললে,—বলেছো ভালো। যদিও আমারও দু-একটা ছড়া লেখার বদ-অভ্যাস আছে।

পুলিশ-কর্তাকে আমি বললাম,—আচ্ছা আপনার খানাতল্লাসির বিশদ বিবরণ আমাদের দিন।

প্রিফেক্টের আপত্তি ছিল না। তিনি বলতে লাগলেন,—সময়ের অভাব ছিল না আমাদের হাতে, কোনো অসুবিধে ছিল না তন্নতন্ন সন্ধানের। এ কাজে আমার অভিজ্ঞতা অনেকদিনের। সারা বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর সন্ধানের জন্যে আমরা সাত রাত করে সময় নিলাম। প্রথমে আমরা পরীক্ষা শুরু করলাম প্রত্যেকটি ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে। প্রত্যেকটি ড্রয়ার আমরা খুলে খুলে দেখলাম। আপনারা জানেন, খাঁটি শিক্ষিত পুলিশের গোয়েন্দার কাছে 'গোপন' ড্রয়ার বলে কিছু থাকতে পারে না। এমনি গোপন ড্রয়ার যদি কারো নজর এড়িয়ে যায় সে কোনো কাজেরই নয়। ব্যাপারটা শক্ত নয় মোটেও। যে-কোনো আসবাব যে ভাবেই তৈরি হোক না কেন, তার নির্দিষ্ট গুরুত্ব আছে—আর তার নির্দিষ্ট আয়তন আছে, যার হিসেব মিলবেই। আমরা যেসব রুল-কাঠ ব্যবহার করি, চূড়ান্ত নির্ভুল তাদের মাপ। একটা রেখার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগও আমাদের হিসেব এড়িয়ে যেতে পারে না। ক্যাবিনেট জাতীয় আসবাবগুলোর পরীক্ষা শেষ হবার পর আমরা ধরলাম চেয়ারগুলো। প্রত্যেকটি কুশনের মধ্যে তীক্ষ্ণ লম্বা লম্বা সূচ ঢুকিয়ে দেখা হলো। প্রত্যেকটা টেবিলের মাথা তারপর আমরা খুললাম।

এটা কিসের জন্যে?

অনেক সময় হয় যে, কোনো জিনিস লুকোতে চাইলে টেবিল বা এই জাতীয় আসবাবের ওপর দিকটা খুলে ফেলা হয়। তারপর ওপর থেকে একটা পায়ার মাঝখানে গর্ত করে, সেই ফোকরের মধ্যে জিনিসটা ভরে দিয়ে আবার মাথাটা বসিয়ে দেওয়া হয়। খাটের ছতরি ও পায়াও এমনি করে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু কাঠের ওপর ঘা মেরে বাজিয়ে কি ভেতরের গর্তটা বোঝা যায় না?

কিছুতেই না, যদি লুকোনো জিনিসটার চারপাশে তুলোর প্যাড দিয়ে ফোকরটা একেবারে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তাছাড়া চুপি চুপি আমাদের কাজ করতে হয়েছিল।

কিন্তু,—আমি বললাম, আপনি তো প্রত্যেকটি আসবাবের প্রত্যেকটি অংশ এমনি করে খুলে খুলে দেখতে পারেন নি? লুকোবার যে পদ্ধতি আপনি বললেন, তাতে একটা কাগজের চিঠিকে পাকিয়ে একটা লম্বা সূচের মত সরু করে ফেলা যায়। তারপর যে-কোনো একটা আসবাবের, যেমন ধরুন একটা চেয়ারের যে-কোনো একটা অংশের জোড় খুলে সরু ছিদ্র করে তার মধ্যে এমনি চেহারার চিঠিটাকে পুরে রাখা বিচিত্র নয়। আপনি তো প্রত্যেকটা চেয়ারের কাঠের প্রত্যেকটা জোড় খুলে পরীক্ষা করে দেখেন নি!

তা করিনি বটে, তবে তার চাইতেও ভালো উপায়ে আমরা পরীক্ষা করেছি। শুধু চেয়ার কেন, সে বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাবের প্রত্যেকটি জোড় আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি—কী করে জানেন? সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে। সম্প্রতি কোনো জোড় যদি সামান্যতম ঘা খেতো, চুলের মতো চিড় যদি ধরতো কোথাও, বার্নিশের রঙে একটু যদি দাগ পড়ত কোনোরকম, সব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত মাইক্রোস্কোপের চোখে।

আমি বললাম,—এ ছাড়া আর্শির কাঁচ আর কাঠের মাঝখানটা, বালিস বিছানা চাদর পর্দা কার্পেট, কিছুই বাদ দেননি তো ?

আরে, সে সব কি আর বাকি রেখেছি ? বাড়ির প্রত্যেকটা আসবাবপত্র নিখুঁতভাবে পরীক্ষা যখন শেষ হলো, তখন আমরা শুরু করলাম সারা বাড়িটা নিয়ে। সারা বাড়ির সমস্ত এলাকাকে আমরা ভাগে ভাগে বিভক্ত করে নিলাম, যাতে কোনো অংশ বাদ না পড়ে যায়। প্রত্যেকটা অংশে এজন্য আমরা নম্বর দিয়ে রেখেছিলাম। মন্ত্রীর বাড়ি শুধু নয়, তার তুপাশের তুটো বাড়ির সমস্ত অংশ ইঞ্চি ইঞ্চি ধরে অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে তন্নতন্ন করে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম,—একটা নয়, এমনি করে তিনটি বাড়ি আপনারা খুঁজে দেখেছেন ?

প্রিফেক্ট বললেন,—উপায় কী বলুন, পুরস্কারের অঙ্কটা তো কম নয় ?

আর খালি জমি, মাঠ, বাগান—বাড়ির সামনের পিছনের ?

নিশ্চয়ই ! বাড়িগুলোর সংলগ্ন সমস্ত খোলা জমি ইঁট দিয়ে বাঁধানো। এতে আমাদের সুবিধেই হয়েছিল। প্রত্যেকটি ইঁটের ফাঁকের শ্যাওলা পরীক্ষা করে দেখেছি ; কোথাও কোনো নড়চড় আমাদের চোখে পড়েনি।

আমি আবার বললাম,—আর ধরুন ডি—র লাইব্রেরি ? বই, কাগজপত্র এ-সব ?

বলবেন না সে কথা। প্রত্যেকটা বই আমরা দেখেছি। শুধু বইটা ধরে ঝেড়ে দেখেছি তা-ই নয়, প্রত্যেকটা পাতা আমরা উলটেছি। প্রত্যেকটা বইএর মলাট কতোটা মোটা তা সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে মেপে দেখেছি। তারপর প্রত্যেকটা মলাট মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। একটা মলাটের একটু এদিক-ওদিক

হলে ঠিক ধরা পড়তো। নতুন বাঁধাই-করা বইগুলোর মধ্যে সরু সূচ ঢুকিয়ে আমরা দেখেছি।এ ছাড়া কাগজপত্রও একটিও বাদ থাকেনি।

—ওঃ, ভালো কথা। কার্পেটের তলার মেঝে, দেয়ালের কাগজ, বাড়ির সুড়ঙ্গ ঘরগুলো?

সব মশাই, সব। কিছু বাকি রাখিনি। বাকি আর কিছু নেই। কেবল যা খুঁজেছি তার কোনো হদিসই মেলেনি।

আমি বললাম,—তা যদি হলো তাহলে যা ভাবছেন তা হতেই পারে না। যা খুঁজছেন তা বাড়িতে নেই।

শেষ পর্যন্ত আমারও তো সেই সন্দেহই হচ্ছে। পুলিশের কর্তা এবার হুপোঁর দিকে ফিরে বললেন,—হুপোঁ, এ অবস্থায় কী করা যায়? তুমি কী বলো?

হুপোঁ বললে,—আমার উপদেশ হচ্ছে সারা বাড়িটা আবার ভালো করে খোঁজা।

জি—বললেন,—তার আর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। আমি হলফ করে বলছি, আমি বেঁচে আছি নিশ্বাস নিচ্ছি এ যেমন সত্যি, চিঠিটা যে ডি—র বাড়িতে নেই সেও তেমনি সত্যি।

হুপোঁ বললে,—কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো রাস্তা তো আমি বাত্লাতে পারছি নে।—ভালো কথা, চিঠিটার চেহারার পুরোপুরি একটা বিবরণ নিশ্চয়ই তোমার কাছে আছে?

আছে বৈকি। সঙ্গে সঙ্গে প্রিফেক্ট পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে তা থেকে চিঠিটার ভিতর বাহিরের আকৃতির পুংখানুপুংখ দীর্ঘ বিবরণ আমাদের পড়ে শোনাতে লাগলেন। পড়া শেষ হবার কিছু পরে প্রিফেক্ট বিদায় নিলেন। এমন সম্পূর্ণ হতাশ, বিষণ্ণ ভাব ভদ্রলোকের কখনো দেখিনি।

মাসখানেক পরে আর-একদিন জি—আমাদের কাছে এলেন।

সেদিনও আমরা আগের দিনের মতোই চুপচাপ বসে আছি। একটা চেয়ার টেনে বসে ধূমপান করতে করতে নানা একথা-সেকথা তিনি বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমিই কথাটা পাড়লাম। বললাম,—তারপর, আপনার সে চোরাই চিঠির কোনো হদিস হলো? না, শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীর কাছে হার স্বীকার করেই নিলেন?

আর বলেন কেন! জি—একেবারে ফেটে পড়লেন। নিপাত যাক লোকটা! দ্যুপোঁর কথামত আবার আমি তার সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কিছুই ফল হলো না। জানতাম, বৃথা চেষ্টা।

দ্যুপোঁ কথা বললো,—পুরস্কারটা ছিল কতো?

জি—আমতা আমতা করতে লাগলেন। বললেন,—তা, অনেক টাকা। মানে, ঠিক কতোটা না বললেও ধরে নিতে পারো, মস্ত পুরস্কার। এটুকু বলতে পারি, চিঠিটা যদি কেউ আমার হাতে এনে দিতে পারে আমি তাকে নিজের থেকে পঞ্চাশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিতেও রাজি আছি। আসল কথাটা হচ্ছে কী জানো? ব্যাপারটা তো দিনের পর দিন সঙিন হয়ে উঠছে, সম্প্রতি পুরস্কারের অঙ্কটা ডবল হয়েছে। কিন্তু তাতে আর কী হবে, তিনগুণ হলেও আমি যা করেছি, তার ওপর আর করার কিছু নেই।

ঠোঁটের ফাঁকে দাঁত দিয়ে পাইপ চেপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দ্যুপোঁ বললে,—তা বটে। কিন্তু যাই বলো, আমার মনে হয় তুমি এ ব্যাপারে যতোটা চেষ্টা করা উচিত ততোটা করো নি। আর-একটু খাটলেও তো পারতে!

তাই নাকি? কী করে শুনি?

এই ধরো, চারদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দ্যুপোঁ বললে,—উপযুক্ত লোকের কাছ থেকে সদ্‌বুদ্ধি নিলেও তো পারতে? এ্যাবারনেথির সেই গল্পটা শুনেছ?

—না, শুনিনি ; চুলোয় যাক তোমার এ্যাবারনেথি !

চুলোয় সে যাক, ফাঁসিকাঠে সে ঝুলুক। গল্পটা কিন্তু ভালো। এ্যাবারনেথি ছিলেন ডাক্তার। এক হাড়-কৃপণ ধনী মতলব করলে, তাঁর কাছ থেকে নিখরচায় একটা রোগীর পরীক্ষা করিয়ে নেবে। একদিন সাধারণ গল্পগুজবের মধ্যে সে কাল্পনিক রোগীর নাম করে বিষয়টা ফাঁদলে। গল্পচ্ছলে বললে,—ধরুন রোগীর অবস্থা হচ্ছে এই রকম আর উপসর্গ হচ্ছে এইগুলো ; এমনি অবস্থায় আপনি ডাক্তার হিসেবে তার কী ব্যবস্থা করবেন ?

ব্যবস্থা! আমি ? ব্যবস্থা তো সে নিজেই করবে! ডাক্তার দেখিয়ে ডাক্তারের কাছে উপদেশ নেবার ব্যবস্থা সে করবে।

বিরস মুখে প্রিফেক্ট দ্যুপোঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, আরে বাবা, আমি তো রাজিই আছি—শুধু উপদেশ দিতে নয়, তার উপযুক্ত দামও দিতে।

সত্যি ?

নিশ্চয় ! এ ব্যাপারে সত্যিকারের সাহায্য যে আমায় করবে, সত্যিই পঞ্চাশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক আমি নিজে তাকে দিতে রাজি।

দ্যুপোঁ উঠে দাঁড়ালো। একটা ড্রয়ার টেনে তার মধ্যে থেকে একটা চেক-বই বার করলে। সামনে এসে বললে,—তাহলে টাকার অঙ্কটা চেকএ ভরে সই করো। চেকটা সই করে আমাকে দিলে চিঠিটাও হাতে-হাতে আমি তোমাকে দেবো।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রিফেক্টের অবস্থা বজ্রাহতের মতো। মুখ তাঁর হাঁ হয়ে গেলো, কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে প্রায় দুই চোখ। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক নিস্পন্দ অবস্থায় দ্যুপোঁর দিকে তাকিয়ে থাকার পর কিছুটা সামলে নিয়ে একটা কলম হাতে তুলে নিলেন। আরো কয়েকবার চোখ তুলে বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি চেক-বইএর

পাতায় পঞ্চাশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক বসালেন, নিচে নাম সই করলেন। করে চেকটা টেবিলের ওপর ডুপোঁর দিকে ঠেলে দিলেন। ডুপোঁ চেকটা হাতে তুললো, তারপর ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে পকেট-বুকের মধ্যে ভরলো। তারপর চাবি দিয়ে একটা দেরাজ খুলে তার মধ্যে থেকে একটা চিঠি বার করে প্রিফেক্টের হাতে দিলে। পুলিশ সাহেব উত্তেজনা আর সামলাতে পারছেন না, কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটা তিনি খুললেন। একবার চিঠিটাতে চোখ বুলিয়ে হুড়মুড় করে চেয়ার থেকে উঠলেন। তারপর কোনো প্রকার বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়ে, একটি কথা না বলে, অভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এক লাফে ঘরের দরজা পার হয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেলেন দৌড়োতে দৌড়োতে হাঁফাতে হাঁফাতে।

প্রিফেক্টের অন্তর্ধানের পর ডুপোঁ কথা শুরু করলো :

এ কথা মনে রেখো প্যারিসের পুলিশ তাদের নিজেদের কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাদের যেমন অধ্যবসায়, তেমনি প্রতিভা আর তেমনি তারা চতুর। যথারীতি কর্তব্যপালনের জন্যে যা কিছু জ্ঞান তাদের দরকার তা তাদের নখদর্পণে। তাই জি—যখন মন্ত্রীমশাইএর বাড়ির খানাতল্লাসির বিবরণ দিচ্ছিলেন—আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছিল যে পুলিশের কানুনসম্মত যা কিছু করবার তার কিছুই তাঁর বাদ পড়ে নি। তাঁর যতোটা করবার তা ঠিক তিনি করেছিলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম—'তাঁর যতোটা করবার', এ-কথার মানে?

ডুপোঁ উত্তরে বললে—ঠিকই বলেছি। পুলিশ যেসব পন্থা অবলম্বন করেছিল তা তাদের পদ্ধতি অনুসারে যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই, কাজও তাদের সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। তাদের অনুসন্ধানের আওতার মধ্যে যদি চিঠিটা থাকতো, তাহলে ঠিক তারা ওটা বার করে ফেলতে পারতো।

দুপোঁর কথায় আমার হাসি এলেও মনে হোলো না যে এর মধ্যে তার ঠাট্টা লুকোনো আছে।

দুপোঁ বলতে লাগলো—তারা যেসব প্রক্রিয়া করেছে, পুলিশের বিধান অনুসারে তার মধ্যে কোনো গলদ নেই। গলদটা হচ্ছে কোথায়? না, এই প্রক্রিয়া এমনি একটা কেসএ আর এমনি মানুষের ক্ষেত্রে খাটে না। প্রিফেক্টের কয়েকটি বাঁধাধরা পদ্ধতি আছে। পদ্ধতিগুলো যে খুবই পাকা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রিফেক্ট চেষ্টা করেন তাঁর সব রকমের সমস্যাকেই জোর করে এই বাঁধা পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। ফলে হয় এই যে, হাতের তদন্তের ব্যাপারে কোথাও তিনি খুব ঘোরালো হয়ে পড়ছেন, কোথাও হচ্ছেন নিতান্ত সরল। ভুল ঘটছে পদে পদে। অনেক স্কুলের ছেলের বিচারবুদ্ধিও তাঁর চেয়ে প্রখর। আমি নিতান্ত আট বছর বয়সের একটা স্কুলের ছাত্রকে জানি, জোড়-বিজোড় খেলায় যার সাফল্যে সকলের তাক লেগে যেতো। খেলাটা খুব সহজ, খেলতে হয় ছোট-ছোট মার্বেল নিয়ে। একজন খেলোয়াড় কয়েকটা মার্বেল হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আর-একজন খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসা করে—জোড় না বিজোড়? আন্দাজ যদি মেলে তো যে উত্তর দেয় সে একটা মার্বেল জেতে, আর যদি ভুল হয় তো সে একটা মার্বেল হারে। যে ছেলেটির কথা আমি বলছি সে সারা স্কুলের সকলের মার্বেল জিতে নিতো। তার অনুমান করার পেছনে একটা মূল নীতি থাকতো—সেটা হচ্ছে প্রতিপক্ষের বুদ্ধি কতোটা তা খুব ভালো করে বিচার করে নেওয়া। যেমন ধরো, নিতান্ত বোকা একটা ছেলের সঙ্গে সে খেলছে। প্রতিপক্ষ হাতের বদ্ধ মুঠো তুলে বললে,—জোড়, না বিজোড়? এ ছেলেটি বললে—বিজোড়। হার হলো। দ্বিতীয়বারের বার কিন্তু অনুমানে ভুল হলো না, তার কারণ ইতিমধ্যে সে ভেবে নিয়েছে

যে গতবার বোকাটা জোড় নিয়েছিল, আর বোকার যা বুদ্ধি তাতে এবার সে বিজোড় নেবেই। তাই বিজোড় আন্দাজ করে এবার সে ঠিক জিতে গেলো। এখন ধরো, আর এক ডিগ্রি বেশি বুদ্ধি-ওয়ালা ছেলের সঙ্গে সে যখন খেলছে, তখন তার ভাবনা কাজ করছে এই ভাবে: প্রথমবার তো আমি বিজোড় বলে হেরেছি, এবার হয়তো প্রথম বোকাটার মতো প্রথম ধাক্কায় এক জোড় থেকে বিজোড়ে বদলাবে; কিন্তু এর বুদ্ধি একটু বেশি তো, তাই আর-একবার ভেবে হয়তো এমনি সোজা বদল করবে না, আগের মতো জোড়ই হাতে নেবে। আমিও জোড়ই বলবো। যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ। বললে—জোড়, জিতেও গেলো। এখন, এই স্কুলের ছেলের এই যে বিচারবুদ্ধি, যাকে সবাই বলবে বরাত, আসলে এটা কী?

আমি বললাম,—এটা আর কিছু নয়, কেবল প্রতিপক্ষের বুদ্ধির যতোটা দৌড়, তার সঙ্গে নিজের বুদ্ধিকে এক করে ফেলার ক্ষমতা।

দ্যুপাঁ বললে,—ঠিক বলেছো। প্রতিপক্ষের বুদ্ধির সঙ্গে নিজের বুদ্ধির এমনি অভিন্নতা কী করে সম্ভব হয় একথা আমি ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ছেলেটা কী বলেছিলো শুনবে? সে বলে-ছিলো, যখন আমি আর-একজনের সম্বন্ধে জানতে চাই সে কতো চালাক বা কতো বোকা, কতো ভালো বা কতো মন্দ, বা জানতে চাই সে ঠিক সেই সময় কী ভাবছে, তখন আমি তার মুখের যে ভাব সেটা যতো নিখুঁতভাবে সম্ভব নিজের মুখে ফোটাতে চেষ্টা করি, তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে চেষ্টা করি এমনি মুখভাব হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে ঠিক কী রকম ধারণা বা অনুভূতির উদয় হচ্ছে। রোসফুকোল্ট, লে বুগিভ, ম্যাকিয়াভেলি, কম্পানেলা, এঁদের গভীর বিচারবুদ্ধির প্রশংসার অন্ত নেই;—সব কিন্তু ঐ শিশুর মানসিক ক্ষমতারই নকল।

আমি বললাম,—প্রতিপক্ষের মনের সঙ্গে নিজের মনকে অভিন্ন করে ফেলতে হলে প্রথমেই কিন্তু প্রতিপক্ষের মনের চৌহদ্দির মাপ-জোপ নির্ভুল ভাবে নিতে হবে, তাই না ?

দুপোঁ বললে,—সে তো হলো আসল কাজের মতো কাজ। আর প্রিফেক্ট ও তাঁর সহকারীরা যে প্রায়ই এত ঠকে তার কারণ, তোমার ঐ অভিন্ন করা-টরা দূরে থাক, যাকে নিয়ে ব্যাপার তার বুদ্ধি বা মনের কোনো খোঁজই এরা রাখে না। এরা নিজেদের বুদ্ধি আর কৌশলই কেবল দেখে, কোনো গোপন জিনিস খুঁজতে হলে ভাবে, এরা নিজেরা হলে কেমন করে জিনিসটা লুকোতো। এদের মধ্যে এটুকু সত্যি যে, সর্বসাধারণের বুদ্ধি যতোটুকু, এদের বুদ্ধিও ততোটুকু। কিন্তু যদি কোনো ওস্তাদ অপরাধীর বুদ্ধি এদের বুদ্ধির থেকে বিভিন্ন চরিত্রের হয়, সে অপরাধী ঠিক এদের ঠকায়। যার বুদ্ধি এদের চেয়ে উঁচুদরের বা নিচুদরের, এমনি দু-রকম লোকের কাছেই এদের হার। এদের তদন্তের ধরাবাঁধা মূলনীতির কোনো পরিবর্তন নেই। হয়তো কখনো কোনো খুব গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হলো বা পুরস্কারের অঙ্কটা মাত্রা ছড়িয়ে গেলো, তখন এরা এদের তদন্তের প্রক্রিয়াগুলোকে খুব জোরদার করে বা অনেকটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে—কিন্তু প্রক্রিয়ার পেছনে যে-সব মূলনীতি আছে, সেগুলোকে ছোঁয় না। এই ডি—র বাড়ির তল্লাসির ব্যাপারে ছাখো, এদের কাজের পিছনের মূল ধ্যান-ধারণাগুলো কেমন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এরা নেড়েছে, ঢুঁড়েছে, ফুটো করেছে, মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে সারা বাড়ি ইঞ্চি ইঞ্চি মেপে পরীক্ষা করেছে। আসলে এসব কী ? প্রিফেক্ট বছরের পর বছর ধরাবাঁধা রুটিন-মাফিক কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে এক ছাঁচের কতকগুলো ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, সেই ধারণাগুলোর ভিত্তিতেই খানাতল্লাসির

কয়েকটা ধরাবাঁধা পদ্ধতি তৈরি হয়েছে—সেই পদ্ধতিগুলোকেই এরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রয়োগ করেছে দেখছো না, এ ধারণা প্রিফেক্টের একেবারে বদ্ধমূল যে পৃথিবীর যে-কেউ কোনো কাগজ লুকোতে হলে হয় চেয়ারের পায়া ফুটো করে তার মধ্যে না হয় কোনো নিভৃত গর্তে বা কোনে লুকোবে.। আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রেখো যে, এমনি গোপন স্থানে জিনিস লুকোয় কারা ?—না, যারা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির মালিক। তার কারণ এই যে, কোনো জিনিসকে লুকোতে হলে সেটাকে যে যতোটা সম্ভব অদ্ভুত রকমের গোপন জায়গায় রেখে দিতে হবে এটা তো সোজা কথা। এ জিনিসকে আবার খুঁজে যে বার করবে তার কোনো অতিরিক্ত বুদ্ধির দরকার হয় না ; দরকার যত্ন, ধৈর্য, গোঁ। পুলিশের হাতে এমনি খুব জরুরি কেস যখন এসেছে, বা যাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ, কিম্বা যেখানে পুরস্কারের তোড়াটা খুব ভারি,—পুলিশ দেখেছে যে তাদের পদ্ধতি সাধারণত কখনো ব্যর্থ হয়নি। আমি যে একটু আগে বলছিলাম যে চোরাই চিঠিটি যদি প্রিফেক্টের অনুসন্ধানের আওতার মধ্যে কোথাও থাকতো তাহলে ঠিক বেরিয়ে পড়তো, তাতে আমি এই কথাটাই বোঝাতে চাইছিলাম যে এই জিনিস যিনি লুকিয়েছেন তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে যদি পুলিশের পদ্ধতি মিলতো, তাহলে ধরা না পড়ে উপায় ছিলো ? কিন্তু ছাখো, পুলিশের বড়কর্তা নিজেই তাজ্জব বনে গেছেন। এই যে তাঁর হার হয়েছে তার মূল কারণ, তাঁর এই ধারণা ছিলো যে মন্ত্রী লোকটি নির্বোধ যেহেতু কবি বলে তাঁর খ্যাতি আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু সত্যিই কি মন্ত্রী কবি ? এঁরা দুই ভাই আমি জানি, দুজনেরই শিক্ষার খ্যাতি আছে। আমি তো জানতাম মন্ত্রী একজন নামকরা গণিতজ্ঞ, কবি নন।

ভুল করছো তুমি, তুপোঁ বললো—আমি তাঁকে খুব ভালো রকম চিনি। ইনি একাধারে কবি আর গণিতজ্ঞ তুইই। সেইজন্যেই বুদ্ধি তাঁর আছে। শুধু গণিতজ্ঞ হলে বিচারবুদ্ধির চিহ্নও থাকতো না তাঁর, পুলিশের কাছে হার মানতে দেরি হতো না একটুও।

আমি বললাম,—তোমার এই সব মন্তব্য শুনতে অবাক লাগে। সারা পৃথিবীর যা মত, তোমার মত তার উল্টো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সারা তুনিয়ায় এই সিদ্ধান্ত পাকা হয়েছে যে গণিতের বিচার শ্রেষ্ঠ বিচার।

তুপোঁ বললে,—সে তর্ক এখন থাক, তবে এটা জেনো রেখো, মন্ত্রী যদি শুধু গণিতজ্ঞই হতেন সঙ্গে সঙ্গে কবি না হয়ে, তাহলে প্রিফেক্টের আমাকে এই চেকটা দেবার দরকার হতো না। তিনি একসঙ্গে তুই—একথা জানতাম বলেই তাঁর মানসিক ক্ষমতার উপযুক্ত বিচারের সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। আমি জানতাম রাজসভায় তিনি মস্ত সম্মানী ব্যক্তি, আবার যেমন তাঁর কূটবুদ্ধি তেমনি তাঁর সাহস।

আমার প্রথমেই ধারণা হয়েছিলো যে পুলিশের কাজের পদ্ধতি-গুলো তাঁর অজানা থাকবে না। রাস্তার মধ্যে তাঁকে যে আক্রান্ত হতে হবে, এ তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। তাঁর বাড়ি যে গোপনে খানাতল্লাসি করা হবে, এও তিনি ধরে নিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই রাত্রে বাড়িতে থাকতেন না, এতে প্রিফেক্টের উল্লাসের আর অবধি ছিল না। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম, এটা চালাকি। তিনি নিজেই চেয়েছিলেন যে পুলিশ প্রাণ ভরে সারা বাড়ি খোঁজ করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করুক—আর জি—করেও ছিলেন তাই —যে চিঠিটা বাড়িতে নেই।

কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার যা ধারণা এতক্ষণ ধরে তোমাকে বললাম, এ ধারণা তাঁরও মাথায় এসেছিলো। ফলে একটা জিনিস

লুকোবার যে-সব সাধারণ জায়গা, তেমনি কোনো জায়গা তিনি কখনও পছন্দ করতে পারেন নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে এমনি বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই এতটা বোকা হবেন না যে—হোটেলের নিভৃততম কোনও যে পুলিশের হাত চোখ যন্ত্রপাতি আর অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না এটা তাঁর মাথায় আসবে না। আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম যে এ অবস্থায় তিনি বেছে নেবেন অত্যন্ত সোজা সরল রাস্তা। তোমার প্রিফেক্টের এখানে আমার সেই প্রথম দিনটার কথা মনে আছে? মনে আছে আমি যখন বললাম রহস্য হয়তো খুব সহজ বলেই এত শক্ত, শুনে প্রিফেক্টের কী অট্টহাস্য!

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি! আমি তো ভাবলাম হাসতে হাসতে মূর্ছা না যান!

দুপোঁ বলতে লাগল,—মানচিত্র নিয়ে একরকম ধাঁধার খেলা আছে, বুঝলে? দুজন খেলোয়াড়ের একজন অপর জনকে ম্যাপ থেকে একটা নাম খুঁজে বার করতে বলে—নদী বা সহর, রাজ্য বা মহাদেশ, যারই হোক সেই নামটা। সারা মানচিত্র জুড়ে অসংখ্য আঁকিবুকির মধ্যে অগুন্তি নামের ভিড়। কাঁচা খেলোয়াড় প্রতিপক্ষকে হারাতে চেষ্টা করে সবচেয়ে ছোট করে লেখা নাম খুঁজতে বলে; কিন্তু যে খেলোয়াড় পাকা সে এমন একটা নাম ঠিক করে যেটা সারা মানচিত্রের ওপর এক ধার থেকে অপর ধার পর্যন্ত জুড়ে বড়-বড় অক্ষরে ছড়িয়ে লেখা আছে। রাস্তার প্ল্যাকার্ড খুব ঢাউস করে লেখা থাকলে যেমন পথিকের চোখ এড়িয়ে যায়, মানচিত্রের এমনি বড়ো করে লেখা নামের বেলাতেও তেমনি মনস্তাত্ত্বিক ভুলও ঠিক এমনি চোখের ভুলের মতো। যে-সব জিনিস বড্ড পরিষ্কার, বড্ড সহজ, যা একেবারে সব সময়ে মনে এসে খাড়া হয়, মনের তাকে খেয়াল করতে মনে থাকে না। কিন্তু এই তত্ত্বটা পুলিশের

কর্তার জানা ছিল না। তাঁর একবারও মনে হয়নি যে ছুনিয়ার চোখ এড়াবার জন্যে ডি—হয়তো চিঠিখানা ঐ ছুনিয়ার নাকের তলাতেই ফেলে রেখেছেন।

আমি কিন্তু ভাবছিলাম ঠিক উল্টো। ডি—যে কতো বড়ো পাকা খেলোয়াড়, কী তার সাহস চতুরতা আর বুদ্ধি, এ কথা কেবল আমি ভাবছি। ঠিকমত কাজে লাগাতে গেলে চিঠিটা হাতের কাছেই থাকা দরকার, এও তাঁর খেয়াল হয়েছে। তারপর প্রিফেক্টের কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি যে তাঁর স্বাভাবিক অনুসন্ধানের আওতার মধ্যে চিঠিটার পাত্তা নেই। ভাবতে ভাবতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হলো যে চিঠিটা লুকোবার জন্যে মন্ত্রী সবচেয়ে ব্যাপক, সবচেয়ে বড় কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন—চিঠিটা তিনি লুকোননি মোটেই।

এমন সমব ভাবনা মাথায় নিয়ে চোখে একটা সবুজ চশমা লাগিয়ে আমি এক মধুর সকালে হঠাৎ যেন গিয়ে উপস্থিত হলাম মন্ত্রীর আস্তানায়। ডি—বাড়িতেই ছিলেন; দেখি ঝিমুচ্ছেন, গড়াচ্ছেন আর হাই তুলছেন। আলস্যের ক্লান্তি গুরুভার। একটা কথা বলে রাখি, আসলে কিন্তু এই ডি—র মতো চটপটে আর উদ্যোগী পুরুষ আর দ্বিতীয়টি নেই,—কিন্তু তাঁর সে চেহারা লোকের চোখের আড়ালে।

চোখছুটো হঠাৎ কষ্ট দিচ্ছে তাই রঙিন ঠুলি পরেছি—প্রথমেই এ কথা বলে আমি আরম্ভ করলাম। কথাবার্তার ফাঁকে আমার চশমার মধ্যে দিয়ে সারা ঘরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলোতে লাগলাম।

ডি—র সামনেই যে বড় লেখার টেবিলটা, তার ওপর এলো-মেলো ছড়ানো রয়েছে একগাদা চিঠি আর কাগজপত্র, ক-খানা বই, ছুয়েকটা বাদ্যযন্ত্র। এগুলো অনেক যত্নে নিরীক্ষণ করে তেমন সন্দেহকর কিছু চোখে পড়লো না।

সারা ঘরটা ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত চোখ গিয়ে আটকালো সোনালি রুপোলি কাজ করা পিসবোর্ডের একটা কার্ড রাখার ছোট্ট তাকের ওপর। চৌকো একটা বাক্সের খোপের মতো দেখতে, ঠিক ম্যাণ্টল্‌পীসের তলায় একটা ছোট্ট পেতলের কড়া থেকে নীল ফিতে দিয়ে ঝোলানো। খোপটার মধ্যে এলোমেলো ভাবে গোঁজা রয়েছে পাঁচ-ছ-টা ভিজিটিং কার্ড আর একটিমাত্র চিঠি। চিঠিটা নোংরা, খামটা দোমড়ানো, অর্ধেকটা ছেঁড়া—যেন অনাবশ্যক বলে ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে আবার কী মনে করে ওখানে গুঁজে রাখা হয়েছে। খামের ওপর মস্ত একটা 'ডি' অক্ষর, তার পাশে ছোট মেয়েলি হাতে ডি—র ঠিকানা লেখা। মূল্যহীন চিঠি কোনো নারীহস্তের, ছিন্নভিন্ন হতে হতে হঠাৎ পরম অবজ্ঞায় খোপটার এক কোনে আশ্রয় পেয়েছে।

যে মুহূর্তে চিঠিখানা চোখে পড়ল, সেই মুহূর্তে মন বললে, পেয়েছি। অথচ চোরাই চিঠিটার যে পুংখানুপুংখ বর্ণনা প্রিফেক্ট দিয়েছিলেন তার সঙ্গে এটার এককোঁটাও মেলে না। এ চিঠিটার ওপর বড়ো কালো রঙের 'ডি' অক্ষরের সীলমোহর। চোরাই চিঠিটার ওপর সীলমোহরে ছোট্ট লাল রঙের S,—পরিবারের স্মারকচিহ্ন। এখানে মেয়েলি হাতে ছোট-ছোট অক্ষরে ডি—র ঠিকানা লেখা। সে চিঠিটার খামে বড়-বড় অক্ষরে পুরুষালি হাতে রাজ-পরিবারের কোনো একটি বিখ্যাত নাম। একমাত্র মিল এই যে, দুটি চিঠিই আয়তনে সমান। কিন্তু দুটো চিঠির মধ্যে সাদৃশ্যের এমন সুস্পষ্ট অভাব কেন? ডির—যেরকম বাঁধাবাঁধি পরিচ্ছন্ন অভ্যাস, তার সঙ্গে এই চিঠিটার নোংরা, দুমড়োনো, ছেঁড়া-খোঁড়া চেহারার এতটা অমিলই বা কেন? এ যেন জোর করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে কাগজটার কোনো দামই নেই। তারপর চিঠিটা সব অতিথির একেবারে চোখের

সামনে ঝুলছে, অনাহূত ভাবে আত্মপ্রচার করছে—আমি অকিঞ্চিৎকর, তবু আমাকে ছাখো। সন্দেহের মন নিয়েই আমি গিয়েছিলাম, দৃঢ়মূল হলো আমার সন্দেহ।

যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ মন্ত্রীর বাড়িতে আমি রইলাম। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এক বিষয়বস্তু নিয়ে তুমুল তর্ক আমার চলেছে। চোখ কিন্তু আমার ঐ চিঠিটার ওপর বাঁধা। চিঠিটার চেহারা, আয়তন, খোপের মধ্যে কেমন ভাবে ওটা গোঁজা রয়েছে,—সব আমি তখন মনে মনে যেন মুখস্থ করছি। হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল, তাতে আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল তাও ঘুচে গেলো। লক্ষ্য করলাম, চিঠিটার ভাঁজগুলো যতোটা দোমড়ানো ভাঁজ খাওয়া হওয়া স্বাভাবিক তার থেকে যেন একটু বেশি-বেশি। একটা মোটা কাগজকে একবার খুব চেপে মুড়ে তারপর সেটাকে আবার উল্টোদিকে চেপে মুড়লে ভাজগুলো যেমন ভেঙে ভেঙে যায়, এরও ভাঁজগুলো তেমনি। আমার মনে স্পষ্ট ফুটে উঠল যে চিঠিটাকে ভাঁজে-ভাঁজে ওল্টানো হয়েছে, তারপর নতুন সাদা পিঠের ওপর সীলমোহর আর নতুন ঠিকানা বসানো হয়েছে। যে চিঠি চোরাই, এ সেই চিঠি।

তু-এক কথার পরই মন্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম, মন্ত্রীর টেবিলে ফেলে এলাম একটা সোনার নস্যের কৌটো।

পরদিন সকালে নস্যের কৌটোটা ফিরিয়ে আনবার অছিলায় আবার মন্ত্রীর বাড়ি আমি গেলাম। আগের দিনের তর্কটা আবার জমে উঠল। আলোচনা যখন খুব জমেছে তখন হঠাৎ বাইরে জানলার পাশেই পিস্তল ছোঁড়ার জোর শব্দ পাওয়া গেলো, সঙ্গে সঙ্গে উঠল কয়েকটা তীব্র আর্তনাদ আর প্রচণ্ড কোলাহল। ডি— এক লাফ দিয়ে উঠে জানলার ধারে গেলেন, জানলাটা খুলে বাইরে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন। আমিও ঠিক সেই সঙ্গে

উঠে দাঁড়ালাম। কার্ডের বাক্সটা থেকে চট করে চিঠিটা তুলে নিয়ে সেখানে ঠিক তেমনি চেহারার একটা নকল চিঠি বসিয়ে দিলাম। নকল চিঠিটা আমি খুব যত্নে বাড়িতে তৈরি করেছিলাম, ওপরের নিখুঁত 'ডি' সীলমোহরটা পর্যন্ত।

রাস্তায় একটা লোক বন্দুক হাতে নিয়ে পাগলামি শুরু করেছে। মেয়েছেলে আর শিশুর ভিড়ের মধ্যে সে বন্দুক ছুঁড়েছে। হৈ-হৈ কাণ্ড। তবে দেখা গেল,—বন্দুকে গুলি নেই, ফাঁকা আওয়াজ। আমি তো চিঠিটা পকেটে পুরেই জানলার ধারে ডি—র পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। লোকজন শেষ পর্যন্ত বন্দুকধারীকে পাগল বা মাতাল ঠাউরে ছেড়ে দিলো। আমরা জানলার কাছ থেকে সরে এলাম। আসলে রাস্তার উন্মাদটা আমারই মাইনে-করা লোক।

স্তব্ধ হয়ে এতক্ষণ এই বিচিত্র কাহিনী আমি শুনছিলাম। এবার বললাম,—কিন্তু ঐ নকল চিঠিটা রেখে আবার হলো কী? প্রথমবারেই সোজাসুজি যদি তুমি হাতের মুঠোয় পুরে বেরিয়ে আসতে তাহলে তো আরো ভালো হতো!

হয়তো কিছুই হতো না। তুমি জানো না, ডি—একটা মরীয়া লোক; মনের জোরও লোকটার তেমনি। সারা বাড়িতে তাঁর চাকর-বাকরের অভাব নেই। তোমার কথামত আমি যদি চিঠিটা ছিনিয়ে আনতে চেষ্টা করতাম, হয়তো সে-বাড়ি থেকে জীবন্ত বার হওয়া আর আমার ঘটতো না। প্যারিসের লোক কোনো খবর আর পেতো না আমার। আর এ ছাড়া আমার একটা কূটনৈতিক মতলবও ছিল।

আমি বললাম,—সেটা আবার কী!

এ ব্যাপারে মনে করো আমি তো সেই সম্ভ্রান্ত মহিলার পক্ষ হয়ে কাজ করেছি। গত আঠারো মাস ধরে এই মন্ত্রী তাঁকে বুড়ো-আঙুলের তলায় চেপে রেখেছিলেন। এখন এঁর মুঠোর মধ্যে

এসে গেলেন মন্ত্রী। কেননা তিনি তো এখনই বুঝবেন না যে চিঠিটা খোয়া গেছে! চিঠির মালিক হয়ে যেমন অত্যাচার তিনি চালিয়েছিলেন, এখনো ঠিক তেমনি চালাবেন। এতেই তিনি এবার জড়িয়ে পড়বেন, রাজনৈতিক সর্বনাশ ডেকে আনবেন নিজের মাথায়। পতন তাঁর হলো বলে,—পতন হবে যতোটা নিচুতে, ঠিক ততোটা হবে লজ্জার গ্লানি। নামতে কষ্ট নেই—এ-কথা বলা সহজ; কিন্তু ভায়া, গানের বেলায় যেমন, চড়ানো সোজা নামানোই শক্ত। লোকটা যে পড়বে তাতে আমার কোনো দুঃখ বা সহানুভূতি নেই। কেননা লোকটার প্রখর বুদ্ধি আছে, কিন্তু বিবেক বলে কিছু নেই;—আমি জানি, লোকটা নরপিশাচ।

দুপোঁ একটু হেসে আবার বললে, একদিন এই সম্ভ্রান্ত মহিলা যখন ঘৃণাভরে এঁকে তুচ্ছ করবেন, তখন ইনি ঘরে ফিরে ঐ নকল চিঠিটা খুলবেন যেটা আমি রেখে এসেছি। চিঠিটা পড়ে এঁর মনের অবস্থা কী রকম হবে তা যদি জানতে পারতাম!

আমি অবাক হয়ে বললাম,—কেন, তুমি সে চিঠিতে কী লিখে রেখে এসেছ?

দুপোঁ বললে,—একেবারে সাদা কাগজ রেখে আসা কি উচিত হতো? সে যে বড়ো অপমানের ব্যাপার হতো! একবার এই ডি—ভিয়েনাতে আমার সঙ্গে একটা অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন। আমি খুব মিষ্টি কথায় তাঁকে বলেছিলাম, ব্যাপারটা আমার মনে থাকবে। এই নকল চিঠি দিয়ে কে তাঁকে ঠকালো, এ প্রশ্ন তাঁর মনে উঠবেই। তাই আমি ভাবলাম একটু সূত্র তাঁকে দেয়া উচিত। আমার হাতের লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। নকল চিঠির মাঝখানে ক-টা আপ্তবাক্য আমি লিখে এসেছি। কথাগুলো এইরকম—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

স্বর্গের রথ

ই. এম. ফর্স্টার

যে ছেলেটি সার্বিটন সহরের অন্তর্গত ২৮নং বাকিংহাম পার্ক রোডের আগাথকস্ লজএ বাস করতো, বাড়ির প্রায় উল্টো দিকের পুরোনো সাইন-পোস্টটা দেখে প্রায়ই তার ধাঁধা লাগতো। মাকে সে অনেকবার কথাটা জিজ্ঞেস করেছে; জবাবে তিনি বলেন, অনেক বছর আগে কয়েকটা বখাটে ছোকরা এই বাজে রসিকতা করেছে, পুলিশের উচিত ওটাকে ফেলে দেওয়া। কারণ সাইন-পোস্টটার দুটো জিনিস ভারি অদ্ভুত: প্রথমত, ওটার মুখ রয়েছে একটা কানা গলির দিকে, আর দ্বিতীয়ত, অস্পষ্ট অক্ষরে ওর উপরে লেখা রয়েছে, 'স্বর্গের পথ।'

ছেলেটি জিজ্ঞেস করলে, তারা কেমনধারা মানুষ ছিলো?

যতদূর আমার মনে পড়ে তোমার বাবা বলেছিলেন যে তাদের মধ্যে একজন কবিতা লিখতো; বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো; তা ছাড়া আরো অনেক দুঃখ তাকে ভুগতে হয়েছিলো। সে অনেককাল আগেকার কথা। তুমি বরং তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস কোরো। অবশ্য তিনিও আমার মতোই বলবেন যে, রসিকতা করেই ওটা বসানো হয়েছিলো।

তাহলে ও কথাগুলোর কোনো অর্থ নেই?

মা তাকে উপরে পাঠিয়ে দিলেন ভালো জামাকাপড় পরতে, কারণ শীঘ্রই মিঃ বন্সরা আসবেন চায়ের নিমন্ত্রণে, আর কেক-দানটা তাকেই হাতে তুলে দিতে হবে।

আঁটোসাঁটো ট্রাউজারে পা গলাতে গলাতে তার মনে হলো, মিঃ বন্সকে সাইন-পোস্টটার কথা জিজ্ঞেস করলে মন্দ হয় না।

তার বাবা এমনিতে অবশ্য লোক ভালো, কিন্তু তাকে দেখলেই কেমন হাসতে থাকেন—আর সে নিজে বা অন্য কোনো ছেলে যদি কিছু জিজ্ঞেস করে বা কথা বলে তাহলে তো তিনি একেবারে হো হো করে চেঁচিয়ে ওঠেন। কিন্তু মিঃ বন্স যেমন ভালো মানুষ তেমনি গম্ভীর। ভারি সুন্দর তাঁর বাড়িখানা। মানুষকে তিনি বই পড়তে দেন। গির্জের তিনি একজন কর্মচারি, আবার কাউন্টি কাউন্সিলের একজন নির্বাচনপ্রার্থী। অনেক টাকা তিনি দান করেছেন অবৈতনিক পাঠাগারে। সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করেন। পার্লামেন্টের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মোট কথা, জীবিত লোকদের মধ্যে তিনিই বোধহয় সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি।

অথচ মিঃ বন্সও শুধু এইটুকুই বলতে পারলেন যে, সাইন-পোস্টটা একটা রসিকতা মাত্র—আর সে রসিকতা যে করেছে তার নাম শেলি।

অমনি মা বলে উঠলেন, ঠিক তাই। আমিও তোমাকে তাই বলেছি না? ঠিক, ঐ নামই তার ছিলো।

মিঃ বন্স শুধোলেন, তুমি কি শেলির কথা কখনো শোনো নি?

না, বলেই ছেলেটি মাথা নিচু করলো।

সে কী? বাড়িতে কি শেলির কোনো বই নেই?

কেন, নিশ্চয়ই আছে! বিচলিত ভাবে মহিলাটি বলে উঠলেন, দেখুন মিঃ বন্স, তেমন অমার্জিত রুচি আমাদের নয়। অন্তত দুখানা তো আছেই। একখানা বিয়েতে উপহার পেয়েছি, আর যেখানা ছোট অক্ষরে ছাপা সেখানা এমনিতেই পেয়ে গিয়েছি।

মিঃ বন্স মৃদু হেসে বললেন, আমার নিজের বোধহয় শেলির বই আছে সাতখানা। তারপর কোলের উপর থেকে রুটির টুকরোগুলো ঝেড়ে ফেলে তিনি মেয়েকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মায়ের ইংগিতে ছেলেটি বাগানের গেট পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে গেলো। তাঁরা চলে যাবার পরেই কিন্তু সে বাড়িতে ফিরে গেলো না। কিছুক্ষণের জন্যে তাকিয়ে দেখলো বাকিংহাম পার্ক রোডের একোন-ওকোন।

তার বাবা-মা বাস করতেন রাস্তার ডানদিকের একেবারে শেষে। ৩৯ নম্বরের পর থেকেই বাড়িগুলোর চেহারা হঠাৎ ভারি বিশ্রী হয়ে গেছে। ৬৪ নম্বর বাড়ির তো চাকরদের ঢোকবার আলাদা রাস্তা পর্যন্ত নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে সমস্ত রাস্তাটাই যেন ছেলেটির ভারি ভালো লাগলো দেখতে। সবেমাত্র সূর্য অস্ত গেছে, তার বর্ণসমারোহে মুছে গেছে ভাড়ার তারতম্য। ছোট-ছোট পাখি ডাকছে। মজুরদের ট্রেনখানা যেন সুরেলা শব্দ করে চলেছে মাঠের ভিতর দিয়ে। সারা সার্বিটন সহরের সৌন্দর্য বুঝি জমা হয়েছে সেই আশ্চর্য মাঠটায়—আল্পস্ পাহাড়ের উপত্যকার মতো ফার সিলভার বার্চ আর প্রিমরোজ ফুলের ঐশ্বর্যে মাঠটা নিজেকে সাজিয়েছে যেন। এই মাঠটাই ছেলেটির মনে প্রথম জাগিয়েছিলো সেই আশ্চর্য ইচ্ছেটা—কিসের সে ইচ্ছে তা সে নিজেই জানে, অথচ এই সন্ধ্যার মতো যখনই চারিদিক রাঙা হয়েছে সূর্যের আলোয় তখনই এই ইচ্ছেটা বার বার ঠেলে ঠেলে উঠেছে, তোলপাড় করেছে তার বুকের ভিতরে; ক্রমে ক্রমে একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছে তার মন, এমন-কি চেয়েছে কান্নায় ভেঙে পড়তে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় তাকে যেন আরো বোকামিতে পেয়ে বসলো। রাস্তায় নেমে সে সাইন-পোস্টের দিকে এগিয়ে গেলো, আর তারপর কানা গলিটা ধরে দৌড়তে লাগলো।

'আইভ্যান হো' আর 'বেলে ভিস্টা' বাগানের দুই উঁচু প্রাচীরের ভিতর দিয়ে চলে গেছে গলিটা। সারা পথটাই কেমন

গন্ধে ভরা। একেবারে শেষের বাঁকটা সমেত লম্বায় কুড়ি গজের বেশি হবে না। কাজেই একটু পরেই ছেলেটিকে থামতে হলো। সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, ঐ শেলিটাকে একটা লাথি কসাতে ইচ্ছে করছে! অলসভাবে চোখ মেলে দেখতে পেলো, দেয়ালে একটুকরো কাগজ। ফিরবার আগে মনোযোগ দিয়ে সেটাকে সে একবার পড়লো। তাতে লেখা রয়েছে :

এস. এ্যাণ্ড্ সি. আর. সি. সি.

S. And C. R. C. C.

চলাচল-ব্যবস্থার পরিবর্তন

সহযোগিতার অভাবে কোম্পানি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় চলাচল ব্যবস্থা রহিত করিতে বাধ্য হইলেন, তবে

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বাসগুলি

যথারীতি চলাচল করিবে। আশা করা যাইতেছে যে, জনসাধারণের সুবিধার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাঁহারা তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন। অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসাবে কোম্পানি এই সর্বপ্রথম

যাতায়াতি টিকিট!

(মাত্র একদিনের যাতায়াতের জন্য) ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেন। টিকিট ড্রাইভারের নিকট পাওয়া যাইবে। যাত্রীগণকে আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, অপর পিঠের শুরু হইতে কোনো টিকিট দেওয়া হইবে না, এবং এতৎসংক্রান্ত কোনো দাবী কোম্পানি কর্তৃক বিবেচিত হইবে না। ইহা ছাড়া যাত্রীদের কোনো রকম অবহেলা বা বোকামি, অথবা শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ, টিকিট, হারানো বা দৈব কোনো ঘটনার জন্যও কোম্পানি দায়ী থাকিবেন না।

পরিচালনার পক্ষে।

এ নোটিশটা তো এর আগে সে কখনো দেখেনি! আর এ বাসটা যে কোথায় যায় তাও তো বোঝা গেলো না। এস. মানে হয়তো সার্বিটন এবং আর. সি. সি. মানে রোড কার কোম্পানি। কিন্তু শেষের সি. টার মানে কি? কুম্‌বি এ্যাণ্ড মাল্‌ডেন, না সিটি? নাম যাই হোক, সাউথ-ওয়েস্টার্ণ কোং-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিছুতেই পেরে উঠবে না। ছেলেটি আপন মনেই ভাবলো, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে পরিচালিত। আর বাস ছাড়বার সময়টিই বা কেমন! হঠাৎ তার মনে হলো, নোটিশটা যদি ধাপ্পা না হতো তাহলে মিঃ বন্সদের সে যখন বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়েছিলো তখনই বাসটা ছেড়ে যাওয়া উচিত ছিলো। আসন্ন গোধূলির আবছা অন্ধকারে মাটিতে চোখ ফেলে সে দেখতে চেষ্টা করলো সেখানে চাকার দাগ আছে কি না। না, সে গলি দিয়ে কিছুই আসে নি। তাছাড়া, বাকিংহাম পার্ক রোডে কোনোদিনই সে কোনো বাস চলতে দেখে নি। নাঃ, অন্য আর-পাঁচটা সাইন-পোস্টের মতো, রূপকথার গল্পের মতো, রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠবার আগে দেখা স্বপ্নের মতো এটাও নিশ্চয় একটা ধাপ্পা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে পা বাড়িয়ে দিলো—ফিরে গেলো বাবার কোলে।

হায় রে, বাবার সে কী হাসি! তিনি চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, বেচারি, বেচারি পপ্‌সি! ডিডাম্‌স্! ডিডাম্‌স্! ডিডাম্‌স্ ভাবে, ও বুঝি যাবে কোন্ তেপান্তরের মাঠে! মা-ও হাসতে হাসতে আগাথকস্ লজএর সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন। ঢোক গিলে বললেন, দোহাই বব্, অমন করে হেসো না! উঃ, তুমি দেখছি আমাকে মেরে ফেলবে! দোহাই তোমার, ছেলেটাকে রেহাই দাও!

কিন্তু সারা সন্ধ্যা চললো সেই হাসি-ঠাট্টা। বাবা বললেন,

আমাকেও বরং নিয়ে যাস সঙ্গে। হ্যাঁ রে, হাঁটতে কি খুব কষ্ট হয়? দরজার মাদুরে কি পা মুছে ঢুকতে হয়? মনে-মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ছেলেটি শুতে গেলো। অন্তত একটি কথা ভেবে তার ভালো লাগলো—ভাগ্যিস বাসের সম্বন্ধে একটা কথাও সে বলে নি! ব্যাপারটা নিশ্চয় ধাপ্পা। তবু স্বপ্নের ভিতর দিয়ে বাসটাই ক্রমশ বাস্তব হয়ে উঠলো, সার্বিটনের যে রাস্তা দিয়ে বাসটা চলছিলো সেইটেই ক্রমশ ধোঁয়াটে হতে লাগলো। তারপর ভোরবেলায় এক সময় সে চিৎকার করে জেগে উঠলো,—বাসটার গন্তব্যস্থলের একটা আভাস যেন পেয়েছিলো।

একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললো সে। তার আলো পড়লো ঘড়িতে আর ক্যালেণ্ডারের উপরে। সে দেখলো, সূর্যোদয়ের আর আধঘণ্টা বাকি। বাইরে গাঢ় অন্ধকার, কারণ রাতের বেলায় লণ্ডন থেকে ভেসে এসেছে কুয়াশা, সারা সার্বিটন সহরকে ঢেকে ফেলেছে। তবু সে লাফ দিয়ে উঠে জামাকাপড় পরে ফেললো। চূড়ান্তভাবে সে মীমাংসা করে ফেলবে কোন্‌টা সত্যি: বাসটা, না রাস্তাগুলো। মনে মনে ভাবলো, এটা ঠিক না জানা পর্যন্ত আমি বোকাই থেকে যাবো। একটু পরেই দেখা গেলো, গলির মোড়ের গ্যাসের আলোর নিচ দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে এগিয়ে চলেছে।

গলিটাতে ঢুকতেও বেশ সাহসের দরকার। একে তো ভীষণ অন্ধকার, তাছাড়া তার আরো মনে হলো যে, একটা বড় বাসের পক্ষে সেখানে ঢোকাও অসম্ভব। ঠিক সেই সময় একটি পুলিশ যদি কুয়াশার ভিতর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে না আসতে থাকতো, তাহলে গলিতে ঢোকবার চেষ্টাও সে হয়তো করতো না। পরমুহূর্তেই সে পা বাড়ালো। নেই, কিছু নেই। একটা ফাঁকা গলি, আর তার ধুলোমাটির উপর হাঁ করে দাঁড়িয়ে একটা

বোকা ছেলে। সবটাই ধাপ্পা। সে স্থির করলো, বাবা-মাকে সব কথা বলবো। সব কথা তাঁদের জানানোই আমার উচিত। আমার মতো বোকা কি আর কেউ আছে? তখনি সে আগাথকস্ লজএর গেটে ফিরে গেলো।

তখন হঠাৎ তার মনে পড়লো, ঘড়িটা ফাস্ট যাচ্ছে। সূর্য এখনো ওঠে নি। আরো দু-মিনিটের মধ্যে উঠবে না। একান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গেই সে ভাবলো, বাসটাকে সব রকম সুযোগ দেওয়া উচিত। আবার সে ফিরে গেলো গলিতে।

সত্যি, বাসটা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে!

[দুই]

বাসের দুটো ঘোড়া। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার দরুন তাদের গা থেকে তখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাসের আলোদুটো কুয়াশা ভেদ করে গলির দুপাশের দেওয়ালের গায়ে পড়ে মাকড়সার ঝুল আর শ্যাওলার ভিতরে সৃষ্টি করেছে রূপকথার সৌন্দর্য। ড্রাইভারের মাথা একটা টুপিতে ঢাকা। ফাঁকা দেওয়ালের দিকে সে মুখ ফিরিয়ে ছিলো। বাসটাকে এমন নিঃশব্দে এমন নিখুঁত-ভাবে কেমন করে সে চালিয়ে এনেছিলো সে রহস্য ছেলেটি কোনোদিন জানতে পারে নি। আর বাসটাকে আবার কেমন করেই বা সে বাইরে চালিয়ে নিয়ে যাবে তাও সে কল্পনায় আনতে পারে নি।

দেখুন,—বিশ্রী, তামাটে বাতাসের ভিতর দিয়ে তার গলার স্বর ভেসে গেলো, দেখুন, এটা কি একটা বাস?

বাস তো বটেই, মুখ না ফিরিয়েই ড্রাইভার জবাব দিলো। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। পুলিশটা কাসতে কাসতে গলির মোড় দিয়ে চলে গেলো। ছেলেটি আবছা অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লো,

কেউ তাকে দেখতে পায় এটা সে চায় না। কারণ সে স্থির জানে, এটা জলদস্যুদের বাস। তাছাড়া আর কিছু কখনো এমনি অদ্ভুত সময়ে এমন অদ্ভুত জায়গা থেকে ছাড়ে না।

সে নির্ভয় গলায় বললো, বাস কখন ছাড়বে ?

সূর্যোদয় হলে।

কতোদূর যাবে ?

সমস্ত পথ।

সারা পথ ঘুরে আসবার একখানা যাতায়াতি টিকিট আমি পেতে পারি কি ?

পারো।

সূর্য এতোক্ষণে নিশ্চয় উঠেছে, কারণ ড্রাইভার ততোক্ষণে ব্রেকটা তুলে দিয়েছে। ছেলেটি লাফ দিয়ে উঠলো বাসে। সঙ্গে বাস ছেড়ে দিলো।

কী হলো ? বাসটা কি চলছে ? ফাঁকা দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। তবু বাসটা চলেছো দ্রুত গতিতে, চলেছে কুয়াশার ভিতর দিয়ে। কুয়াশার রং ক্রমে তামাটে থেকে হলদে হচ্ছে। গরম বিছানা আর তার চেয়ে গরম প্রাতরাশের কথা ভেবে ছেলেটি বড়ই মুসড়ে পড়লো। তার মনে হলো, না এলেই ছিলো ভালো। বাবা-মা নিশ্চয় তাকে আসতে দিতেন না। আবহাওয়া অনুকূল হলে সে নিশ্চয় ফিরে যেতো। বাসে সে-ই একমাত্র যাত্রী। ভয়ংকর নির্জন লাগছে। বাসটা বেশ শক্ত-পোক্ত হলেও বড় ঠাণ্ডা, আর একেবারেই পুরোনো। গায়ের কোটটা ভালো করে জড়িয়ে নিলো সে। পকেটে হাত দিতেই দেখে, পকেট ফাঁকা। টাকার থলেটা আনতে সে ভুলে গেছে।

থামুন ! সে চিৎকার করে উঠলো, থামুন ! তারপর আরেকটু ভদ্রভাবে ড্রাইভারের নাম ধরে ডাকবার জন্য সে ছাপানো

নোটিশ-বোর্ডটার দিকে তাকালো। মিঃ ব্রাউন! থামুন, দয়া করে থামুন!

মিঃ ব্রাউন কিন্তু থামলো না, একটা ছোট্ট জানলা খুলে ছেলেটির দিকে চাইলো। আশ্চর্য তার মুখখানি, কেমন শান্ত, কেমন নরম!

মিঃ ব্রাউন! আমার টাকার থলেটা ফেলে এসেছি। আমার কাছে একটা পেনিও নেই। টিকিটের দামও দিতে পারবো না আমি। আপনি আমার ঘড়িটা নেবেন কি? বড়ই বিপদে পড়েছি আমি।

ড্রাইভার বললো, সিংগল বা রিটার্ন, এ লাইনের কোনে টিকিটই পৃথিবীর ট্যাঁকশালে তৈরি মুদ্রা দিয়ে কেনা যায় না। এই কথা বলে সে ছেলেটির হাতে একখানা টিকিট গুঁজে দিলো। ছেলেটি বললো, ধন্যবাদ। মিঃ ব্রাউন আবার বললো, আমি জানি নামের দাবি একান্তই অর্থহীন। তথাপি হাসিমুখে উচ্চারণ করলে তাতে নিন্দের কিছু নেই। বরং এই দ্ব্যর্থবোধক জগতে নামের একটা সুবিধেই রয়েছে,—নামের দ্বারাই একজন জ্যাককে তার প্রতিবেশী থেকে আলাদা করে চেনা যায়। কাজেই আমাকে স্যার টমাস ব্রাউন বলেই জেনো।

আপনি একজন স্যার? সত্যি, আমি দুঃখিত! ভদ্র ড্রাই-ভারদের কথা সে আগেও শুনেছে। টিকিটটা দিয়ে আমার খুবই উপকার করলেন। কিন্তু এভাবে চললে বাস চালিয়ে আপনি পয়সা পাবেন কেমন করে?

পয়সা তো পাই না। চাইও না। আমার এ গাড়ির অনেক দোষ। বিদেশী কাঠ দিয়ে অদ্ভুতভাবে একে তৈরি করা হয়েছে; এর বসবার কুশনগুলো বিশ্রামের পরিবর্তে বরং নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করে; আমার ঘোড়াগুলো বর্তমানের চির-

সবুজ প্রান্তরের ঘাস না খেয়ে বরং প্রাচীন ল্যাটিন যুগের লবঙ্গ ও অন্য সব শুকনো ফল খায়। কিন্তু এর থেকে পয়সা আসে— এ ভুল আমি কোনোদিন করতে চাইও নি, করিও নি।

ছেলেটি হতাশ ভাবে বললো, আমি আবার দুঃখ প্রকাশ করছি। স্যার টমাসের ভয় হলো, সে বুঝি মুহূর্তের জন্যও ওর দুঃখের কারণ হয়েছে। তার মুখেও দুঃখের ছাড়া পড়লো। সে ছেলেটিকে কোচবক্সে তার পাশে গিয়ে বসতে বললো। তারপর কুয়াশার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললো। কুয়াশার রং এখন হলদে থেকে সাদা হতে শুরু করেছে। রাস্তার দুপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। কাজেই সেটা হয় পাট্‌নি হীথ, না-হয় উইম্বল্‌ডন্ কমন হবে।

আপনি কি আগেও ড্রাইভার ছিলেন?

এক সময়ে আমি ছিলাম চিকিৎসক।

সে-কাজ ছাড়লেন কেন? আপনি কি ভালো চিকিৎসক ছিলেন না?

দেহের বৈদ্য হিসেবে আমি সফলতা পেয়েছিলাম সামান্যই। কয়েক কুড়ি রোগী আমার আগেই মহাপ্রস্থান করেছে। কিন্তু মনের বৈদ্য হিসেবে আমি পেয়েছি আশাতিরিক্ত সাফল্য। কারণ আমার ওষুধ আর-দশজনের চেয়ে ভালো বা মন্দ না হলেও এমন চমৎকার পাত্রে আমি তা পরিবেশন করতাম যে, মোহাচ্ছন্ন মন প্রায়ই তাতে চুমুক দিতে প্রলুব্ধ হতো এবং ফলে শান্তি লাভ করতো।

মোহাচ্ছন্ন মন! ছেলেটি অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলো: গাছের আড়ালে সূর্য অস্ত গেলে হঠাৎ যখন ভারি অদ্ভুত লাগে, তাকেই কি বলে মোহাচ্ছন্ন মন?

সে-রকমটা তোমারও তাহলে হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

একটু থেমে এ-যাত্রার লক্ষ্যস্থল সম্বন্ধে সে সামান্য কিছু—খুবই সামান্য—বললো ছেলেটিকে। অবশ্য অনেক কথা তাদের মধ্যে হলো না, কারণ ছেলেটি কাউকে ভালবাসলে বকবক করার চেয়ে তার পাশে চুপটি করে বসে থাকতেই পছন্দ করতো। ছেলেটি আরো বুঝতে পারলো যে স্যার টমাস ব্রাউনের মনের গড়নটাও সেই একই রকমের। সে অবশ্য যুবক শেলির কথা কিছুটা শুনতে পেলো। সে নাকি এখন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তার নিজের গাড়ি পর্যন্ত আছে। এই কোম্পানির চাকুরে আরো কয়েকজন ড্রাইভারের কথাও সে শুনলো। ইতিমধ্যে কুয়াশা কেটে না গেলেও দিনের আলো বেশ জোরালো হয়ে উঠলো। কুয়াশা যেন মাঝে মাঝে মেঘের মতো তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো। কেমন অদ্ভুতভাবে তারা যেন উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। বাস টানা ঘোড়াদুটো দু-ঘণ্টার উপরে ছুটছে। এটা রিচমণ্ড হিল হলে তো অনেক আগেই তাদের পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা উচিত ছিলো। তাহলে বোধহয় এটা এপসম্ বা নর্থ ডাউন্স। কিন্তু বাতাস যেন আরো তীব্র, তীক্ষ্ণ। কোথায় যে তারা চলেছে সে বিষয়েও স্যার টমাস ব্রাউন একেবারে নীরব।

একটা বাজ পড়ার শব্দ হলো।

ছেলেটি বলে উঠলো, বাপরে! একটা বাজ পড়লো! বেশ কাছেই মনে হচ্ছে। কেমন শব্দ হচ্ছে শুনুন!

হঠাৎ অস্পষ্ট ভাবে তার বাবা-মার কথা মনে পড়লো। তাঁরা যেন খাবার টেবিলে বসে কান পেতে শুনছেন ঝড়ের শব্দ। সে যেন দেখতে পাচ্ছে, তার নিজের চেয়ার খালি পড়ে আছে। তাকে নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা, অনেক আশা-নিরাশার কথা

হচ্ছে। দুপুরের খাবারের সময় তাকে নিশ্চয় আশা করবেন তাঁরা। সে কিন্তু থাকবে না সেখানে। চায়ের সময়েও না। একেবারে সেই রাতের খাবারের সময়ে সে গিয়ে হাজির হবে। এমনি করেই শেষ হবে তার পালিয়ে বেড়ানো। টাকা সঙ্গে থাকলে তাঁদের জন্য কিছু উপহার সে নিয়ে যেতো। অবশ্য কী যে নিতো তা সে জানে না।

আবার বাজ পড়লো।

বজ্রের শব্দ আর বিদ্যুতের চমক একই সঙ্গে এলো। কেঁপে-কেঁপে উঠলো মেঘগুলো। যেন জীবন্ত। খান-খান হয়ে ছুটে গেলো কুয়াশার আলোকস্রোত।

তুমি কি ভয় পেয়েছো? স্যার টমাস ব্রাউন শুধোলো, এতো ভয় পাবার কী আছে? ও তো অনেক দূরে!

কান-ফাটানো শব্দ করে একটা আগুনের গোলা ফাটলো হঠাৎ। কামারশালার হাপরের মতো শব্দ। সে শব্দে যেন খান-খান হয়ে ভেঙে গেলো মেঘলোক।

ঐ যে, শুনুন স্যার টমাস ব্রাউন! না না, মানে, চেয়ে দেখুন। শেষ পর্যন্ত আমরা বোধহয় দেখতে পাবো। না, মানে, শুনতে পাবো। শব্দটা যেন ইন্দ্রধনুর মতো!

শব্দটা ক্রমে অস্পষ্টতর হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো। সেখান থেকে আবার উঠলো একটা অস্পষ্ট শব্দ। নিঃশব্দে যেন ছড়িয়ে পড়লো অর্ধবৃত্তাকারে। একটা ইন্দ্রধনু যেন অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়লো ঘোড়ার পা থেকে বিলীয়মান কুয়াশা পর্যন্ত।

বাঃ, কী সুন্দর! কেমন রঙের বাহার! কোথায় এর শেষ? এ যেন সেই ইন্দ্রধনু, যার উপর দিয়ে পা ফেলে চলা যায়! এ যেন স্বপ্ন!

রং আর শব্দ একসঙ্গে বাড়তে লাগলো। এক বিস্তীর্ণ

উপসাগরের দুই তীরে সেতু বাঁধলো সেই ইন্দ্রধনু। তার নিচ দিয়ে ছুটতে লাগলো মেঘের দল। টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে লাগলো। ক্রমেই বড় হতে লাগলো সেই ইন্দ্রধনু, এগিয়ে চললো সমুখপানে, জয় করে চললো অন্ধকারকে ; ক্রমে এমন একটা জায়গায় পৌঁছলো যা মেঘের চেয়ে কঠিন।

উঠে দাঁড়ালো ছেলেটি। বলে উঠলো, ওটা কী ওখানে? ওপারে কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওটা?

সকালের সূর্যালোকে উপসাগরের ওপারে ঝলমল করে উঠলো একটা পাহাড়। পাহাড়—না একটা দুর্গ? ঘোড়াদুটো ছুটতে লাগলো। পা ফেললো ইন্দ্রধনুর উপরে।

ছেলেটি চিৎকার করে উঠলো, বাঃ, দেখুন! বাঃ, শুনুন! ঐ যে গুহাগুলো—না কি ওগুলো দরজা?—ঐ যে, ঐ পাহাড়-চুড়োর ফাঁকে ফাঁকে দেখুন! দেখা যাচ্ছে কতো লোকজন! কতো গাছপালা!

স্যার টমাস তার কানে কানে বললো, নিচেও তাকাও। ভবিষ্যদ্বক্তা একেরনকে উপেক্ষা কোরো না।

তখন ইন্দ্রধনুর অগ্নিশিখাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাদের গাড়ির চাকা। তারই ফাঁক দিয়ে ছেলেটি নিচে তাকালো। নিচটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। অনেক নিচে বয়ে চলেছে অনন্ত নদী। সূর্যের একটা রশ্মি এসে পড়লো ছোট একটা সবুজ পুকুরে। তার উপর দিয়ে যেতে-যেতে সে দেখতে পেলো, তিনটি মেয়ে গান গাইতে গাইতে সেই পুকুরের জলের উপরে উঠে আংটির মতো কি-একটা চকচকে জিনিস নিয়ে খেলা করছে।

সে বলে উঠলো, নিচের জলে যারা রয়েছে—

তারা জবাব দিলো, সেতুর উপরে যারা রয়েছে—

শুরু হলো বিচিত্র সঙ্গীত—সেতুর উপরে যারা রয়েছো,

আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। সত্য আছে গভীরে। সত্য আছে ঊর্ধ্বলোকে।

তোমরা যারা নিচের জলে রয়েছ, কী করছো তোমরা?

স্যার টমাস ব্রাউন জবাব দিলো, যে সম্পদ ওরা পেয়েছে তাই নিয়ে খেলা করছে।

বাসটা হাজির হলো গন্তব্য স্থানে।

[তিন]

ছেলেটির লাঞ্ছনার আর শেষ নেই। আগাথকস্ লজএর নার্সারিতে তালাবন্দী হয়ে সে কবিতা মুখস্ত করছে শাস্তি হিসেবে। তার বাবা বলেছেন, ছাখো বাপু! আমি সব ক্ষমা করতে পারি, শুধু অসত্য ছাড়া। তাকে বেত মারতে মারতে এক-একটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন, বাস **নেই,** বাসের চালক **নেই,** সেতু **নেই,** পাহাড় **নেই**; তুমি একটি **স্কুল-পালানো, হা-ঘরে, মিথ্যাবাদী**! তার বাবা কখনো-কখনো এতো নিষ্ঠুরও হতে পারেন! মা ওকে বার বার অনুরোধ করেছেন, দুঃখ প্রকাশ করতে। কিন্তু ও রাজি হয় নি। শেষকালে যতোই থাক বেতের আর কবিতার শাস্তি, এটি যে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন!

ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে এসেছে—স্যার টমাস ব্রাউন এবার গাড়ি চালায় নি, গাড়ি চালিয়েছে একটি হাসিখুশি কুমারী মেয়ে। বাস আর ল্যাণ্ডো গাড়ি সম্পর্কে তারা অনেক আলোচনা করেছে। আহা, তার মিষ্টি গলাটা এখন মনে হচ্ছে যেন কতো দূরে! অথচ তিন ঘণ্টাও হয় নি সে তাকে গলিটার মোড়ে ছেড়ে এসেছে।

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তার মা বললেন, তোমার কবিতার বই হাতে নিয়ে নিচে নেমে এসো।

নিচে নেমে ছাখে, ধূমপানের ঘরে বসে আছেন মিঃ বন্স আর তার বাবা। মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন হয়েছে বাড়িতে।

বাবা কড়া গলায় বলে উঠলেন, এই যে, মহাপর্যটক এসে হাজির হয়েছেন! এই তরুণ ভদ্রলোকটি রামধনুর উপর দিয়ে বাস চালিয়ে যান, আর তরুণীরা সব তাঁকে সোনায় মধুর সঙ্গীত। নিজের কথায় তিনি নিজেই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মিঃ বন্স হেসে বললেন, যাই বলুন, এরকম ধারা ব্যাপার যেন ওয়াগ্‌নারেও কিছুটা আছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, একেবারে কচি মনেও কেমন করে শিল্প-সত্যের ছোঁয়া লাগে! সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনকে টানছে। ওর হয়ে আমি কিছু বলতে চাই। এক সময়ে আমরাও অনেক স্বপ্ন দেখেছি, কেমন কি না?

মা বললেন, ছাখো, মিঃ বন্স কেমন স্নেহশীল।

বাবা বললেন, বেশ তো, কবিতাটা ও মুখস্ত বলুক,. তাহলেই হবে। মঙ্গলবারে ওকে আমার বোনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে-ই ওর গলি-ঘোরা রোগ সারিয়ে দেবে। (উচ্চ হাসি) বলো কবিতা।

ছেলেটি শুরু করলো—একাকী দাঁড়িয়ে বিরাট অজ্ঞতায়—

বাবা আবার হেসে উঠলেন—ফেটে পড়লেন হাসিতে। বাপু হে, ঠিক তোমার মতো! একাকী দাঁড়িয়ে বিরাট অজ্ঞতায়! কবিরা যে এমন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে তা তো জানতাম না! ঠিক যেন তোমারই বিবরণ দিয়েছে। আচ্ছা, মিঃ বন্স, আপনি কবিতা নিয়ে থাকুন, আমি ততক্ষণ হুইস্কিটা নিয়ে আসি।

মিঃ বন্স বললেন, সেই ভালো। কীট্‌সের বইখানা আমাকে দিন। এবার ও আমাকে কীট্‌স্ শোনাক।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেই ঘরে রইলো একটি জ্ঞানী লোক আর একটি অজ্ঞান বালক।

একাকী দাঁড়িয়ে বিরাট অজ্ঞতায়
তোমাকেই আমি স্বপ্নে যে দেখি,
আর দেখি সাইক্লেডস্ ;
সমুদ্রতীরে একাকী দাঁড়িয়ে যেন
একান্ত মনে চাই দেখিবারে—

ঠিক আছে। কী চাই দেখিবারে ?

—চাই দেখিবারে
সমুদ্রতলে শিশু প্রবালের দল,—বলতে-বলতেই ছেলেটি কান্নায় ভেঙে পড়লো।

আরে, আরে, কী হলো ? কাঁদছো কেন ?

কারণ—কারণ কবিতার এই সব কথা, সব যেন আমারই কথা বলে মনে হচ্ছে !

মিঃ বন্স হাতের বই নামিয়ে রাখলেন। খুবই ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। তিনি বলে উঠলেন, তোমার কথা ? এই সনেটটা তোমারই কথা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আরো শুনুন :

আহা, অন্ধকারের ওপারেতে আছে আলো,

পাহাড়ের বুকে কুমারী সবুজ বন।—ঠিক তাই, স্যার, ঠিক তাই ! এ সবই সত্যি !

চোখ বুজে মিঃ বন্স বললেন, কোনো সন্দেহ নেই তাতে।

আপনি—আপনি তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করেন ? আপনি বিশ্বাস করেন সেই বাস, তার চালক, সেই ঝড় আর সেই যাতায়াতি টিকিট যা আমি বিনা পয়সায় পেয়েছিলাম, আর—

উঁহু-হু, তোমার গল্প এবার থামাও। আমি বলছিলাম যে, কাব্যের মূল সত্যকে আমি কখনো সন্দেহ করিনি। একদিন,

যখন আরো অনেক তুমি পড়ে ফেলবে, তুমি আমার কথার অর্থ বুঝতে পারবে।

কিন্তু মিঃ বন্স, এ সবই সত্যি। অন্ধকারের ওপারে আলো আছে। সে আলো আমি দেখেছি। আলো আর বাতাস।

যত সব বাজে কথা! বললেন মিঃ বন্স।

আহা, যদি আমি সেখানে থাকতাম! তারা আমাকে লোভ দেখিয়েছিলো। বলেছিলো আমার টিকিটটা ফেরৎ দিতে—টিকিট না থাকলে তো আর কেউ ফিরে আসতে পারবে না! নিচের নদী থেকে ডেকে তারা আমাকে একথা বলেছিলো, আর সত্যি কথা বলতে কি আমার লোভও হয়েছিলো, কারণ সেই পাহাড়-ঘেরা দেশে গিয়ে যে আনন্দ আমি পেয়েছিলাম এমনটি জীবনে আর কখনো পাই নি। কিন্তু তখনি মনে পড়ে গেলো বাবা-মার কথা। ভাবলাম, তাঁদেরও সেখানে নিয়ে যাবো। কিন্তু পথটা আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিক থেকে শুরু হলে কী হবে, তাঁরা সেখানে যাবেন না। তাছাড়া, সেখানকার মানুষগুলো আমাকে যা যা বলে সতর্ক করে দিয়েছিলো শেষ পর্যন্ত ঠিক তাই ঘটলো; অন্য সকলের মত মিঃ বন্সও আমাকে অবিশ্বাস করলেন। আমাকে বেত মারা হয়েছে পর্যন্ত! হায়, সেই পাহাড়টাকে আর কোনোদিন আমি চোখে দেখতে পাবো না!

আমার কথা কী বলেছিলে? সহসা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করলেন মিঃ বন্স।

আপনার কথা তাদের আমি বলেছিলাম। আপনি কেমন বুদ্ধিমান, আপনার কত বই আছে—সব। আর তারা শুনে বললো, মিঃ বন্স নিশ্চয় তোমার কথা অবিশ্বাস করবেন।

দ্যাখো বাপু, তুমি বড্ড বাজে কথা বলতে শুরু করেছো, ক্রমেই অশিষ্ট হয়ে উঠছো। যা হোক, ব্যাপারটা আমি

মিটিয়ে ফেলতে চাই। তোমার বাবাকে এ নিয়ে কিছুই বলে দরকার নেই। আমিই তোমার ব্যাধি সারাবো। কাল সন্ধ্যায় আমি নিজে এসে তোমাকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবো। তারপর সূর্যাস্তের সময় উল্টো দিকের গলি ধরে এগিয়ে যাবো তোমার বাসের সন্ধানে। বুঝলে বোকা ছেলে?

এ-কথায় ছেলেটি একটুও ঘাবড়ালো না দেখে মিঃ বন্সএর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। ছেলেটি কিন্তু ঘরময় লাফাতে লাফাতে বলতে লাগলো, কী মজা! মজা! আমি তাদের বলেছিলাম, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন। ইন্দ্রধনুর উপর দিয়ে আমরা দুজন গাড়ি চালিয়ে যাবো। আমি তাদের বলেছিলাম, আপনি নিশ্চয় সেখানে যাবেন।

যাই হোক, এসব কথার মানে আছে কি কিছু? ওয়াগ্‌নার? কীট্‌স্? শেলি? স্যার টমাস ব্রাউন? কিন্তু মানে যাই হোক, ব্যাপারটা ভারি আকর্ষণীয়।

তাই পরদিন সন্ধ্যায় আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি মাথায় করেও মিঃ বন্স আগাথকস্ লজএ হাজির হতে ভুললেন না।

ছেলেটি তৈরি হয়েই ছিলো। উত্তেজনায় অধীর হয়ে সারা পথ সে এমন লাফাতে শুরু করলো যে সাহিত্য-সভার সভাপতি মশায় একটু বিরক্তই হলেন। বাকিংহাম পার্ক রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে তারা পিছন ফিরে তাকালো একবার। না, কেউ তাদের লক্ষ্য করছে না। তারপরই তারা গলিতে নামলো। স্বভাবতই (কারণ সূর্য তখন অস্তগামী) এক দৌড়ে তারা একেবারে বাসের সামনে এসে হাজির হলো।

মিঃ বন্স চিৎকার করে উঠলেন, হে ঈশ্বর! হে পরম দয়ালু ঈশ্বর!

যে বাসে ছেলেটি প্রথম দিন চড়েছিলো বা ফিরে এসেছিলো,

এটা কিন্তু সে বাস নয়। এ বাসের তিনটি ঘোড়া—কালো, ধূসর আর সাদা। তার মধ্যে ধূসর ঘোড়াটিই সবচেয়ে ভালো। ঈশ্বরের নাম শুনে বাসের চালকটি মুখ ফেরালো। তার পাণ্ডুর মুখে বীভৎস ছুটি চোয়াল আর গর্তে বসা একজোড়া চোখ। তাকে দেখেই মিঃ বন্স আঁৎকে উঠলেন.। যেন চেনেন তাকে। তারপরই তিনি ভীষণ ভাবে কাঁপতে লাগলেন।

ছেলেটি এক লাফে বাসে চড়ে বসলো।

মিঃ বন্স চেঁচিয়ে উঠলেন, এও কি সম্ভব? অসম্ভব কি কখনো সম্ভব হয়?

আপনিও ভিতরে আসুন, মিঃ বন্স। দেখুন, কী সুন্দর বাস এখানা। আরে, এই যে এঁর নামও রয়েছে লেখা—ড্যান, কী যেন।

মিঃ বন্সও লাফিয়ে বাসে উঠলেন। একটা দমকা হাওয়ায় তৎক্ষণাৎ বাসের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। সেই ধাক্কায় আল্‌তো ভাবে বসানো বাসের জানলার শার্শিগুলো সব পড়ে গেলো।

ড্যান······কোথায় লেখা আছে আমাকে দেখাও। হায় ভগবান! আমরা যে চলতে শুরু করেছি!

হুর্‌রে! ছেলেটি বলে উঠলো।

মিঃ বন্স ভারি বিব্রত হয়ে পড়লেন। এমন ভাবে কেউ তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে এটা তিনি চান নি। অথচ তিনি দরজার হাতলও খুঁজে পাচ্ছেন না, শার্শিগুলোও তুলে ধরতে পারছেন না। বাসখানা সম্পূর্ণ অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরে তিনি যখন একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেন, তখন বাইরেও নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার। তীব্র বেগে গাড়ি ছুটে চলেছে।

গাড়ির ভিতরটা ভালো করে দেখতে দেখতে তিনি বললেন, একটি আশ্চর্য, স্মরণীয় অভিযান।···········

এদিকে ছেলেটি সেই কদাকার ড্রাইভারকে ডেকে ছুটো

টিকিট চাইলো। বিনা বাক্যব্যয়ে সে দুখানি টিকিট বাড়িয়ে দিলো। মিঃ বন্স হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আবার কাঁপতে লাগলেন। ছোট জানলাটা বন্ধ হবার পর তিনি ফিসফিস করে বললেন, জানো এ লোকটি কে! ইনি হচ্ছেন অসম্ভব।

দেখুন, আমি একে স্যার টমাস ব্রাউনের মত পছন্দ করি না। যদিও এঁর মধ্যে আরো কিছু বেশি থাকলেও আমি বিস্মিত হবো না।

আরো কিছু বেশি? তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন। ঘটনা-চক্রে তুমি এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছো, এবং এ কথা তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারো যে এই লোকটির মধ্যে আরো কিছু আছে। আচ্ছা, লাল পদ্মের ছাপ-মারা চামড়া-কাগজের যে বইগুলো আমার লাইব্রেরিতে আছে সেগুলোর কথা তোমার মনে পড়ে কি? এই—চুপ করে বোসো, একটা বিরাট সংবাদ তোমাকে দিচ্ছি—এই লোকটি সেই বইগুলোর লেখক।

ছেলেটি চুপ করে বসে রইলো। একটু পরে সে শুধোলো, মিসেস গ্যাম্পকে কি আমরা দেখতে পাবো?

মিসেস—?

মিসেস গ্যাম্প আর মিসেস হ্যারিস? মিসেস হ্যারিসকে আমার খুব ভালো লাগে। হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। মিসেস গ্যাম্পএর টুপির বাক্সগুলো ইন্দ্রধনুর উপর দিয়ে বিশ্রী ভাবে উড়ে যাচ্ছিলো। তাঁর খাটের উপর থেকে দুটো আপেল টুপ করে নিচের জলে পড়ে গেছলো।

মিঃ বন্স গর্জে উঠলেন, আমার চামড়া-কাগজের বইগুলোর লেখক বাইরে বসে আছেন, আর তুমি আমার কাছে ডিকেন্স আর মিসেস গ্যাম্পএর গল্প করছো?

ছেলেটি ত্রুটি স্বীকার করে বললো, মিসেস গ্যাম্পকে আমি

এত ভালো করে চিনি যে তাঁকে দেখে খুশি না হয়ে পারি নি। গলার স্বর শুনেই তাঁকে আমি চিনেছিলাম। মিসেস হ্যারিসকে তিনি মিসেস প্রিগের কথা বলছিলেন।

তাঁর মহৎ সান্নিধ্যে কি তুমি সারাটা দিন কাটিয়েছিলে ?

না, না। আমি খুব ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। একজনের সঙ্গে দেখা হতে তিনি আমাকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে একটু এগোলেই সমুদ্রে কতো মাছের খেলা !

বটে ! লোকটির নাম তোমার মনে আছে ?

এ্যাকিলিস। না না, তিনি তো পরে। টম জোন্‌স্।

মিঃ বন্স একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ছ্যাখো বাবা, তুমি সব গুলিয়ে ফেলছো। তোমার মত সুযোগ যদি একটা শিক্ষিত লোক পেতো ! যে-কোনো শিক্ষিত লোক এঁদের সবাইকে চিনতো, কাকে কী বলা উচিত তা জানতো। সে কখনো মিসেস গ্যাম্প বা টম জোন্‌সের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতো না। হোমার, শেক্সপীয়র বা যিনি এখন বাস চালাচ্ছেন এঁদের স্পষ্ট চরিত্রগুলোকে নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকতো। সে কখনো ছুটোছুটি করে বেড়াতো না। সে জিজ্ঞেস করতো সব বাছা-বাছা প্রশ্ন।

কিন্তু মিঃ বন্স, ছেলেটি বিনীতভাবে বললো, আপনি তো একজন শিক্ষিত লোক। তাঁদের তো আমি তাই বলেছি।

ঠিকই বলেছো। আর আমরা সেখানে পৌঁছে গেলে দয়া করে যেন আমাকে লজ্জায় ফেলো না। কোনোরকম বাজে কথা নয়, ছুটোছুটি নয়। সব সময় আমার পাশে পাশে থাকবে, আর তাঁরা কিছু না জিজ্ঞেস করলে কখনো সেইসব অমর আত্মাদের সঙ্গে কথা বলবে না। ভালো কথা, ফিরতি টিকিট-গুলো আমাকে দিয়ে দাও। তুমি আবার হারিয়ে ফেলবে।

টিকিটদুটো দিয়ে দিলো ছেলেটি। কিন্তু একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলো।

যাই হোক, এখানে আসবার রাস্তা তো সে-ই বের করেছিলো। আগে-ভাগে তাকে অবিশ্বাস করে এখন তার উপর সর্দারি করার কোনো মানে হয় না।

এদিকে বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে। জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে বাসের ভিতরে।

ছেলেটি বলে উঠলো, বা রে, তাহলে ইন্দ্রধনু উঠবে কেমন করে?

মিঃ বন্স ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, তুমি বড় গোলমাল করছো। আমি এই রূপ ধ্যান করতে চাই। তোমার বদলে কোনো দরদী লোক যদি আমার সঙ্গী হতো তো বড়ই ভালো হতো।

ছেলেটি নিজের ঠোঁট কামড়ালো। মনে মনে সে অনেক কিছু স্থির করলো। সব সময় সে মিঃ বন্সএর অনুকরণ করবে। হাসবে না, দৌড়োবে না, গান করবে না, এমন কোনো বাজে কাজ করবে না যাতে হয়তো আগের বার তার নতুন বন্ধুরা বিরক্তি বোধ করেছিলো। এবার সে তাঁদের নামগুলো ঠিক ঠিক উচ্চারণ করবে, কার সঙ্গে কার পরিচয় আছে সেটা মনে রাখবে। এ্যাকিলিস তো আর টম জোন্‌স্‌কে চিনতেন না—অন্তত মিঃ বন্স তো তাই বলেন। মিসেস গ্যাম্পএর চেয়ে মাল্‌ফির ডাচেসএর বয়স বেশি—অন্তত মিঃ বন্স তো তাই বলেন। সে এবার সচেতন, সংযত আর ফিটফাট থাকবে। কাকে ভালো লাগে, কাকে ভালো লাগে না, এ কথা সে কিছুতেই বলবে না।

তবু, হঠাৎ তার মাথায় লেগে যেই জানলার শার্শি গেলো খুলে, অমনি তার সংকল্প গেলো বাতাসে উড়ে, কারণ বাসটা এসে পৌঁছেছে জ্যোৎস্নাধোয়া পাহাড়ের চূড়ায়, যেখানে রয়েছে সেই ফাটলটা, আর তার ওপাশে সেই সমস্ত নদীতে পা রেখে পাহাড়-শ্রেণী যেন স্বপ্ন দেখছে।

সে চিৎকার করে উঠলো, সেই পাহাড়! শুনুন ঐ জল থেকে ভেসে আসছে নতুন গান। গিরি-নালার ফাঁকে ফাঁকে ঐ দেখুন আগুনের শিখা!

দ্রুত কটাক্ষে একবার দেখে নিয়ে মিঃ বন্স বলে উঠলেন, জল? আগুন? তোমার মুণ্ডু! চুপ করো। কোথাও কিছু নেই!

অথচ তার নিজের চোখের সামনে গড়ে উঠেছে ইন্দ্রধনু, ঝড়ে আর সূর্যের আলোয় গড়া নয়, নদীর উৎসারিত ধারায় আর চাঁদের আলোয় গড়া তার অঙ্গ। সেই ইন্দ্রধনুর উপরে পা ফেললো তিনটি ঘোড়া। তার মনে হলো, এর চেয়ে সুন্দর ইন্দ্রধনু সে এর আগে কখনো দেখে নি। কিন্তু বলতে তার সাহস হলো না; মিঃ বন্স যে বললেন সেখানে কিছু নেই। মুখ বাড়িয়ে সে গেয়ে উঠলো সেই সুর, যা উঠে এসেছে ঘুমন্ত নদীর বুক থেকে।

মিঃ বন্সও জানলা দিয়ে তাকালেন। তারপরই অবাক কাণ্ড! একটা চাপা আর্তনাদ করে বাসের মেঝেয় গড়িয়ে পড়লেন। তাঁর সারা শরীর কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগলো। তিনি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন। সবুজ হয়ে গেলো তাঁর মুখ।

সেতুর উপরে উঠে কি আপনার মাথা ঘুরছে? ছেলেটি প্রশ্ন করলো।

মাথা ঘুরছে! ঢোক গিলে বললেন মিঃ বন্স, আমি ফিরে যেতে চাই—বাস-চালককে বলো!

চালক শুধু মাথা নাড়লো।

ছেলেটি বললো, আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। ওরা সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে। ডাকবো কি? আপনাকে দেখলে তারা খুশি হবে, কারণ তাদের আমি আগেই বলে রেখেছি।

মিঃ বন্স আর্তনাদ করে উঠলেন। তারা এগিয়ে চলেছে চাঁদের আলোর ইন্দ্রধনুর উপর দিয়ে, আর তাদের চাকার পিছনে পিছনে

ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে সেই ইন্দ্রধনু। চারদিকে নিস্তব্ধ রাত। না জানি দরজায় কে আছে পাহারা!

আমি আসছি, সব সংকল্প ভুলে গিয়ে ছেলেটি চিৎকার করে বলে উঠলো, আমি ফিরে আসছি—আমি, সেই ছেলেটি!

ছেলেটি ফিরে আসছে, একটি কণ্ঠস্বর যেন আর-একটি কণ্ঠস্বরকে বললো। সেও আবার বললো, ছেলেটি ফিরে আসছে।

মিঃ বন্সকে সঙ্গে নিয়ে আমি আসছি।

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

সে বললো, আমার বোধহয় বলা উচিত ছিলো, মিঃ বন্স আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন।

গভীরতর নিস্তব্ধতা।

পাহারায় কে আছেন?

এ্যাকিলিস।

ইন্দ্রধনু-সেতুর সঙ্গে লাগানো পাহাড়ি পথের উপর আশ্চর্য একটি ঢাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবক।

মিঃ বন্স, ইনি সশস্ত্র এ্যাকিলিস।

আমি ফিরে যেতে চাই, বললেন মিঃ বন্স।

ইন্দ্রধনুর শেষ অংশটুকুও গুঁড়ো হয়ে গেলো। পাথরের বুকে ঘর্ঘর শব্দ উঠলো চাকার, খুলে গেলো বাসের দরজা। ছেলেটি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, সেই মহাবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য দিলো এক লাফ। এ্যাকিলিসও হঠাৎ একটু নিচু হয়ে তাকে ঢালের উপরে লুফে নিলো।

এ্যাকিলিস্! সে চেঁচিয়ে বললো, আমাকে নেমে যেতে দিন। আমি অজ্ঞ, অসভ্য; যে মিঃ বন্সএর কথা কাল আপনাকে বলেছিলাম তাঁর নেমে আসা পর্যন্ত যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু এ্যাকিলিস তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলো। সে নিচু হয়ে

রইলো সেই আশ্চর্য ঢালের উপর। তাতে আঁকা রয়েছে কতো বীরের আর অগ্নিদগ্ধ নগরের ছবি, কত দ্রাক্ষাক্ষেত্র খোদাই করা রয়েছে সোনালি রেখায়, কত কামনা, কত আনন্দ, অনন্ত নদী দিয়ে ঘেরা যে পাহাড়টা সে আবিষ্কার করেছে তার সম্পূর্ণ ছবিটি পর্যন্ত তাতে আঁকা। সে বলে উঠলো, না না, আমি এর উপযুক্ত নই। এখানে আসা উচিত মিঃ বন্সএর।

কিন্তু মিঃ বন্স তখন নাকি সুরে কাঁদছেন। এ্যাকিলিস চেঁচিয়ে বলে উঠলো, আমার ঢালের উপর সোজা হয়ে দাঁড়াও।

স্যার, আমি এখানে দাঁড়াতে চাইনি। কে যেন আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। স্যার, আপনি কেন দেরি করছেন ? ইনিই তো মহান এ্যাকিলিস ; আপনি তো এঁকে চেনেন !

মিঃ বন্স কেঁদে বললেন, আমি কাউকে দেখছি না। কিছু দেখছি না। আমি ফিরে যেতে চাই। বাস-চালককে ডেকে বললেন, আমাকে বাঁচান ! আপনার রথে আমাকে থাকতে দিন। আমি তো আপনাকে সম্মান করেছি। আপনার লেখা আবৃত্তি করেছি। চামড়া-কাগজ দিয়ে আপনাকে বাঁধিয়ে রেখেছি। আমাকে নিয়ে চলুন আমার নিজের জগতে।

বাস-চালক জবাব দিলো, আমি পথ মাত্র, পথের শেষ নই। আমি খাদ্য, জীবন নই। নিজের পায়ে দাঁড়ান, যেমন ঐ ছেলেটি দাঁড়িয়েছে। আমি আপনাকে বাঁচাতে পারি না। কারণ কাব্য হচ্ছে আত্মা ; যারা তার পূজা করবে তারা আত্মার পথে, সত্যের পথেই পূজা করবে।

মিঃ বন্স আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না,বাস থেকে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে দেখা গেলো তাঁর মুখ, ভয়ংকর ভাবে হাঁ করে আছে। তারপর বের হলো দুই হাত—এক হাত ধরে আছে সিঁড়ি, অন্য হাত শূন্যে যেন আশ্রয়

খুঁজছে। বেরিয়ে এলো গলা, বুক, পেট। তিনি চিৎকার করে উঠলেন—আমি লণ্ডন দেখতে পাচ্ছি! পরমুহূর্তেই পড়ে গেলেন—পড়লেন জ্যোৎস্না-ধোয়া শক্ত পাথরের উপর। এমন ভাবে পড়লেন, যেন পড়েছেন জলের উপর, তার ভিতর দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছেলেটি আর তাঁকে দেখতে পেলো না।

মিঃ বন্স, আপনি কোথায় গেলেন? আপনার সম্মানে গান গাইতে গাইতে মশাল নিয়ে একটি শোভাযাত্রা আসছে যে! ঐ তো আসছেন সেইসব নরনারীরা যাদের নাম আপনি জানেন। জেগে উঠেছে পাহাড়, জেগেছে নদী, ঘোড়-দৌড়ের মাঠের ওপারে সমুদ্রে জেগেছে মাছেরা। এ সবই তো আপনার জন্যে—

তার কপালে লাগলো নতুন পাতার স্পর্শ। কে যেন তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলো।

ΤΕΛΟΣ

* * *

কিংস্টন গেজেট, সার্বিটন টাইম্‌স্ এবং রেনস্ পার্ক অবজার্ভার থেকে উদ্ধৃত :

মিঃ সেপ্টিমাস্ বন্সএর ভয়াবহভাবে বিকৃত মৃতদেহটি বার্মণ্ডসি গ্যাস ওয়ার্কসের কাছে পাওয়া গিয়াছে। মৃতের পকেটে একটি টাকার থলি, একটি রুপার সিগার-কেস, একখানি অভিধান ও দুখানি বাসের টিকিট ছিল। মনে হয়, বেচারাকে খুব উঁচু জায়গা হইতে ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে কোনো দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে এবং কর্তৃপক্ষ ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা করিতেছেন।

অনুবাদ—মণীন্দ্র দত্ত

মর্মান্তিক

এ্যাণ্টন চেখভ

শীতের সন্ধ্যা। ভীষণ বরফ পড়ছে। বরফে একেবারে চারদিক ছেয়ে গেছে। রাস্তার সন্থ-জ্বালা আলোর সার, ঘরের ছাদ, ঘোড়ার পিঠ, গলা, লোমওয়ালা চামড়ার টুপি—সব কিছুতে বরফ। গাড়োয়ান জোনাহ্ পোটাপভের সারা গা বরফে এমনি সাদা হয়ে গেছে যে, দেখাচ্ছে তাকে একটা ভূতের মতো। তার 'স্লে'-গাড়ির উপর হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে বসে আছে সে, —একটুও নড়ছে না। আকাশের সমস্ত বরফ যদি একসঙ্গে তার গায়ে গড়িয়ে পড়তো তাহলেও বুঝি সে হাত দিয়ে গায়ের বরফ ঝেড়ে ফেলতো না।...তার ছোট্ট ঘোড়াটাও বরফে একেবারে সাদা হয়ে গেছে,—নড়বার লক্ষণ তারও নেই! চুপ করে পা না নেড়ে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, যে, খুব কাছে থেকে দেখলেও মনে হবে এ বুঝি এক পেনি দামের কাঠের খেলনা ঘোড়া। বোধহয় ঘোড়াটা আপন মনে কিছু ভাবছে। আশ্চর্য নয়! লাঙল থেকে খুলে ধূসর মাঠ থেকে ছিনিয়ে কেউ যদি তাকে এই চোখ-ধাঁধানো আলোর ঘূর্নি-কোলাহল-মুখর জনসমুদ্রের মাঝে ঠেলে দেয় তবে ভাববে সে, এ আর আশ্চর্য কী!...

জোনাহ্ আর তার ঘোড়া বহুক্ষণ এমনি নিশ্চল হয়ে আছে। দুপুরের খাওয়ার আগে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে,—এ পর্যন্ত একটি ভাড়া জোটে নি। এইবার কুয়াশা নামছে সহরে,—রাস্তার আলোগুলি যেন একটু খোলসা হতে শুরু করেছে, রাস্তায় লোক চলাচলও যেন একটু বেড়ে উঠেছে। কোলাহল বাড়ছে। হঠাৎ

জোনাহ্‌র কানে এলো,—এই গাড়োয়ান, ভাড়া যাবে? ভাইবর্গের দিকে যেতে হবে।

শুনে চমকে উঠলো জোনাহ্‌,—চোখের পাতার লোমগুলিও বরফে ছাওয়া,—তারই ভিতর দিয়ে সে কোনোরকমে দেখলে, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক সামরিক কর্মচারী, তার মাথায় ঢাকনাওয়ালা এক ওভারকোট।

অফিসারটি বললে,—ভাইবর্গের দিকে যাবো, বুঝলে?…একি, ঘুমুচ্ছো নাকি তুমি,—শুনতে পাও না?—ভাইবর্গের দিকে…

গাড়োয়ান একটিও কথা না বলে তার সম্মতি জানাতে শুধু ঘোড়ার লাগামটায় একটা ঝাঁকি দিলে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাঁধ আর ঘোড়ার পিঠ থেকে ডেলা-ডেলা বরফ সব এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো…অফিসারটি 'স্লে'র ভিতরে উঠে বসলেন। গাড়োয়ান ঠোঁটটা একবার চেটে নিলে,—তারপর রাজহাঁসের মতো গলা বাড়িয়ে একটু সিধে হয়ে বসলো। লম্বা চাবুকটা দিয়ে ছপাৎ করে একটা শব্দ করলে সে,—সেটা এখন প্রয়োজন বলে নয়,—পুরোনো অভ্যাস। ঘোড়াটাও গলা বাড়িয়ে লগির মতো পা-কয়টা বাঁকিয়ে চলতে শুরু করলে। ভাবটা যেন—যেখানে খুশি নিয়ে চলো!

—এই উল্লুক! গাড়ি চালাতে জানো না? কোথায় চালাচ্ছো? জোনাহ্‌ শুনলে জনতার ভিতর থেকে কে যেন তাকে উদ্দেশ করেই কথাগুলি বলে উঠলো,—তালকানা নাকি হে,—ডাইনে ঘেঁসে চালাও!

অফিসারটিও রুক্ষ মেজাজে বলে উঠলেন,—গাড়ি চালাতে শেখোনি? ডাইনে ঘেঁসে চালাও!

একজন কোচম্যান গালাগাল করে উঠলো,—কে একজন দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে ঘোড়ার মুখে ধাক্কা খেয়ে কটমট করে

চেয়ে নিজের আস্তিন থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলো। জোনাহ্ তার জায়গায় বসে ছটফট করতে লাগলো—তপ্ত কয়লার মাঝে পড়েছে যেন সে! একবার কনুইটা এগিয়ে দেয়, একবার পাগলের মত এদিক-ওদিক তাকায়,—কী করতে হবে—কোথায় আছে সে—কেনই বা এখানে, কিছুই বুঝে ওঠে না।

অফিসারটি তার অবস্থা দেখে ঠাট্টা করে বলেন, লোকগুলো কী পাজি—না? ওরা যেন একেবারে ষড়যন্ত্র করে এসেছে—তোমার সঙ্গে ধাক্কা লাগাবে, তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের নিচে এসে পড়বে···

জোনাহ্ তার গাড়ির আরোহীর দিকে চায় একবার,—ঠোঁটদুটো তার নড়ে ওঠে···কি যেন একটু বলতে চায় সে, কিন্তু এক অদ্ভুত কর্কশ গর্ গর্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না তার গলা থেকে।

কী—ব্যাপার কী?—অফিসার জিজ্ঞাসা করেন।

গলাটা অতি কষ্টে একটু পরিষ্কার করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জোনাহ্ বলে,—এক হপ্তাও হয়নি,—স্যার, আমার ছেলেটা মারা গেছে।

আহা, কী হয়েছিলো?

জোনাহ্ তার সারা দেহটা আরোহীর দিকে এগিয়ে নিয়ে বলে,—ভগবান জানেন! হয়েছিলো বোধহয় জ্বরই,···তিনদিন হাসপাতালে ছিলো,—তারপর সব শেষ হয়ে গেলো,···সবই তাঁর ইচ্ছে।

সামনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কে যেন ধমকে ওঠে,—এই, কী করে চালাচ্ছো গাড়ি তুমি, দেখে চালাতে পারো না, কানা নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে আরোহীও তাড়া দিতে থাকেন,—এই, জোরে

হাঁকাও,—জোরে, এমনি করে চালালে কালও পৌঁছুতে পারবো না আমরা, জোরে—

গাড়োয়ান নিজের ঘাড়টা সিধে করে নিয়ে, অর্ধেক দাঁড়িয়ে, মুখখানা বিকৃত করে ঘোড়ার পিঠে সপাং করে লাগালো এক চাবুক। এরপর আরোহীর মুখের দিকে কয়েকবার তাকালো সে, —অফিসার চোখ বুজে পড়ে রয়েছেন, তার কথায় কান দেবার ইচ্ছে তাঁর নেই।...ভাইবর্গের দিকে ভাড়া নামিয়ে দিয়ে এক সরাইখানার বাইরে সে তার গাড়ি রাখলো, তারপর আবার জড়োসড়ো হয়ে চুপ করে বসে রইলো সে। উপর থেকে বরফ পড়ে আবার তার আর তার ঘোড়ার দেহ চুনকাম হতে লাগলো। একঘণ্টা কেটে গেলো,—তারপর দু-ঘণ্টা ··রাস্তা দিয়ে জুতোয় 'গ্যালোশ' পরে ছপ্ ছপ্ শব্দ করতে করতে তিনটি অল্পবয়স্ক লোক আসছে—তারই দিকে। তাদের দুজনের লম্বা ছিপছিপে চেহারা,— আর একজন কুঁজো।

খনখনে গলায় কুঁজো বললে,—এই গাড়োয়ান, ভাড়ায় যাবে, পুলিশ ব্রিজ—আমরা তিনজন,—কুড়ি কোপেক দেবো।

জোনাহ্ ঠোঁট চেটে ঘোড়ার লাগামটায় দিলে এক ঝাঁকি। মাত্র কুড়ি কোপেকে অবশ্য অতদূর যাওয়া যায় না, কিন্তু পয়সা-কড়ির কথা এখন তার মনেও আসছে না—এক রুবল কি পাঁচ কোপেক, সবই সমান এখন তার কাছে ; সে চায় শুধু যে-কোনো একটা ভাড়ায় খাটতে।...তরুণ তিনটি নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি আর গালাগালি করতে করতে গাড়িতে উঠলো, কিন্তু মুস্কিল হলো এখন, কোন্ দুজন বসবে,—আর কে দাঁড়াবে। গাড়িতে তিনজনের বসবার জায়গা নেই। অনেক তর্কাতর্কি আর গালাগালির পর ঠিক হলো, কুঁজোটাই দাঁড়াবে—কারণ সে বেঁটে। সেই সুবিধে। কুঁজো জোনাহ্র ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে

তার পিঠের উপর নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,—এই, ফুর্তিসে চালাও, আচ্ছা করে চাবুক লাগাও তোমার ঘোড়াকে…এ তো দেখছি আবার মাদি ঘোড়া!…বাপরে, কী টুপি পরেছো তুমি হে! সারা পিটার্সবার্গ সহরে এমন টুপি আর দ্বিতীয় মিলবে না!

কী রকম অদ্ভুত বিকট হাসির আওয়াজ করে জোনাহ্ বলে,—আমার এই ভালো।

নাও নাও, এখন জোরে হাঁকাও। সারা পথ তুমি এমনি করে চালাবে নাকি? ঠিকসে চালাও, নইলে এমনি রদ্দা লাগাবো…ঢ্যাঙা লোকদুটির একটি আবার এর মাঝে বলতে শুরু করেছে,—মাথাটা আমার একেবারে গেলো হে, কাল ডাকম্যাসভদের বাড়িতে টমি আর আমি চার বোতল কগ্‌নাক সাবাড় করেছি।

অপর ঢ্যাঙাটি অমনি বলে উঠলো, এমন যা-তা মিছে কথা বলিসনে সত্যি!

একেবারে খাঁটি সত্যি কথা বলছি, দিব্যি করতে পারি।

তোর দিব্যি রেখে দে!

একটা চাপা উদ্ভট হাসির শব্দ বেরুলো জোনাহ্‌র মুখ থেকে:

বেশ ফুর্তি করছেন আপনারা,—এঁ্যা!

চুপ রও!—কুঁজো হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—একটু জোরে চালাবে তুমি, না এমনিই চলবে? এমনি করে গাড়ি চালাও নাকি তুমি? —চাবুক লাগাও ঘোড়াকে, জোরসে চালাও—

কুঁজোর বাঁকা, বেঁটে দেহ এবং তার খনখনে গলার আওয়াজ জোনাহ্ এবার বেশ অনুভব করতে পারছে, ওর ধমকানিও সে বেশ শুনতে পাচ্ছে, চারিদিকের লোকজনও এখন তার বেশ চোখে পড়ছে। বুকের চাপা ভাবটা এখন যেন অনেকটা কেটে

কেটে যাচ্ছে। কুঁজো যা মুখে আসছে তাই বলে বকে যাচ্ছে আর গালাগালি করছে। অবশেষে ভীষণ রেগে কি-একটা বলতে গিয়ে সে কেসে ফেললে। ঢ্যাঙাদুটি তখন ভেরা পেট্রোভ্না নামে একটি মেয়েকে নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। জোনাহ্ অপেক্ষা করছিলো কখন ওরা একটু থামে। একবার ওরা একটু থামলে তখন এদিক-ওদিক একবার চেয়ে সে বলে উঠলো,—এই সপ্তাহে, বুঝলেন—আমার ছেলেটা……মারা গেল। কুঁজো কাসির পরে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, আমাদের সবারই ঐ দশা হবে একদিন!……চাবুক লাগাও ঘোড়াকে—করছো কী?……আর এমনি গাড়িতে চড়ছি না আমি কোনোদিন! কী ঢিলে, বাপরে!…কখন পৌঁছবো আমরা!

দে না বুড়োকে এক ঘা বসিয়ে, একটু চাঙা হয়ে উঠুক!

এই বুড়ো,—শুনছো! ঠিক চালাও, নইলে গাঁট্টা লাগাবো বলছি! ঘোড়াটাকে ঠিকমতো চালিয়ে তুমি বরং হেঁটে চলো। শুনছো আমার কথা—না কানেই ঢুকছে না?—হতভাগা!

—বলেই কুঁজো জোনাহ্‌র পিঠে লাগালো এক ঘুসি।

জোনাহ্ ঘুসিটা স্পর্শেন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করলে বেশি। অদ্ভুত কি রকম হাসির আওয়াজ করে সে আপন মনেই বলে উঠলো,—ফুর্তিরই সময় এদের,—ভগবান এদের সুখে রাখুন!

ঢ্যাঙা লোকদুটির একটি একটু নরম সুরেই জিজ্ঞেস করলে,—গাড়োয়ান, কে কে আছে তোমার? তোমার পরিবার আছে?

কী রকম একটা অদ্ভুত বিকট আওয়াজ করে জোনাহ্ বললে, আমার পরিবার? আমার পরিবার বন্ধু সবকিছুই এখন এই মাটি ……কবর……। আমার ছেলেটা ছিলো, সেও চলে গেলো। সে

চলে গেলো আর আমি বেঁচে থেকে জ্বলে মরছি।···কী অবিচার দেখুন মরণের—যে বুড়ো বাপকে নেবার কথা তার, তাকে সে নিলে না—নিয়ে গেলো ছেলেটাকে।

জোনাহ্ সবিস্তারে তার ছেলের মৃত্যুর কথা বর্ণনা করবার আয়োজন করছিল, কিন্তু কুঁজো তখনই একটি স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলো,—যাক বাঁচা গেলো, এইবার এসে গেছি আমরা! জোনাহ্‌র হাতে কুড়ি কোপেক তুলে দিয়ে অন্ধকার পথে তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো। জোনাহ্‌র বুকে আবার শোক উথলে উঠলো, কষ্টে তা সে চেপে রাখতে চেষ্টা করতে লাগলো। বেদনার্ত ব্যগ্র দুটি চোখে সে তাকিয়ে রইলো ব্যস্ত জনাকীর্ণ রাস্তার দিকে। ভাবতে লাগলো, এত লোকের মাঝ থেকে কেউ এসে কি তার দুঃখের কথা শুনবে না? কিন্তু জগতে কে কার কথা শোনে? তাদের ফুরসৎ কই—যে-যার নিজের কাজে ছুটে চলেছে। জোনাহ্‌র দুঃখের কথা শুনতে কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না। কী বিপুল শোক যে জমা হয়ে রয়েছে জোনাহ্‌র বুকে সে-কথা কেউ জানে না। তার বুকটা ফেটে শোক যদি জলধারার মত ছুটে বেরুতে পারতো তাহলে বুঝি সমস্ত জগৎ প্লাবিত হয়ে যেতো,—কিন্তু মনের ব্যথা তো দেখবার জিনিস নয়। এমন ছোট আধারে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে যে দিনের বেলায় আলো জ্বেলেও তা দেখবার উপায় নেই······

একটা সহিস আসছে তারই দিকে কিসের একটা বস্তা কাঁধে নিয়ে। জোনাহ্ তার সঙ্গে যা-হয় কিছু নিয়ে একটু কথাবার্তা বলতে চায়—

কটা বাজলো, ভাই,—বলতে পারো?

নটা বেজে গেছে। এখানে এসে গাড়ি থামিয়ে বসে আছো কেন, এগিয়ে যাও। জোনাহ্ কয়েক কদম এগিয়ে যায়, তারপর

আবার গাড়ি থামিয়ে ভাবতে বসে।...না, লোকের কাছে কোনো কিছু বলতে গিয়ে লাভ নেই। পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে থেকে অসহ্য বোধ হওয়ায় জোর করে নিজের মাথাটা একবার ঝাঁকি দিয়ে নিলে সে, যেন এমনি করেই মনের ব্যথাকে সে উড়িয়ে দিতে পারবে। তারপর ঘোড়ার লাগাম ধরে দিলে এক টান। মোট কথা এ অবস্থা আর সহ্য করতে পারছে না সে।

বাড়ি—বাড়িই যাওয়া যাক এবার—জোনাহ্ মনে মনে ভাবতে থাকে।

ঘোড়াটা তার প্রভুর মনের কথা বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে। ঘণ্টা-দেড়েক পরে জোনাহ্ বাড়ি এসে ময়লা বড় চুল্লিটার ধারে বসলো। চুল্লির উপরে, মেঝেয়, বেঞ্চিতে শুয়ে লোকগুলি সব নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে...তাদের দিকে চেয়ে মাথা চুলকে সে ভাবতে লাগলো—বড্ড সকাল-সকাল এসে গেছি!

ঘোড়ার আর আমার খাবারের পয়সা পর্যন্ত কামাই করতে পারি নি, তাই বুঝি এত খারাপ লাগছে আমার। নিজের কাজ ঠিক ঠিক করতে পারলে...নিজের আর ঘোড়ার খোরাকির জোগাড় করতে পারলে—তবেই তো শান্তি!

ঘরে এক কোনে এক অল্পবয়সী গাড়োয়ান ঘুম থেকে উঠে বসে হাই তুলতে তুলতে জলের কুঁজোর দিকে হাত বাড়াচ্ছে দেখে জোনাহ্ বলে উঠলো—কী, জলতেষ্টা পেয়েছে?

তাই তো মনে হচ্ছে।

ঠিকই তো,—খাও, জল খেয়ে নাও।......তারপর, আমার কথা জানো তো?—আমার ছেলেটা মারা গেছে।—শুনেছো?......এই হপ্তায়ই—হাসপাতালে মারা গেল।

কী আর করা যায়,—বলো।

জোনাহ্ তবু একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে—তার কথা

শুনে তার মনে একটু সমবেদনা জাগলো কি না!—না, কিচ্ছু না, —ও দিব্বি কম্বল মুড়ি দিয়ে এর মধ্যেই নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে মাথা চুলকোতে থাকে।... তৃষ্ণার্ত হয়ে এই ছোকরাটি যেমন করে জল খেতে চেয়েছিলো—তেমনি সে কথা বলতে চায়। প্রায় এক হপ্তা হতে চললো তার ছেলেটি মারা গেছে—এর মধ্যে একটি লোকের কাছেও সে ঠিকমতো মনের দুঃখ খুলে বলতে পারলো না। একটু প্রাণ খুলে —সব কথা খুঁটিয়ে বলতে চায় সে,—আর কি! সে বলবে—তার ছেলে কী করে অসুখে পড়লো,—কত কষ্ট পেলো,—মরবার আগে কী সব কথা বলেছে সে,—কী করে মরেছে সে...তারপর তার সৎকারের কথা,—হাসপাতাল থেকে তার জিনিসপত্র আনা।...অনিস্যা বলে তার একটা মেয়ে,—পাড়াগাঁয়ে পড়ে রয়েছে সে—তার কথা।...এমনিধারা কত কথাই যে তার বলতে ইচ্ছে করে! শ্রোতা শুনে একটু আহা-উহু করবে—তার দুঃখে একটু সমবেদনা প্রকাশ করবে,—আর কী!...জোনাহ্ ভাবে —মেয়েদের কাছে বলতে পারলেই সবচেয়ে ভালো। ওদের বুদ্ধি একটু কম বটে,—কিন্তু দুঃখের দুটি কথা শুনলেই ওদের চোখে জল এসে যায়।

যাই ঘোড়াটাকে একবার দেখে আসি গিয়ে—জোনাহ্ ভাবে, —ঘুম তো রয়েছেই, এখন আর কী—যত ইচ্ছে ঘুমোও।

জামাটা গায়ে চড়িয়ে জোনাহ্ আস্তাবলে তার ঘোড়াটার কাছে যায়। মনে আসে তার জই, খড়—আর আবহাওয়ার কথা ...ছেলের কথা। একা-একা যখন থাকে, ছেলের চিন্তা সে আর সহ্য করতে পারে না।...কারো সঙ্গে তার সম্বন্ধে কিছু কথা বলা, —তা বরং... কিন্তু একা বসে তার চেহারাটা মনে করে তার কথা ভাবা একেবারে অসহ্য।

প্রভুকে কাছে আসতে দেখে ঘোড়ার চোখদুটি জ্বল-জ্বল করে ওঠে। জোনাহ্ তাকে আদরের সুরে বলে,—খড় চিবুচ্ছিস,—চিবো, চিবো……কী আর করবি বল,—জই জোটাতে যদি না পারি—খড়ই খেতে হবে তোকে।……আমি আর পারছি না,—হ্যাঁ রে, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমি—গাড়ি চালাতে আর পারছি না।…এ তো এখন আমার ছেলেরই করবার কথা,—সে-ই তো এখন গাড়ি চালাবে…আর কী সুন্দরই শিখেছিলো চালাতে সে গাড়ি! ……সে যদি আমায় ছেড়ে না যেতো, তাহলে……

বলতে গিয়ে জোনাহ্ একটু থামে,—তারপর আবার বলতে থাকে, কী যে হলো রে……কুজ্মা—আমার ছেলে কুজ্মা—সে আমায় ছেড়ে চলে গেলো—মরে গেলো সে, হ্যাঁ, মরে গেলো,—আর দেখতে পাবো না তাকে।…ধর্ তোর নিজের কথাই ধর্,—তুই তো মাদি,—ধর্ তুই মা হয়েছিস—একটা বাচ্ছা হয়েছে তোর—তারপর সে বড় হলো—তারপর একদিন কি করে তোর বাচ্চাটা গেলো মারা,—ব্যথা লাগে না তোর,—বল্?

ঘোড়াটা ঘাস চিবুতে চিবুতে যেন জোনাহ্র কথা কান পেতে শুনতে থাকে,—হঠাৎ তার একটা নিশ্বাস পড়ে প্রভুর হাতের উপর দীর্ঘনিশ্বাসের মতো।

জোনাহ্ উৎসাহ পেয়ে সমস্ত ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে শোনাতে থাকে……

অনুবাদ—তারাপদ রাহা

ইঁদুর-ধরা কল

জে. বি. এস. হলডেন

এক যে ছিলো…

রাজা কিন্তু নয়, শাক-সব্জিওলা। নাম তাঁর স্মিথ, লণ্ডন সহরের ক্ল্যাপহামে তাঁর মস্ত দোকান। চারটি তাঁর ছেলে। বড় ছেলের নাম জর্জ—তখনকার রাজারও ছিলো ঐ নাম। ছেলে বড় হলে দোকানের মালিক হবে, তাই তিনি তাকে এক নাম-করা উদ্ভিদবিদ্যা শেখাবার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। জর্জ কদিনের মধ্যেই একশো সাতান্ন রকমের বাঁধাকপি আর চুয়াল্লিশ রকমের লেটুসের বিষয়ে সব কিছু শিখে ফেললো। এবার তাকে পাঠানো হলো এক প্রাণীবিদ্যা শেখবার স্কুলে। এখানেও কদিনের মধ্যে সে শাক-সব্জিতে কতরকমের পোকা হয়, কী রকম করে তাদের নষ্ট করা হয়, এইসব শিখে ফেললো। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে গড়গড় করে বলতে পারতো—বাঁধাকপিতে সবসুদ্ধ সাতাত্তর রকমের পোকা হয়। ক্ষুদে-ক্ষুদে সবজে পোকাগুলোকে মারতে হলে বাঁধাকপির পাতার উপর সাবান-গোলা জল ছিটিয়ে দিতে হবে। গায়ে দাগকাটা যেগুলো তাদের জন্যে চাই তামাক পাতার জল। কিন্তু পাটকিলে রঙের মোটা-মোটা পোকাগুলো নিয়েই যত মুস্কিল। সাবান আর তামাক পাতার জলে ওদের কিছু হবে না। ওদের মারতে হলে নুন-গোলা জল দিতে হবে। এ-সব শিখেছিল বলেই জর্জ শাক-সব্জির বাজারে খুব নাম করে ফেললো। লণ্ডন সহরে কেউ বাঁধাকপি কিনতে হলে ওর দোকানে গিয়ে হাজির হতো। কেননা, পোকা নেই এমন কপি ওর দোকানে

ছাড়া আর কোথায় মিলবে? অন্য সবাই তো আর তার মতো পোকা মারবার উপায় জানতো না!

মিঃ স্মিথের অন্য তিনটি ছেলের কথা বলছি। মেজ ছেলের নাম জিম, নাম ছিল জেমস নিশ্চয়ই কিন্তু সবাই মুখে মুখে নামটাকে একটু ছোট করে নিয়েছে। সে স্কুলে ইংরিজি প্রবন্ধ লেখায় খুব নাম করে ফেললো, গোটাকয়েক ভারী ভারী সোনার মেডেলও পেলো। শুধু বইয়ের পোকা, ভালো ছেলে হয়েই সে রইলো না, সে ফুটবল খেলায়ও খুব নাম করলো। সে হলো স্কুলের টিমের ক্যাপ্টেন। তার উপর ছেলেদের মধ্যে তার আর-একটা ব্যাপারেও খুব খাতির জমে গেলো। দুষ্টুবুদ্ধিতে সে ছিলো ওস্তাদ: ছেলেদের তো নানা ফন্দিফিকির করে সে নাস্তানাবুদ করতোই, এমন কি বদরাগী মাষ্টারের দলকেও সে ছেড়ে কথা কইতো না। একদিনের একটা ব্যাপার বলি শোনো। অঙ্কের মাষ্টার তখনো ক্লাসে আসেন নি। তাঁর চক আর ডাস্টার রেখে গেছে বেয়ারা। জিম উঠে গিয়ে সেই চকের ভিতর এমন ভাবে একটা দেশলাইয়ের কাঠির বারুদটুকু পুরে রাখলো যে, চকখানা হাতে নিয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই। এখন, বাজারে তোমরা যে-সব দেশলাই দেখতে পাও, এ-দেশলাই কিন্তু সে রকমের নয়। সিনেমায় তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, জুতোয় ঘসে দেশলাই জ্বালাচ্ছে একটা লোক। ঠিক সেই রকমের একবাক্স দেশলাই জিম জোগাড় করেছিলো। এখন মাষ্টারমশাই এসেই বোর্ডে অঙ্ক কসাতে শুরু করলেন; দু-একটা অঙ্ক লিখেছেন, হঠাৎ এক কাণ্ড। ফস্ করে জ্বলে উঠলো আগুন, মাষ্টারমশাই চিৎকার করে উঠলেন! সে-ঘণ্টায় নিশ্চয়ই আর অঙ্ক কসানো হলো না। আর-একদিন জিম ফরাসি শেখার ক্লাসে ডেস্কের প্রত্যেকটা দোয়াতের কালির মধ্যে খানিকটা করে মেথিলেটেড স্পিরিট ঢেলে দিলো। সেদিন ব্যাকরণের

পরীক্ষা। ফরাসি ব্যাকরণ কিন্তু ইংরিজি ব্যাকরণ থেকে অনেক শক্ত। ছেলেদের বুক ভয়ে দুর-দুর করছিলো, যা শক্ত প্রশ্ন মাষ্টারমশাই দিয়েছেন! কিন্তু একি! কলমে যে কালি উঠছে না! মাষ্টারমশাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসে নিজে পরীক্ষা করে দেখলেন, তাই তো, দোয়াত-ভরতি কালি, অথচ নিবে এক-ফোঁটাও উঠছে না! তিনি দোকান থেকে বড় এক-বোতল কালি কিনিয়ে আনালেন, কিন্তু তখন আর পরীক্ষা নেবার সময় নেই : ঘণ্টা বেজে গেছে।

জিম এমনিধারা জ্বালাতন সবাইকেই করতো, কিন্তু তার ভেতরে উঁকি মারতো তার বিজ্ঞান-পড়া বুদ্ধি। মাষ্টার মশাইয়ের ডেস্কে মরা ইঁদুর রাখা বা তালার ভিতরে কিছু পুরে নষ্ট করে দেওয়া—এসব দুষ্টুবুদ্ধি তার কখনও দেখা দেয় নি।

এবার সেজ ছেলের কথা। তার নাম চার্লস। অঙ্কে আর ইতিহাসে বেশ ভালো। খেলা-ধুলোয়ও মন্দ নয়, স্কুলের ক্রিকেট টিমের সে একজন চাঁই। কিন্তু সবথেকে ভালো সে রসায়ন-বিদ্যায়। কী করে বিশ্রী গ্যাস তৈরি করা যায় সে জানতো, কিন্তু জিমের মতো লোক জ্বালাবার ইচ্ছে তার ছিলো না। আর মাষ্টারমশাইদের জ্বালাতন করলে তাঁরা তাকে যে রসায়নবিদ্যার ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে দেবেন না, একথাও ভালো করে তার জানা ছিলো। তাই সে দিব্বি শান্তশিষ্ট হয়ে লেখাপড়া করে যেতো।

ন-ছেলের নাম জ্যাক। পড়াশুনো বা খেলাধুলোয় কোনোটাতেই সে বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। বল সোজা করে মারতে সে কোনোদিনই পারে নি। একবার ক্রিকেটের মাঠে ফিল্ডিংএর সময় সে দিব্যি নাক ডাকাতে শুরু করেছিলো। তারপর টিম থেকে তাকে ছেঁটে দেওয়া হলো। সে কিন্তু তাতে খুশিই হলো। কী দরকার? ততক্ষণ সে বাড়ি এসে রেডিওর

সেট তৈরি করবে। এদিকে কিন্তু তার মাথাও খেলতো ভালো। তার দিদিমা মাটিলডা একেবারে থুত্থুরে বুড়ি। চোখে দেখতে তো পানই না, কানেও শুনতে পান না। জ্যাক অনেক চেষ্টা করে তাঁর জন্য একটা ইয়ার-ফোন তৈরি করে দিলো। তোমরা নিশ্চয়ই দু-একজন কালা ভদ্রলোকের কাছে ইয়ার-ফোন দেখেছো, কেউ কোনো কথা বললে তাঁরা যন্ত্রটা বার করে কানে লাগিয়ে শোনেন। বুড়ি দিদিমা তো আহ্লাদে আটখানা! তিনি নাকি মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পর এত আনন্দ আর বহুদিন পাননি। জ্যাক আরও নানা জিনিস তৈরি করে ফেললো। একবার সে এমন একটা যন্ত্র তৈরি করলো যাতে করে তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোর জন্য আর কোম্পানিকে পয়সা দিতে হবে না। জ্যাক যন্ত্রটা তৈরি করে চুপি-চুপি তারে লাগিয়ে দিলো। বাড়ির কেউ জানতেও পারলো না। এদিকে মাস চলে গেল, ইলেকট্রিক বিল্ আর আসেই না। স্মিথ সাহেব ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল হয়েছে। তিনি ইলেকট্রিক কোম্পানিকে চিঠি লিখলেন। কোম্পানি থেকে মিস্ত্রি এল, এল ইঞ্জিনীয়ার। তাঁরাও লাইন পরীক্ষা করলেন। লাইন ঠিকই আছে, আলো জ্বলছে, অথচ মিটারে কিছু ওঠেনি। কী ব্যাপার! ওরা চলে গেলে জ্যাক তার বাবাকে যন্ত্রের কথা বললো। বাবা রেগে বললেন, এ তো চুরি! কোম্পানির কাছ থেকে আমরা এক মাসের ইলেকট্রিক চুরি করেছি!

জ্যাক বললো, বা-রে, চুরি করবো কেন! আমরা লাইন থেকে ধার নিয়েছি ইলেকট্রিক, আবার লাইনকেই শোধ করেছি ধার। কোম্পানির এক পয়সারও ক্ষতি হয় নি।

বাবা কি সে-কথা শোনেন! তিনি যন্ত্রটা ভেঙে-চুরে ফেলে কোম্পানিকে পাঠিয়ে দিলেন টাকা। জ্যাক বেচারা আর কী করবে বলো?

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, স্মিথ সাহেবের এক মেয়েও ছিল। তার নাম লুসিলি। কিন্তু আমাদের গল্পে তার বিশেষ আনা-গোনা নেই বলে তার কথা এখন বললুম না।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো, আসল গল্প কখন শুরু হবে।

আসছে, এবার আসল গল্প শোনো।

সেবার লণ্ডনে ভয়ানক হুলুস্থুল ব্যাপার। ডকগুলোতে ইঁদুরের উৎপাত শুরু হয়েছে। সে আবার যে-সে ইঁদুর নয়, মস্ত বড়-বড় ইঁদুর, ছুরির মত ধারালো তাদের দাঁত। এদের পূর্বপুরুষ নাকি চীন দেশের হংকং বন্দর থেকে চা, আদা, সিল্ক আর চালের বস্তার সঙ্গে একদিন লণ্ডনের ডকে এসে হাজির হয়েছিলো। তখন সংখ্যায় কম ছিল বলেই চুপ করে কাটিয়েছে, কেউ টেরও পায়নি। কিন্তু এখন তারা দলে ভারী হয়ে ভীষণ উৎপাত শুরু করলো। তোমরা জানো বোধহয়, ইংলণ্ডে যা শস্য হয়, তা দিয়ে ইংলণ্ডের সব লোকের খাওয়া চলে না। তাই যব আসে ক্যানাডা থেকে, হল্যাণ্ড থেকে আসে পনীর, নিউজীল্যাণ্ড থেকে আসে ভেড়ার মাংস, আর্জেন্টিনা—আরো নানা জায়গা থেকে আরও কত কি আসে। কিন্তু এই ইঁদুরের পালের জ্বালায় এইসব খাবার আর ইংলণ্ডের লোক চোখে দেখতে পেতো না। ডকে এসে জাহাজ ভিড়তে-না-ভিড়তেই সব খেয়ে সাবাড় করে দিতো। তারপর তারা লেগে গেলো নিজেদের বাড়ি সাজাতে। পারস্য দেশের গালিচার টুকরো নিয়ে গিয়ে তারা গর্তগুলোর মেঝেয় পাতলো, চীনে সিল্কের টুকরো দিয়ে তৈরি করলো পাপোস। ভেবে ছাখো ইংলণ্ডের লোকের কী অবস্থা! খাবার তো গেলোই, সাজ-সজ্জার উপায়ও রইলো না।

এবার টনক নড়লো লণ্ডনের পোর্ট আপিসের বড়কর্তার। বিদেশ থেকে যে-সব মাল আসে, সেগুলো ঠিক ঠিকানায় না

পৌঁছোনো পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব থাকে এই বড়কর্তার উপর। তিনি তো এবার খেসারত দিতে দিতে পাগল হয়ে গেলেন। কোনো উপায় না দেখে তিনি ডেকে পাঠালেন লণ্ডন সহরের বিখ্যাত ইঁদুর-ধরিয়েদের। কিন্তু তারা এসে কল পেতে কয়েক-শো মাত্র ধরলো। ইঁদুরদের রাজা কল পাতবার কথা জানতে পেরে আগেই সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তোমরা বোধহয় হাসছো, ইঁদুরদের আবার রাজা, তাই নাকি? সত্যিই ওদের একজন রাজা ছিলেন; তিনি থাকতেন সবচেয়ে বড় এক গর্তে। ইঁদুররা তাঁকে বেশ আরামে রেখেছিলো। তিনি খেতেন সুইজারল্যাণ্ডের চকোলেট, ফ্রান্সের টার্কি আর আলজিয়ার্সের খেজুর। কিন্তু তাই বলে শুধু আরামে বসে-বসে খাওয়াই তাঁর কাজ ছিলো না। কেউ ফাঁদে ধরা পড়লে রাজা দূত পাঠিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিতেন। তাঁর এক বিরাট সৈন্যবাহিনীও ছিলো। তা, বিরাট বই কি! দশ হাজার তরুণ সাহসী ইঁদুর নিয়ে সে-দল তৈরি। এই সৈনিকরা কুকুর বা বেড়ালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভয় পেতো না। একটা কুকুর হয়তো দু-তিনটে ইঁদুর মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু হাজার হাজার ইঁদুর যদি তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে বেচারার কী দশা হয় তোমরা বুঝতেই পারছো। এই সৈন্যদল ছাড়াও তাঁর একদল ছিলো ইঞ্জিনীয়ার। তাদের দাঁতের ধার পরীক্ষা করে নেওয়া হতো। তারা ইঁদুর-ধরা কলের লোহার জাল কেটে বার করে আনতো বন্দীদের।

এক মাস হলো, ইঁদুর-ধরিয়েরা কল পাতে, কিন্তু ইঁদুর আর কলে ধরা পড়ে না। একদিন ডকের কর্তা চটে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তিনি তো আর জানতেন না যে ইঁদুরদের রাজা তাঁর প্রজাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি ভাবলেন, ওদের কলগুলো কোনো কাজের নয়। এদিকে এক মাসে ক্ষতির

পরিমাণ একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে। ইঁদুররা এই একমাসে বেড়াল মেরেছে একশো একাশিটা আর কুকুর উনপঞ্চাশটা; আর আহত যে কতো করেছে তার ঠিক নেই। এখন কুকুরগুলো দেখা তো দূরের কথা, ইঁদুরের গন্ধ পেলেই পালায়। ডকের কর্তা এবার লোক পাঠালেন সহরের যত ওষুধের দোকানে, যত-রকম ইঁদুর মারবার বিষ এনে তারা হাজির করলো। বিষ মাখিয়ে ডকে ডকে খাবার ছড়িয়ে দেওয়া হলো। ইঁদুরের রাজা গুপ্তচরের মুখে খবর পেয়ে হুকুম দিলেন, তাঁর প্রজারা কেউ পিপে বা বাক্সের খাবার ছাড়া অন্য খাবার যেন না ছোঁয়। কয়েকটা লোভী ইঁদুর মারা পড়লো; যেমন রাজার হুকুম তারা মানে নি, শাস্তিও তারা পেলো।

বড়কর্তা এবার সভা ডাকলেন। সবাইকে তিনি বললেন, একটা উপায় যে-করেই হোক আমাদের বার করতে হবে। মেজকর্তা পরামর্শ দিলেন, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক। যে কথা, সেই কাজ। পরদিন লণ্ডন সহরের বড়-বড় যত কাগজ—যেমন: ডেইলি মেল, টাইমস, ডেইলি হেরাল্ড, ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড সব কাগজে প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন বেরুলো। সহরে সাড়া পড়ে গেলো। বিজ্ঞাপনে কী লেখা ছিলো জানো? ইঁদুরের হাত থেকে যে ডক বাঁচাতে পারবে তাকে এক লাখ পাউণ্ড মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে, আর কর্তা তার সঙ্গে দেবেন নিজের মেয়ের বিয়ে। বিজ্ঞাপনে বেরুলো এক লাখ পাউণ্ড মোহরের ছবি আর কর্তার মেয়ের ফোটো। স্মিথ সাহেবের বাড়িতে সবাই পড়লো এই বিজ্ঞাপন, শুধু দিদিমা বুড়ি ম্যাটিলডা শুনলেন জ্যাকের কাছ থেকে।

হাজার হাজার লোক চিঠি পাঠালো কর্তার কাছে। পোষ্টাফিস থেকে তিন জন নতুন পিয়ন রাখা হলো সেইসব চিঠি বিলি

করবার জন্য। ফোন আসতে লাগলো ঘন-ঘন, মনে হলো, এইবার বুঝি তারই গলে যায়! মাসের পর মাস ধরে কত লোক কত রকম চেষ্টা করলো। রাসায়নিক এলেন, জাদুকর এলেন, প্রাণীতত্ত্ববিদ এলেন, কিন্তু ইঁদুরের উৎপাত সমানই রয়ে গেলো। বরং তাদের জন্য লণ্ডনের ডক অকেজো হয়ে পড়লো। জাহাজ আর সেখানে ভেড়ে না। জাহাজ মাল নামাতে চলে যায় লিভারপুলে বা সাদাম্পটনে। ডকের এতে বেশ লোকসান হলো।

চার ভাই এতোদিন চুপটি করে ব্যাপারটা দেখছিলো। এবার তারাও ইঁদুর তাড়াবার ফন্দি-ফিকির বার করবার জন্য মাথা ঘামাতে শুরু করলো। জিম ভাবলো, এমন একটা কল সে তৈরি করবে, যেটাকে ইঁদুররা কল বলে চিনতে পারবে না। মাষ্টার-মশাইদের ফাঁকি দিয়েছে সে ইস্কুলে, আর এই ইঁদুরগুলোকে পারবে না! ডকে এখানে-ওখানে কতকগুলো পুরোনো টিন পড়ে ছিলো, তার একটা দিয়ে সে ইঁদুর-ধরা কল তৈরি করলো। একটা কৌটো, তার ভেতর থাকবে খাবার! ইঁদুর খাবারের গন্ধে টিনের ঢাকনির উপর উঠলে আর রক্ষে নেই। তাকে কৌটোর মধ্যে বন্দী হতেই হবে। সে বাবার কাছ থেকে দশ পাউণ্ড ধার করে নিয়ে কাজ শুরু করলো। কিন্তু একা তো আর অতোগুলো কল তৈরি করা যায় না! তাই বিল রবিনসন বলে একজন মিস্ত্রিকে সে মাইনে করে রাখলো। দেখতে-দেখতে একহাজার তিনশো চুরোনব্বুইটি কল তৈরি হলো, তার মধ্যে সতেরোটি অবশ্য খারাপ হয়েছিলো তাই কাজে লাগলো না।

এবার বাবার ঘোড়ার গাড়িখানা জুতে তাতে কলগুলো চাপিয়ে সে গেলো মেজকর্তার সঙ্গে দেখা করতে। মেজকর্তা বড় যে-সে লোক নন! তিনি একজন ডিউক, প্রকাণ্ড তাঁর

জমিদারি। তিনি কলগুলো দেখে বললেন, এই ক-টা কলে আর কত ইঁদুর ধরা পড়বে হে! যাক্‌গে, একটা তো ডকে পেতে দেখি, কী হয়! ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া ডকে কলগুলো পাতা হলো। এখানে জামাইকা ও তার আশেপাশের দ্বীপগুলো থেকে চিনি, রাম্‌, গুড় আর কলা বোঝাই হয়ে জাহাজ আসে। আমার মনে হয় ঐ ডকটা পছন্দ করে ওরা ভুল করলো। কেননা ওখানে ছিলো সেরা ইঁদুরের দল! পিপে থেকে গুড় বা মদ খেতে হলে বেশ চালাক-চতুর ইঁদুরের দরকার কি না ভেবে ছাখো।

যাক, কল তো পাতা হলো। পনীর আর মাংসের টোপ দেওয়া হলো তার সঙ্গে। প্রথম রাতে ধরা পড়লো নশো আঠারোটি ইঁদুর। জিম তো খুব খুশি। মোহরগুলো এবার সে পেলো বলে। কিন্তু দ্বিতীয় রাতে মোটে চারটি ধরা পড়লো, তৃতীয় রাতে দুটি। এবারও রাজা সবাইকে সাবধান করে দিলেন। চারদিনের দিন জিম বুদ্ধি করে ভিক্টোরিয়া ডকে নিয়ে গেলো কলগুলি। কিন্তু চারটির বেশি ইঁদুর ধরা পড়লো না। জিম আর কী করে? মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে এলো। সময় তো যথেষ্টই গেছে, তার উপরে বাবার কাছে তার দশ পাউণ্ড দেনা। ওদিকে বন্ধুরাও ঠাট্টা করে তার নাম রাখলো, 'টিনের ইঁদুর।'

চার্লসের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। সে অনেক খেটে-খুটে একটা বিষ তৈরি করলো, তার গন্ধ তো নেই-ই, আস্বাদও নেই। আমি তোমাদের কিন্তু বিষটার নাম, বা কী করে সেটা তৈরি হয় বলবো না। আমি বেশ জানি তোমরা কারো ক্ষতি করবে না, কিন্তু যদি কোনো খুনে এই গল্প পড়ে সেই বিষ দিয়ে মানুষ খুন করে, তখন কী হবে বলো তো? না-হয় না-ই শুনলে বিষের নাম। সে এবার বাবার কাছ থেকে কুড়ি পাউণ্ড ধার করে পনীর কিনে তাতে ভালো করে সেই বিষ মাখালো। তারপর পনীরের

এক-এক টুকরো ছোট ছোট রঙ-বেরঙের পিসবোর্ডের বাক্সে পুরে সবগুলো ডকের এখানে-ওখানে রেখে এলো। কী গন্ধ পনীরের! সমস্ত ডক-অঞ্চলের হাওয়া পনীরের গন্ধে ভারী হয়ে এলো। চার্লস ভাবলো, গন্ধে মানুষেরই জিভে জল ঝরে, ইঁদুর তো কোন্ ছার! আজ রাতে আর একটিকেও গর্তে ফিরে যেতে হবে না।

সূর্য ডুবলো, অন্ধকার হয়ে এলো, ইঁদুরেরা দলে দলে বেরিয়ে এলো গর্ত ছেড়ে। কী চমৎকার পনীরের গন্ধ! ভুর ভুর করছে! চারদিক খোঁজ পড়ে গেলো। সন্ধানও মিললো, বাক্সে বাক্সে সাজানো রয়েছে টুকরো-টুকরো পনীর! দেখতে-দেখতে বাক্সকে বাক্স সাবাড়। দু-একটা ধাড়ি ইঁদুর একটু সন্দেহ করেছিলো, কিন্তু কে তাদের কথা শোনে! এমনকি, রাজাকে পর্যন্ত কয়েক টুকরো দেওয়া হলো খেতে। রাজা তখন সবে বাদাম আর সামন মাছ দিয়ে তাঁর ভোজ সমাধা করেছেন, পেট একেবারে টৈটম্বুর, তাই পনীর তুলে রাখলেন, সকালে খাবেন। এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো বিষের কাজ। রাত তিনটের সময় ঢলে পড়লো দলে দলে ইঁদুর। রাজার কেমন সন্দেহ হলো। তিনি দূত পাঠিয়ে সবাইকে জানালেন, কেউ যেন পনীর আর না খায়।

এখন, একটা ছিলো খুনে ইঁদুর। তার নিজের বাচ্চাদের খেয়ে ফেলবার জন্য তার ফাঁসির হুকুম হয়েছিলো। রাজা তাকে খানিকটা পনীর খাইয়ে দিলেন। ইঁদুরটা মরে যেতেই আবার আর-এক দল দূত পাঠানো হলো। পরদিন ভোরে চার হাজার পাঁচশো চোদ্দটি মরা ইঁদুর পাওয়া গেলো। তাছাড়া, আরও কত যে গর্তে মরে রইলো তার ঠিক নেই। বড়কর্তা চার্লসকে ডেকে বললেন, তুমি টাকা নাও, যত খুশি পনীর কিনে এনে ছড়িয়ে দাও, ব্যাটারা অক্কা পাবে। চার্লস টাকা নিয়ে এবার বাজার থেকে কয়েক মণ পনীর কিনে আনলো। লণ্ডনের প্রতি ডক রঙ-

বেরঙের বাক্সে ভরে গেলো। কিন্তু দুদিন পরে দেখা গেলো, আট হাজার বাক্সের মধ্যে দুটি শুধু খোলা হয়েছে। এবারও ইঁদুরের রাজা চার্লসকে বোকা বনিয়ে দিলেন। বেচারা চার্লস আর কী করে? মনের দুঃখে সে বাড়ি ফিরে এলো। কদিন ধরে এত পনীর ঘাঁটাঘাঁটি করে চার্লসের গা থেকে পর্যন্ত পনীরের গন্ধ বেরুচ্ছিলো। কেউ আর তার কাছে ঐ বিদঘুটে গন্ধে যেতে পারে না। এমনকি, বাড়িতে কয়লা রাখবার ছোট ঘরটায় তাকে দিনের পর দিন কাটাতে হলো। পুরো এক মাস রইলো এই বোটকা গন্ধ। তারপর অনেক সাবান মাখার পর একদিন মিলিয়ে গেলো। চার্লস আবার শুরু করলো পড়াশুনো, স্কুলে যাওয়া।

জ্যাক ভাবলো, সেও একবার চেষ্টা দেখবে। অনেক মাথা ঘামিয়ে সে এক ফন্দি বার করলো ইঁদুর তাড়াবার। কিন্তু অনেক টাকার ব্যাপার। স্মিথ সাহেবের কাছে সে তিরিশ পাউণ্ড ধার করলো। কিন্তু তিরিশ পাউণ্ডে কী হবে? সে আমার কাছে এসে বললো, কয়েক পাউণ্ড ধার তো দিতেই হবে, তার উপর ওর রেডিও সেট বিক্রি করে টাকা জোগাড় করার ভারও দিলো আমার উপর। কী আর করি! ওর রেডিও-সেট বিক্রি করে টাকার বন্দোবস্ত করে দিলাম। টাকা নিয়ে ছেলেটা কী করলো, জানো? একরাশ উকো কিনে ফেললো। সচরাচর যে-সব উকো বাজারে ছাখো, সেগুলো নয়। খুব সরু লোহার তারের তৈরি উকো, ঝকঝক করছে, চোখের দৃষ্টি জোরালো না হলে মালুম হবে না। ঐ উকোগুলো নিয়ে সে গেলো একটি বিস্কুটের কারখানায়, উকোগুলো ভিতরে পুরে দিয়ে তাকে লাখে লাখে বিস্কুট তৈরি করে দিতে হবে। রুটিওয়ালা তো অবাক! এমন বিস্কুটের কথা সে জন্মেও শোনে নি! যা হোক, টাকা যখন পাবে, রুটিওয়ালা রাজি হলো। বিস্কুট তৈরি করে ডকে ডকে

ছড়িয়ে দেওয়া হল। ইঁদুররা প্রথমটা একখানাও ছুঁলো না, তারপর খেয়ে পরীক্ষা করে দেখলো, না, কিছু নেই। দেখতে-দেখতে আর একখানা বিস্কুটও ডকে পড়ে রইলো না। এদিকে জ্যাক সাতটা প্রকাণ্ড ইলেকট্রো-ম্যাগনেট জোগাড় করে রেখেছিলো। ইলেকট্রো-ম্যাগনেট কাকে বলে জানো? স্কুলে অনেক ছেলের কাছে এক-একটা ছুরি থাকে, যার ফলাটা লোহার ছুঁচের উপরে ছোঁয়ালে ওরই সঙ্গে ঝুলতে থাকবে। এর কারণ কী জানো? ঐ ছুরির ফলা চুম্বক দিয়ে তৈরি। লোহা টেনে নেওয়াই হচ্ছে চুম্বকের কাজ। চুম্বকের ইংরিজি নাম হচ্ছে ম্যাগনেট। ইলেকট্রো-ম্যাগনেট আর কিছুই নয়, কতকগুলো চুম্বকের তারের সঙ্গে ইলেকট্রিক তার এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয় যে, সুইচ টিপে দিলেই আশে-পাশে যত লোহার জিনিস আছে, সব ছুটে এসে সেই তারের সঙ্গে জুড়ে যাবে। জ্যাক এই ইলেকট্রো-ম্যাগনেটগুলো প্রতিটি ডকে এক-একটা খাদ করে তার ভেতর বসিয়ে দিলো। তারপর জুড়ে দিলো ডকের বিজলী বাতির লাইনের সঙ্গে। এবার সুইচ টিপলে যা-কিছু জিনিস ডকে আছে, সব এসে হুমড়ি খেয়ে ঐ খাদগুলোর মধ্যে পড়বে। কিন্তু এর জন্য চাই খুব জোরালো বিদ্যুৎ-শক্তি। কাছেই ছিলো টিউব রেলওয়ের বিজলী ঘর। জ্যাক সেখানকার ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলো। তিনি জোগাবেন বিদ্যুৎ।

ডকের যত লোহার জিনিসপত্তর ছিল সরিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু বে-মেরামতি জাহাজ নিয়ে হলো মুস্কিল। সেগুলো আবার ইস্পাত আর লোহার তৈরি। বড়কর্তার হুকুমে ওদের মোটা-মোটা কাছি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হলো, যাতে সহজে না খাদে গিয়ে পড়তে পারে। ডকের সবাই সেদিন ক্যানভাসের জুতো পায়ে দিয়ে এসেছিলো, লোহার একটু নাম-গন্ধ থাকলে কী বিপদ ঘটে

কে জানে! তবে মেজকর্তা কিন্তু তার সাবেক জুতো পরেই এলেন, তাঁর তো আর ভয় নেই! তিনি মস্ত ডিউক, তাঁর জুতোর পেরেকটি পর্যন্ত সোনা দিয়ে তৈরি।

ঢং ঢং করে বাজলো দেড়টা, টিউব রেলওয়ের ঘন্টি এবার থেমে গেছে। কণ্ডাক্টর আর ড্রাইভাররা চলেছে বাড়ি ফিরে। এবার রেলওয়ের ইঞ্জিনীয়ার বিজলী-ঘরে গিয়ে সুইচ টিপে দিলেন। ডক আর বিজলী-ঘরের মধ্যে আগেই একটা লাইন করা হয়েছিলো। সারা দিনরাত টিউব রেলওয়ে চালাতে যতখানি শক্তি লাগে, ততখানি শক্তিতে চালিয়ে দেওয়া হলো একটা ম্যাগনেট। দেখতে দেখতে-দু-চারটে মরচে-ধরা পেরেক, ভাঙা টিন উড়ে এসে পড়লো খাদে। তারপর এলো পালে পালে ইঁদুর, ওদের পেটের ভেতরে বিস্কুটের সঙ্গে লোহার উকো ঢুকে গেছে, চুম্বকের টানে না এসে জো কী বলো? এক মিনিটে খাদ ভরে গেলো। তারপর একে-একে প্রতি ডকের ম্যাগনেটগুলোতে বিদ্যুৎশক্তি চালিয়ে দেওয়া হলো। ইঁদুরেরা ভয়ে গর্তে গিয়ে লুকোলো, কিন্তু উপায় কী! পেটের ভিতরে রয়েছে লোহা, চুম্বকের টানে বেরিয়ে আসতে তো হবেই!

ইঁদুরদের রাজা সবে ডিনার শেষ করেছেন তখন। না, আজ আর তেমন জুতসই হয়নি খাওয়া। ডকে জাহাজই ভিড়ছে না, তো সুইজারল্যাণ্ডের চকোলেট আর হল্যাণ্ডের পনীর কোথায় মিলবে? তিনি আজ ডকে-পাওয়া বিস্কুট দিয়েই ভোজ সমাধা করেছেন। এমন সময় খবর এলো, বিপদ উপস্থিত। গর্ত থেকে প্রজারা বেরিয়ে গিয়ে খাদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে, আর উঠছে না। রাজা সত্যিই চিন্তায় পড়লেন। তাই তো, কী ব্যাপার! তাড়াতাড়ি দু-জন গুপ্তচর পাঠালেন। কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেলো, তারা আর ফেরেই না। কী করেন, শেষে

নিজেই বেরিয়ে পড়লেন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে। উপরে উঠে যেই তিনি পা বাড়িয়েছেন, অমনি কে যেন তাঁর শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো। এত চেষ্টা তিনি করলেন প্রাসাদে ফেরবার, তা আর হলো না।

ভোর হয়ে আসছে, এবার টিউব ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এলো। নদী থেকে আগেই পাম্প করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ভর্তি করে জল রাখা হয়েছিলো। সেই জল খাদগুলোর ভেতরে ছেড়ে দেওয়া হলো। দেখতে দেখতে জলে খাদগুলো ভর্তি হয়ে গেলো। ইঁদুররা ডুবে মরলো। পরদিন যখন মরা ইঁদুর তোলা হলো, ওজন হলো তাদের দেড়শো টন। তোমরা তো অঙ্ক জানো, কষে দেখো তো ক-মণ ক-সের হয়! কতো মারা গেলো? তা কী করে বলি? অত ইঁদুর একটা-একটা করে গুণে দেখা তো আর চারটিখানি কথা নয়!

দু-একটা ছোটোখাটো দুর্ঘটনাও যে না ঘটলো তা নয়। আলফ টিম্মিন্‌স নামে ছিলো এক পাহারাওলা। সে-রাতে ডকে তার পাহারা দেওয়ার পালা। সে বেচারা অতশত জানে না। সে তখন সেই লোহার নাল-দেওয়া পাহারাওলাদের ভারী বুট পরে এসেছে। ব্যস, আর পায় কে! টান, টান, চুম্বকের টান! একেবারে খাদের কাছে এসে সে কোনোরকমে বুটদুটো খুলে ফেললো। কিন্তু জুতো খুললে কী হবে? এদিকে দুটো ইঁদুর তার পায়ের বুড়ো আঙুলদুটো শক্ত করে কামড়ে ধরেছে। বেচারি ছাড়াবার কতো চেষ্টা করলো, কিন্তু জো কী বলো? ওধারে চুম্বকের শেষ টানে ইঁদুর-সুদ্ধু আঙুলদুটোই খাদের মধ্যে টুপ করে খসে পড়লো। আর-একটি পাহারাওলার কিন্তু ভাগ্য খুব ভালো। গতবারের যুদ্ধে তার মগজে কামানের গোলার একটুকরো লোহা ঢুকে গিয়েছিলো। কত বড়-বড় ডাক্তার চেষ্টা

করেও তা বার করতে পারেন নি। এবার চুম্বকের টানে সেই লোহার টুকরোটুকু সোডার বোতলের ঢাকনির মত ছিটকে পড়লো। এতদিনের মাথাধরা সারলো তার।

পরদিনও একশো টন ওজনের ইঁদুর মারা পড়লো। রাজাই মরে গেছেন, এখন আর কে তাদের সাবধান করে দেবেন? তার পরদিন পঞ্চাশ টন। বাকি যে-কটি ইঁদুর ছিলো, তারা ভীষণ ভয় পেয়ে ডক ছেড়ে পালিয়ে গেলো। কেউ-কেউ চাপলো বিদেশী জাহাজে, কেউ-বা ঢুকলো লণ্ডন সহরে। ডকে আর ইঁদুরের উপদ্রব রইলো না।

জ্যাক এক লাখ মোহর পুরস্কার তো পেলোই, আর সঙ্গে-সঙ্গে বড়কর্তার মেয়ের সঙ্গে খুব ধুমধামে তার বিয়ে হয়ে গেলো। অত টাকা পেয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে আরামে বসে থাকবার ছেলে সে নয়। লণ্ডনের রেডিও স্টেশনকে বলে ব্রি. বি. সি। সেখানে সে ইঞ্জিনীয়ারের চাকরি পেলো। এখন আর তাকে পায় কে! কত নতুন-নতুন যন্ত্র সে আবিষ্কার করছে তার লেখাজোখা নেই। তাই বলে তার ভাইদের সে ভোলেনি। জিম আর চার্লস দু-জনকেই সে সেই এক লাখ মোহর থেকে কিছু টাকা ভাগ দিলো। জিম তার টাকা দিয়ে কিনলো একটা জাদুদণ্ড। এখন সে একজন বিখ্যাত জাদুকর। চার্লস গেলো কলেজে পড়তে। সেখান থেকে বেরিয়ে সে এখন এক কলেজে কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছে। আমিও এক কলেজে পড়াই কিনা; আমার সঙ্গে তার খুব ভাব আছে। তার কাছেই জিম আর জ্যাকের খবর পাই। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে সবাই।

অনুবাদ—অশোক গুহ

উত্তরাধিকার

হাওয়ার্ড ফাস্ট

ঘুম ভাঙতেই ওর চোখাচোখি হয় জ্বলন্ত সূর্যের সঙ্গে। চোখ বুজে ফেলেও, সুপ্তির অন্ধকারের মধ্যে তৃপ্তির আস্বাদ খুঁজতে চেষ্টা করে আবার। কিন্তু সূর্যের জোরালো আলো চোখের পাতা-দুটোকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। বাধ্য হয়ে ও চোখ খোলে। প্রত্যেক দিনের মতই ওর ঘুম ভাঙে। ওর চারপাশে শুধু হাজারো শব্দের ঝড়। চারধারের এই শব্দের অরণ্যে, কীই বা ওর পরিচয়! একটা বৃহৎ পরিবারের নগণ্য একজন। ছ-ছটি কলহমুখর ঈর্ষাপরায়ণ প্রাণস্পন্দনের একটি স্পন্দন ও।

তেরো বছর বয়স। লম্বা, হাড়সর্বস্ব চেহারা, রোগাটে বোকা-বোকা মুখ। ওকে দেখতে আর যাই হোক, মুগ্ধ হবার মত নয় মোটেই। পরিবারের সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে জিমই বড়। ওর বোন জেনী ওর চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট, ভাই বেনের বয়স নয়, ভাই ক্যালের বয়স আট, ছোট বোন লিজির বয়স ছয় আর সবচেয়ে ছোট ভাই পিটার, বয়স তার মাত্র পনেরো মাস।

জিম জাগলো। চোখ মেলে তাকালো তার পৃথিবীতে। ওর পৃথিবীর পরিধি শুধু আঠারোটি গাড়ি দিয়ে ঘেরা এই জায়গাটুকু। এই ছোট জগতে ও মারামারি করছে—যাদের ও দু-চোখে দেখতে পারে না, ওর ভাইবোনদের সঙ্গে; খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, আবার জাগছে। এখানে বর্তমান, ভবিষ্যৎ কিছুই নেই। এখানে ও ভাবতে পারে না কোথা থেকে ওরা আসছে, কোন্ নিরুদ্দেশের সন্ধানেই বা ওদের যাত্রা। এটা কী সন, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার

ওর প্রয়োজন নেই। ওর জগৎ গাড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া এই পরিসরটকু।

ঘুম যখন ওর ভাঙলো নাকে লাগলো রান্নার গন্ধ, আর ডান হাতের কনুইয়ে চাপ অনুভব করলো বোন জেনীর পাঁজরাগুলোর। কনুই দিয়ে জিম ধাক্কা দিলে বোনকে। জেনী ঘুমের মাঝখানে কেঁপে উঠলো আক্ষেপে, তারপর আবার আঘাত পেয়ে কেঁদে উঠলো, এ্যাঁ, মারছো কেন?

জিম উঠে বসলো। রোদ-ঝলসানো মুখে ওর হাসি ফুটে উঠলো। ঠোঁটদুটো আনন্দে ফাঁক হয়ে গেছে ওর, আর ও শিস দিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে একটা চলতি সুর। জেনী রাগে ওকে একটা লাথি কসিয়ে দেয়। জিম জেনীকে শিস দিতে দিতে নামিয়ে দেয় মেঝের উপর। কিন্তু মা-র আসার সম্ভাবনা ও টের পেয়েছে, মা আসছেন। লম্বা-চওড়া চেহারা, তাঁর হাতে. কোলের ছেলেটি। কুঁজো হয়ে তিনি এগিয়ে আসছেন। কুঁজো হয়ে চলার অবশ্য একটা কারণ আছে। চলা দেখে জিমের সব মনে পড়ে গেলো। আঠারোটা গাড়ি দিয়ে ঘেরা এই পরিচিত জগৎটুকু যে রোজকার জগৎ নয়, তা জিমের মনে পড়ে যায়। দূরে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে গাড়িগুলো থেমে গেছে হঠাৎ। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আশ্রয় তৈরি করা হয়েছে বৃত্তের মাঝখানে। শত্রু আছে বাইরে কত রকমের; অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে। কত তীর তাদের বিরুদ্ধে উড়ছে হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে। জেনীকে জব্দ করার কৌশল ভাবতে ভাবতে জিমের মনে পড়ে যায় শত্রুদের কথা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ও আবার ভুলে যায় শত্রুদের কথা, শিস দিয়ে ওঠে আবার।

—মা, ও আমাকে মেরেছে! জেনীর অভিযোগে জিম নির্বিকার হয়ে শিস দিতে থাকে।

এই, শিস দেওয়া বন্ধ কর বলছি! মা ছোট ছেলেকে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলেন। এই সকালেই ক্লান্তিতে ওঁর মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

—ও আমাকে মেরেছে, জেনী আবার বলে।

—কী মিথ্যুক মেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে জিম বলে উঠলো স্বাভাবিক অভ্যাসে; কিন্তু ওর বোকাটে মুখ বিপরীতই সাক্ষ্য দেয়। জিম ভাবে, সবাই—সবাই তার বিপক্ষে। ও যদি জেনীকে না মারতো, জেনী কি তাকে বিরক্ত না করে ছাড়তো? অবশ্য পরিবারের বড় ছেলে বলে, মারধোর করাটা অন্যায় নাকি সকলের কাছে। কিন্তু ওরা, ওরা যে ওকে একদম দেখতে পারে না! তার লম্বা বিশ্রী চেহারা ওদের সম্ভ্রমের বদলে অবজ্ঞার উদ্রেক করে, ও কি তা জানে না? এই মুহূর্তে সকলকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয় জিমের। সবাই, সবাই শত্রু তার।

—খবর্দার জিম, কাউকে মিথ্যাবাদী বললে মেরে ফেলবো একেবারে! মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন। লম্বা-চেহারা মায়ের এই গর্তে দাঁড়িয়ে থাকা খুবই শক্ত। সারাদিন প্রখর রৌদ্রের মাঝখানে দীর্ঘ চেহারাটা কুঁকড়ে রাখা খুবই কষ্টকর।

জেনী আবার বিরক্ত করে, মা, দেখ ও আমাকে এইখানে মেরেছে।···পরিবারের অন্যান্যদেরও ঘুম ভেঙেছে ততক্ষণে। বেন যোগ দেয়, হ্যাঁ মা, আমিও দেখেছি। নির্বিকারভাবে জিম শিস দিয়ে যাচ্ছে তখনও।

—শিগগির শিস বন্ধ কর হতভাগা! মা জিমের গালে ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দেন। পা দিয়ে রাগে গায়ের ঢাকা সরিয়ে, নগ্ন পায়ে ও এগিয়ে চললো। বাঁচা গেলো, আজ আর ওকে কাপড়চোপড় ছাড়তে হবে না, গা-হাত-পা ধুতে হবে না।

আশ্রয়ে জল ফুরিয়ে আসছে। মায়ের চড়টা এখনও জ্বলছে বেনকে একদিন বুঝিয়ে দিতে হবে জিমের হাতের ওজনটা।

—মাথা নিচু কর হতভাগা! মা চিৎকার করে উঠলেন। জেনী হাসতে লাগলো।

অবাধ্য ছেলের মত ও সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মাটির গর্তের আশ্রয় ছাড়িয়ে ওর মাথাটা উঁচু হয়ে উঠেছে। গর্তের সীমানার স্তূপীকৃত আবর্জনা পেরিয়ে ও দেখতে পাচ্ছে সারি-সারি ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা গাড়িগুলো, চেন দিয়ে চাকাগুলো পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা; আর দেখতে পাচ্ছে গাড়িগুলোর চাকার তলায় বন্দুক নিয়ে অপেক্ষারত লোকদের।

—জিম, শিগগির মাথা নামা, মা চেঁচিয়ে উঠলেন আবার। জেনীর মুখ বিদ্রূপে ধারালো হয়ে উঠলো—কী লম্বা দেখেছ মা! নিজের ভালো নিজে না করে ও ছাড়বে না!

—জিম, শিগগির এখানে চলে আসবি! মা-র আদেশ। লজ্জায় কানের পাশছুটো ওর জ্বালা করতে শুরু করে দিয়েছে। আশ্রয়ের অন্যান্য পরিবারের লোকেরা জিমদের ধরনধারন দেখে, হয়ত ঘৃণা করছে ওদের।

—জিম!

ফিরে এলো জিম। নোংরা মাড়িয়ে। মাথা নুইয়ে ফিরে এলো। জেনী হাসলো মুখ বেঁকিয়ে। লিজি আনন্দে ভেংচি কাটলো।

—মাকে জ্বালিয়ে মারে, এমন ছেলে তোর মত তুটি আর দেখি নি! মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

—কেন, আমি কী করেছি?

জেনী ফোড়ন কাটে, বাবু জানে না! মা শোনো কী বলছে ও! ও কিছু জানে না!

—চুপ কর মুখপুড়ি, জিম চিৎকার করে উঠলো। আবার মা-র হাতের চড়ে গালটা জ্বালা করে উঠলো ওর। মা ওর হাতে একটা পাত্র গুঁজে দিলেন। যাও, দেখো জল আবার ফেলো না।

…হাতে পাত্র নিয়ে ও এগিয়ে চললো। মাথা উঁচু করে আগ্রহ-চঞ্চল চোখ দিয়ে দেখতে লাগলো সারিবদ্ধ বৃত্তাকার গাড়ি-গুলোকে আর ঘর্মাক্ত লোকগুলোকে, যারা রোদ-ঝলসানো মরুভূমির অপর পার থেকে শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধে বন্দুক উঁচিয়ে অপেক্ষা করে আছে। নিজেকে ওদের দলে বীরত্বের সম্মানে গর্বিত করে তোলার কল্পনায় ও মন দেয়। কিন্তু কানে তখনও মা-র আদেশ বাজছে।

—জিম, মাথা নিচু করে যা হতভাগা!

আশ্রয়ের মাঝামাঝি জায়গায় মাটিতে ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা আট পিপে জল রাখা হয়েছে। এই শেষ সম্বল। অন্যান্য পরিবারের ছেলেরা হাতে পাত্র নিয়ে বিব্রত মনে অপেক্ষা করছে। এই জল নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বিশ্রী লাগছে ওদের কাছে। বুঝতে তো পারছে ওরা সব, কেন তাদের মায়েরা নিজেরা না এসে তাদের পাঠিয়েছে। জল কমে যাচ্ছে, হয়ত পাওয়া যাবে না: এই আশংকার মুখে দাঁড়াতে মায়েরা ভয় পাচ্ছে বলেই তাদের এই কাজ করতে হচ্ছে।

মিস্টার জনসন আহত, একটা হাত গলার সঙ্গে ঝোলানো। লম্বা গোঁফ বিষণ্নের মত ঝুলে পড়েছে। উনিই সকলকে জল ভাগ করে দিচ্ছেন। ছোট মাপের পাত্র দিয়ে মেপে জল দিচ্ছেন। প্রত্যেক লোকের জন্য এক পাত্র করে জল বরাদ্দ সারা-দিনের মত। যদিও সামান্য পরিমাণ, তবু কৃপণের মত তাঁর সাবধানতার অন্ত নেই।

ছেলেরা চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওঁকে। ওঁকে প্রশ্নের পর

প্রশ্নে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছে। এখানকার গর্তটা বেশ গভীর, তাই সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ওরা ঠেলাঠেলি করছে।

—কী গো জ্যাক, শত্রুর আক্রমণ কবে হবে?

—ঘা-টা এখনও টনটন করছে নাকি?

টুকরো টুকরো প্রশ্নের আদান-প্রদানের মাঝে জনসন জল দিয়ে যাচ্ছেন সযত্নে, সাবধানে।

ওরা কথাবার্তায় মুখর হয়ে ওঠে। জনসন বিরক্ত হন, আঃ, কেন এত বকবক করছো।···জিমের পালা এলো। বললে, সাত জনের চাই। আশ্রয়ের কোনো পরিবারই এত বড় নয়; একসঙ্গে এত জল কেউই চাইতে পারে না। প্রচ্ছন্ন গর্ব অনুভব করে জিম। জনসন ওর হাতে ধরা পাত্রে নির্দিষ্ট জল ঢেলে দেন।

জিম বললে, আর একটু পাই না! জলটা বেশ ঠাণ্ডা। জনসন ওকে উৎসাহিত করেন না। রেগে যায় জিম, আঙুল দিয়ে গাড়ির তলার লোকগুলোকে দেখিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—ওরা, ওরা যে অত জল পায়?

—তুমি কি ওদের মতো হতে পারো?

—নিশ্চয়, কেন পারবো না!

জনসনের মুখে অবজ্ঞা এসে জমা হলো। জিমের কানের পাশদুটো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। পেছনে ফিরে ও ভারী পাত্রটা নিয়ে দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে চলতে শুরু করলো।

জনসন চেঁচিয়ে উঠলেন, দেখো যেন তোমার মা সব জলটুকু পান, সাবধান। ছেলেরা হাসাহাসি শুরু করে। জনসনের বিষণ্ণ গোঁফের আড়ালে অবজ্ঞা ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু জ্বলন্ত সূর্য, ধুলো, সঙ্কীর্ণ আশ্রয়ে আঠারোটা পরিবারের ঘেঁসাঘেঁসি—সব মিলিয়ে জিমকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। জেনী ছুটতে ছুটতে, নাচতে নাচতে সাবধান করতে লাগলো—জল যে পাত্রের কানা

বেয়ে উপছে পড়ছে! মা ধমক দিয়ে উঠলেন, জিম, দেখিস, সাবধান!

হঠাৎ কী যে হলো জিমের, ও পড়ে গেল, আর সমস্ত জলটা ওকে আর জেনীকে ভিজিয়ে দিয়ে ধূসর মাটিকে কর্দমাক্ত করে তুললে। উঠে পড়লো জিম, সারা মনটা ওর তিক্ততায় ভরে গেলো। ও বিরক্তি বোধ করলো, আশ্রয়ের প্রতিটি লোক ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। ও খালি পাত্রটা হাতে তুলে নিয়ে চোখ তুলেই দেখলো, মা এগিয়ে আসছেন।

কোনো কথা ও বলতে পারলো না। হাতে পাত্রটা নিয়ে ও অনুভব করতে লাগলো মায়ের উপস্থিতি।

মা বললেন অস্ফুটকণ্ঠে, সাত পাত্র জল!

আশ্রয়ের প্রত্যেকে তার দিয়ে চেয়ে আছে। তবু জিমের মনে হচ্ছে, সে যেন রৌদ্রদগ্ধ অসীম মরুভূমির মধ্যে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে, আর সর্বাঙ্গ তার পুড়ে যাচ্ছে যেন!

—হায় হায়, সারাদিনের জল! মা আবার বললেন।

—আমি আবার যাই। মিস্টার জনসনকে আবার বললে হয়তো……

জিম মায়ের মুখের দিকে চাইলো। আবেগে গলা আর বুক শুকিয়ে আসছে। কাঁদবার জন্য ছটফট করছে ও। কিন্তু কাঁদতে পারছে না। আস্তে আস্তে গভীর লজ্জায় সকলের দৃষ্টির সামনে দিয়ে ও এগিয়ে চললো জনসন যেখানে জল দিচ্ছেন সেখানে। যেখানে তিনটি লোককে কবর দেওয়া হয়েছে আর কবরের ওপর দেওয়া হয়েছে সাধারণ কাঠের ক্রস-চিহ্ন, যেখানে সাতটা লোক আহত হয়ে ধুঁকছে ক্যানভাসের ওপর পড়ে, সে-জায়গাগুলো পেরিয়ে জিম এগিয়ে চললো অন্যমনা হয়ে।

আশ্রয়ের নোংরা শেষ প্রান্তে ও পিঠে ঠেসান দিয়ে বসে

রইলো—হাঁটুহুটো মুড়ে, হাঁটুর ওপর হাত রেখে। মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে, ঘাড়ের কাছটা লাল হয়ে উঠেছে।

ওকে আমল না দিয়ে, আশ্রয়ের দৈনন্দিন জীবন অপ্রতিহত-গতিতে চলে যাচ্ছে। সূর্য মাথার ওপর উঠেছে। রান্না খাওয়া হয়ে গেলো সকলের। জল সঞ্চয় করা হলো, সকলের পান করাও হলো। কিন্তু সে রয়েছে পড়ে অনাদৃত হয়ে, কেউ তাকে চায় না, কেউ না। জিমের ঠোঁটহুটি শুকিয়ে ফেটে যাচ্ছে, গলাটা কে যেন চেপে ধরেছে। একটা কিছু হয়ে যাবার জন্য ও কামনা করে—হয় মুক্তি, না-হয় ধ্বংস। নিজের ওপর অভিমানে ও ফুলতে থাকে, আর ওর মনে জমা হতে থাকে সকলের ওপর হুরন্ত ঘৃণা।

মা আসছেন তার কাছে শরীরটা বেঁকিয়ে। হাতে তাঁর একটা পাত্র আর এক কাপ জল। পাত্রটিতে কতকগুলো বরবটির তরকারি। ওর পাশে এসে মা বাড়িয়ে ধরলেন ওগুল্নো।

—আমার তেষ্টা পায়নি।

—খেয়ে নাও! মা-র গলায় কোমলতার আভাস। হঠাৎ জিম অনেকক্ষণ পরে আবার শিস দিয়ে উঠলো।

মা মুখ তুললেন। এবারে বোধহয় চিরাচরিত ভৎ'সনা করবেন মা। কিন্তু কিছুই তিনি বললেন না, শুধু চেয়ে রইলেন একদৃষ্টিতে ছেলের দিকে—যেন জিমকে তিনি এই প্রথম দেখছেন। চোখে ওঁর অনাস্বাদিত তৃপ্তির আবেশ যেন!

মা ছেলের পাশে পাত্রহুটো নামিয়ে রেখে চলে যান। মায়ের চলার পথের দিকে চেয়ে জিম আবার শিস দিয়ে ওঠে।

মাথার ওপর সূর্যটা চলেছে সময়ের সংগে তাল মিলিয়ে। বরবটিগুলো শুকিয়ে গেছে, রঙিন আবরণগুলি ফেটে গেছে। কাপের জল ধুলোয় ভর্তি হয়ে উঠেছে। আশ্রয়ের সর্বত্র নিস্তব্ধতা। ছেলেরা আর মায়েরা অপেক্ষা করছে। গত হুদিন ধরে গাড়ির

পাঁচিল তৈরি করে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে ওদের। আকস্মিক এক আক্রমণে তাদের হারাতে হয়েছে তিনজনকে, সাতজন আহত হয়ে ধুঁকছে। হয় মুক্তি, না হয় মৃত্যু! তারই জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার বুঝি শেষ নেই।

বড় ক্ষিদে পেয়েছে জিমের, তার চেয়ে বেশি পেয়েছে তেষ্টা। বার বার পাশে-রাখা পাত্রটা আর জলের কাপটার দিকে ও তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে চায়। যতক্ষণ না ঠোঁটদুটো শুকিয়ে গেছে, ততক্ষণ ও শিস দিয়ে এসেছে। এখন ও বসে আছে অবসন্ন, অবশ হয়ে।

সূর্য মাথার ওপর থেকে পৃথিবীর অপর দিকে যাবার জন্য ঝুঁকে পড়েছে। ছায়াগুলো দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। রৌদ্রের তাপে অবসন্ন হয়ে আশ্রয়ের লোকেরা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। কখনো কখনো আহতেরা চিৎকার করছে যন্ত্রণায়. কখনো মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনেরা কান্নাকাটি করছে।

বেন গুঁড়ি মেরে একবার ওর কাছে এগিয়ে এলো। জিম দেখেও দেখলো না ওকে।

—জল নষ্ট করেছে, এঃ মা! বেন বললো মুখ বেঁকিয়ে।

জিম ঠোঁটদুটো ফাঁক করে শিস দিতে চেষ্টা করলো।

—সাত পাত্র জল! বেন আবার টিপ্পনি কাটে। ঘৃণায় গলা কঠিন হয়ে ওঠে জিমের. চেঁচিয়ে ওঠে ও, চুপ কর্ শয়তান! বেন ভেংচি কেটে গুঁড়ি মেরে পালিয়ে যায়। মাছিগুলো পাত্রের বরবটির ওপর ভনভন করছে।

পিঁপড়েরাও তাদের অংশ নিতে এসেছে। জিমের পেটটা যেন মোচড় দিচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায়।

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে, ও হাতে কাপটা নিয়ে, আশ্রয় ছেড়ে, গুঁড়ি মেরে বেঁধে-রাখা ঘোড়া

আর বলদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চললো। কিছু ঘুরে ছ-সাতটা গাড়ির শেষে দেখতে পেলো ওর বাবাকে।

এ বাবা যেন সে বাবা নয়! বাবাকে সে লাঙল চালাতে, কুড়ুল চালাতে, কাস্তে চালাতে দেখেছে; দেখেছে পরিশ্রমের পর গোগ্রাসে খেতে। বাবার কথা মনে করলেই তার মনে পড়ে যায় একজন মাঝারি গোছের লোকের কথা, চাষ করে বেড়াচ্ছে বা ঘোড়াকে সাজ পরাচ্ছে। অন্য ভাইবোনদের মতো বাবার ওপরও ছেলেবেলা থেকেই জিম বিরক্ত। বাবা যে তাঁর প্রথম সন্তান হিসেবে তাকে পেয়ে খুশি হন নি, সেই অভিজ্ঞতার জন্যই হয়ত জিম বাবাকে ভালো চোখে নিতে পারেনি কোনো-দিনই। বাবা কোনোদিন বেশি কথা কইতেন না, কিন্তু জিম প্রায়ই তাঁর ভারী হাতের দাগ শরীরে পেয়ে এসেছে।

কিন্তু আজ যেন তার বোধ হতে থাকে—সেদিনের বাবার সঙ্গে আজকের এই লোকটার কত তফাৎ! চাকার তলায় শুয়ে বন্দুক উঁচিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন তার বাবা, যাঁর জন্য সে যে কোনোদিন কিছু করবে ভাবতেও পারেনি। হাতে কাপ নিয়ে বাবাকে ও দেখতে লাগলো। জলের ঠাণ্ডা গন্ধটা নাকে এসে লাগছে। ও বাবাকে দেখতে লাগলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, ভাবতে লাগলো,—কেন, কিসের জন্য এই লোকটার সঙ্গে তার সম্বন্ধ, কেন তারাই বা পশ্চিমের পথে চলেছে, কেনই বা ভাইবোনদের ওপর তার অহেতুক বিরাগ।

সূর্য তখনও জ্বলছে, তবু বাবার চিন্তায় আত্মমগ্ন হওয়ায় ভুলে গেছে ও সূর্যের খর তাপ, ভুলে গেছে ক্ষুধাতৃষ্ণা, ভুলে গেছে দিনের পর দিন চিরপরিচিত পৃথিবীর ওপরে পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর বিদ্বেষ। এই লোকটার সঙ্গে একটা নিগূঢ় আত্মীয়তার স্বাদ যেন তার মনকে ঘিরে রয়েছে।

বাবাকে ও দেখতে লাগলো, দেখতে লাগলো বাবার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী। অন্যান্যেরা তবু মাঝে-মাঝে কথা কইছিলো, বাবা নিশ্চুপ। বাবার কাছে আরও এগিয়ে যাবার জন্য উসখুস করে ও, কিন্তু কিসে যেন ওকে বাধা দেয়। মা যখন খাবার দিয়ে গেলেন, তখনকার বিচিত্র মনোভাবের মতো একটা হতবুদ্ধি ভাব ওকে পেয়ে বসে। বাবার জন্য, হয়ত বা মা-রও জন্য। সহানুভূতিতে মনটা ভরে উঠলো তার তেরো বছরের জীবনে এই সর্বপ্রথম।

দেখলো জিম, সমুদ্রের বুক থেকে স্নানার্থীদের মতো ধুলোর ঝড় উড়িয়ে উঠে আসছে তারা যাদের জন্য এই দুর্দিন অপেক্ষা করে আছে ওরা। ভয় না পেয়ে ও হাতের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রাখলো। ঘোড়সওয়ারেরা আসছে চিৎকার করতে করতে আর আছড়ে পড়ছে গাড়িগুলোর ওপর। গাড়ির তলা থেকে বন্দুকগুলো গর্জে উঠছে।

হয়ত কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক মিনিট ধরে যুদ্ধ চললো—জিম জানে না কতক্ষণ, তবু মনে হয়, তার জীবন যেন এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ও দেখছিল বাবার ক্ষিপ্র ভঙ্গিমাগুলো। বাবা যখন বন্দুক ছুঁড়ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল সে-ই যেন ছুঁড়ছে বন্দুক। বাবার মতো তারও মনে পড়ে যায় আশ্রয়ে অপেক্ষারত, ভয়ে সারা হয়ে-যাওয়া মা আর ভাইবোনদের মুখগুলি। বন্দুকের গুলি বালি ছিটিয়ে দেয় ওর চোখে-মুখে, নিক্ষিপ্ত তীরগুলি ওর কনুইয়ের পাশ দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে কাঁপতে কাঁপতে উড়ে যায়।

হঠাৎ একটা তীর বাবার কাঁধ আর গলা ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। যন্ত্রণায় বাবার মুখ কুঁকড়ে উঠলো ; জিমের মনে হলো, যেন তারই গায়ে তীরটা এসে বিঁধেছে।

হাতে পাত্রটা নিয়ে ও এগিয়ে এলো। জলটা ধুলোয় ভর্তি আর বিবর্ণ হয়ে গেছে। পাত্রের তলায় বালি ভর্তি। ধুলোগুলো

জলের ওপর একটা আস্তরণ সৃষ্টি করেছে। বাবা দু-একবার ওলট-পালট খেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলেন। জিম এগিয়ে এলো, পা দিয়ে অনুভব করলো গরম বন্দুকটা—অনুভবশক্তি এই অবস্থায় এখনও লোপ পায়নি তার।

বাবা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে, কোনক্রমে বললেন, জিম, তুই—তুই এখানে এলি কী করে? জিম বেশ বুঝতে পারছে, বাবার সময় ফুরিয়ে আসছে। অনেক, অনেক কথা বলার বাকি আছে, তবু কথা বেশি বলতে পারে না জিম। অনেক কষ্টে শুধু বলে, তোমার জন্যে জল এনেছিলাম, বাবা।

—এখানে আসা তোমার ঠিক হয় নি। আশ্চর্য, কাঁদবার শক্তি পর্যন্ত নেই জিমের; এবং ও জানে জীবনে কখনও আর এ-সুযোগ পাবে না। শুধু বললো, আমি মনে করলাম, তোমার ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে।

—তেষ্টা! বাবা বললেন।

—একটু জল আছে বাবা, খাবে? জিম, আস্তে আস্তে কাপটা নামিয়ে রাখে। মনে পড়ে যাচ্ছে তার, আজ সকালে জল নষ্ট করার কথা। বাবার কাঁধে হাত দিয়ে ও তুলে ধরে। বাবার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে।

—লেগেছে বাবা?

—বোধহয় একটুখানি, জিম। বাবা মাথা ঘুরিয়ে গাড়িগুলোর দিকে তাকালেন। যুদ্ধ থেমে গেছে, অশ্বারোহীরা চলে গেছে; কয়েকটি বেওয়ারিশ ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, কয়েকটা মৃতদেহ ইতস্তত ছড়ানো। বাবা বললেন, বেশি লাগেনি জিম, একটুখানি।

—জল এনেছিলাম বাবা, তোমার জন্যে!

—আচ্ছা, দাও একটু জল।

—জিম বাবার দাড়িভর্তি মুখে কাপটা তুলে ধরে। বাবার

দাড়ির স্পর্শ পেয়ে একটা বিচিত্র অন্তরঙ্গতায় ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—বেশ সুন্দর স্বাদ, জিম।

—সবটা খেয়ে নাও বাবা, তুমি ভালো হয়ে উঠবে।

—জিম, ভয় পেয়ো না বাবা!

—না, বাবা।

—আর-একটু দাও জিম।

কিন্তু পাত্রটা শূন্য। জিম বাবার মুখের দিকে চাইলো, চাইলো কঠিন রেখাসঙ্কুল মুখখানির দিকে, দেখলো বিস্ফারিত চোখদুটিকে, যে চোখদুটি আর তাকে দেখতে পাবে না কোনোদিন। জিম আস্তে আস্তে বাবার ঠোঁটদুটি স্পর্শ করলো।

—জিম! ওরা ডেকে উঠলো। চোখ তুললো জিম। ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর কাছে। বিরক্তিতে মন ভরে উঠলো জিমের। কতক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে কে জানে। ভাল লাগেনা ওদের এই অযাচিত অবাঞ্ছিত উপস্থিতি।

—এসো জিম।

মাথা নাড়লো জিম,—না, সে যাবে না বাবার কাছ ছেড়ে।

—চলে এসো জিম, আবার ওরা বললো। ওকে ওরা তুলে ধরলো। ক্যাপ্টেন ব্র্যাডি ওর হাত ধরলেন। কাঁপতে-কাঁপতে ও এগিয়ে চললো।

আশ্রয়ের বাইরে মা পড়ে আছেন, চাদর দিয়ে ঢাকা। ওরা চাদরটা খুলে দেয় মুখ থেকে। কী সুন্দর প্রশান্তিময় মুখখানি; চোখদুটি বোজা, সমস্ত জটিল রেখা মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে। ও মনে করতে পারে না, ঠোঁটদুটি শাসনে কোনোদিন কঠিন হতো কি না; কিন্তু সেই ঠোঁটদুটি এখন কত কোমল! আস্তে-আস্তে মায়ের ঠোঁটদুটিতে ও হাত দেয়। কী ঠাণ্ডা! সারা শরীরের ওপর দিয়ে

একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায় যেন। মা মরে গেছে বলে দুঃখ নেই। কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা তার মাকে সহ্য করতে হয়েছে এই পরিবারের জন্যে, তাঁর ছেলেমেয়ের জন্যে।

জিম অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে, মা আমারই জন্যে আশ্রয়ের বাইরে এসেছিলো, আমারই জন্যে!

ক্যাপ্টেন ব্র্যাডি আশ্বাস দেন, এখন কেঁদে কী লাভ জিম, ছিঃ! জিম ভাবছে জেনী, বেন, ক্যাল, লিজি আর পিটারের কথা: ওরা যেন তার কত আপনার এখন! ও বললো, আমি কাঁদছি ওদের জন্যে ক্যাপ্টেন, ওদের জন্যে!

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। সুদূর প্রান্ত থেকে গরম হাওয়া বয়ে চলেছে। আশ্রয়ের সবাই তার দিকে চেয়ে আছে। মায়ের শান্ত মুখখানা দেখে জেনী কাঁদছে, বেনের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

—এখন কেঁদে লাভ নেই, জিম। মানুষের মতো জিনিসটা নাও। এই তো জীবন। এরকমটা যে ঘটতে পারে, আমরা তা ভাবিনি। আশ্রয় খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, তারই কথা ভাবছিলাম। কিন্তু যখন এরকম ঘটে গেলো, তখন তাকে মেনে নাও। যা হলো তাকে ভয় না পেয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াও; তা না হলে যে তুমি একেবারে ভেঙে পড়বে!

কিন্তু ক্যাপ্টেন, মা যে আমার জন্যেই আশ্রয়ের বাইরে এসেছিলো! আমাকে না খুঁজে পেয়ে, আমাকে দেখতে এসেই মা মরে গেলো! সকালে সারাদিনের জল নষ্ট করলাম, তবু আমার জন্যে এক কাপ জল কোথা থেকে জোগাড় করে আমাকে দিয়েছিলো মা! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জিম। বাবার কথা মনে পড়ে যায় ওর। ও বললো, বাবাকে সেই কাপের জল দিতে গেছলাম। ভাবতেও পারি নি, বাবার জন্যে কিছু অন্তত নিয়ে যাবো। জীবনে

যা করিনি, বাবাকে জল খাওয়াতে গেলাম : কিন্তু বাবাকে তৃপ্তি দিতে পারলাম না।

—জিম, ওঁরা মারা গেছেন শান্তিতে। এখন কোনো কিছুই ওঁদের শান্তি ভঙ্গ করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের থামলে চলবে না। খাবার আর জল আমাদের ফুরিয়ে এসেছে। সকাল হবার আগেই এই রাত্রে চলতে হবে আমাদের। চল্লিশ মাইল দূরে ফোর্ট স্মিথ ; হয়ত পৌঁছুতে পারবো, নয় তো না। তবু চলতে তো হবেই। এ বিষয়ে ভেবে ছাখো তাড়াতাড়ি। আমরা মনে করছি, তোমাদের ভাইবোনদের আলাদা আলাদা গাড়িতে ভাগাভাগি করে তুলে নেবো, ক্যাপ্টেন ব্র্যাডি বললেন।

—কেন, আমাদের তো গাড়ি আছে।

—কিন্তু জিম, রাস্তার এখনও অনেক বাকি।

—তা হোক।

—অবাধ্য, অবুঝ হয়ো না জিম।

—অবাধ্য আমি ঠিকই, ক্যাপ্টেন, কিন্তু দোহাই, আমাদের ছাড়াছাড়ি করাবেন না। আমাদের গাড়ি-ঘোড়া আছে, ঠিকই আমরা যেতে পারবো।

—তোমার বাচ্চা ভাইটাকে কে দেখবে ?

—জেনী ওকে দেখবে এখন।

—কী ছেলেমানুষ তুমি জিম, কোন কথা শুনবে না!

—মা আমাকে দেখবার জন্যে আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে গুলি খেয়েছে। না না ক্যাপ্টেন, আমাদের ছাড়াছাড়ি করিয়ে দেবেন না! বলুন, কথা দিন!

—আচ্ছা আচ্ছা, যাও ঘোড়ার সাজ ঠিক করে নাও।

রাত হয়েছে। অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। আঠারোটি গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে আশ্রয় ছেড়ে।

জিমদের গাড়ি ছ-নম্বরের গাড়ি। জিম চারটে ঘোড়ার লাগাম ধরে রয়েছে। রোদ-ঝলসানো কুৎসিত মুখখানা তার অন্ধকারে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ও ভাবছে ছোট-ছোট পাঁচটি ভয়ার্ত ঈর্ষাকাতর জীবন-স্পন্দনের কথা।

ঘোড়াগুলোকে চলবার নির্দেশ দিয়ে ও বসে থাকে। মন থেকে সব দুঃখ সব ভয় মুছে গেছে, মুছে গেছে অজানা ভবিষ্যতের আশঙ্কা। মনে হচ্ছে খালি তার পাঁচটি আত্মার আত্মীয়দের কথা, তার রক্ত-মাংসের সাথী! ঠোঁটদুটো ফাঁক করে জিম আনন্দে আবার সেই চলতি সুর শিস দিয়ে ওঠে অন্ধকারের মধ্যে।

আঠারোটা গাড়ির চাকা বিচিত্র শব্দ তুলে নিস্তব্ধ রাত্রির মাঝখানে এগিয়ে চলে।

অনুবাদ—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

নাইটিংগেল

হ্যান্‌স্‌ এ্যাণ্ডারসেন

তোমরা তো জানো, চীন দেশের সম্রাট যেমন চীনেম্যান, তাঁর আশেপাশের আর সকলেও তেমনি চীনেম্যান। যে-গল্পটা তোমাদের বলছি তা অনেক দিনের পুরোনো, আর সেইজন্যেই ভুলে যাবার আগে গল্পটা শুনে রাখা ভালো। সম্রাটের প্রাসাদের কী জাঁকজমক! পৃথিবীতে আর কোথাও অমনটি পাবে না। সেরা চীনেমাটি দিয়ে সমস্ত প্রাসাদটা মোড়া; যেমন তার দাম, তেমনি আবার একটুতেই ভেঙে যাবার ভয়; সবাই তাই খুব সাবধানে চলাফেরা করে, পারতপক্ষে হাত-টাত লাগায় না। বাগানে অপরূপ সুন্দর কত ফুল, সবার সেরা ফুলগুলোয় আবার রুপোর ঘণ্টা বাঁধা। পথ দিয়ে কেউ চললেই সেই ঘণ্টাগুলো বেজে ওঠে। পাছে কেউ সেদিকে তাকাতে ভুলে যায়, তাই এই ব্যবস্থা। এ বাগানের সমস্ত কিছুই অপূর্ব; আর, কী প্রকাণ্ড বাগানটা! মালী পর্যন্ত ঠিক করে বলতে পারে না কোথায় তার শেষ!

সেই বাগানের অনেকটা ভিতরে আছে এক সুন্দর বন। কত বড় বড় গাছ আর গভীর জলাশয় সেখানে! সেই বন গিয়ে নীল সমুদ্রের মধ্যে শেষ হয়েছে। বড় বড় জাহাজ সেই বনের নিচে দিয়ে চলে যায়, এমন গভীর সেখানকার সমুদ্র। সেই বনের এক ডালে বাস করতো এক নাইটিংগেল। ভারি মিষ্টি তার গান; গরিব জেলে কত কাজে ব্যস্ত, সে পর্যন্ত রাতে জাল ফেলতে যাবার সময় থমকে দাঁড়িয়ে তার গান শুনতো। বলতো, আহা, কী মিষ্টি

গান ! কিন্তু তার তো অনেক কাজ, কাজের মধ্যে কখন সে এই গানের কথা ভুলে যেতো। কিন্তু পরদিনই আবার অমনি সময়ে নাইটিংগেলের গান সে শুনতে পেতো ; তখন আবার বলতো, আহা, কী মিষ্টি গান !

পৃথিবীর সব দেশ থেকে কত লোক এসে সম্রাটের প্রাসাদ আর সহর আর বাগানের প্রশংসা করতো। কিন্তু নাইটিংগেলের গান শোনার পর তারা সবাই একবাক্যে বলতো, হ্যাঁ, গান বটে ! এই গানের কাছে সম্রাটের জাঁকজমক ওসব কিছুই লাগে না।

দেশে ফিরে গিয়ে ঐসব যাত্রীর দল তারা যা দেখে এসেছে সবিস্তারে সকলকে শোনাতো। সহর আর প্রাসাদ আর বাগান নিয়ে পণ্ডিতেরা কত বই লিখলেন, কিন্তু নাইটিংগেলের কথা কেউ ভুলতে পারেন নি ; ভুলবেন কি, তার কথাই সবার আগে লিখলেন। কবিরা তাকে নিয়ে অসংখ্য অনবদ্য কবিতা রচনা করলেন।

সারা পৃথিবীতে বইগুলো ছড়িয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে সম্রাটের হাতেও পৌঁছলো। সোনার সিংহাসনে বসে সম্রাট সেই সব বই পড়েন আর পড়েন। সহরের আর প্রাসাদের আর বাগানের সুন্দর বর্ণনার কথা পড়তে পড়তে খুশিতে মাথা দোলান। সম্রাট পড়েন—সবই সুন্দর, কিন্তু সবার থেকে সুন্দর হলো সেই নাইটিংগেলের গান।

সম্রাট তো অবাক ! নাইটিংগেল ! কই নাইটিংগেলের কথা তো আমি জানি না ! কখনো তো শুনিনি এমন একটা জিনিস আমার রাজ্যে, আমারই বাগানে রয়েছে ! এও কি বই পড়ে জানতে হবে নাকি ? খোঁজ করতে হচ্ছে তো !

সম্রাট তাঁর পার্শ্বচরকে ডাকলেন। তার আবার জমক কত ! নিম্নপদস্থ কেউ যদি তার সঙ্গে কথা বলতে আসে বা কিছু

প্রশ্ন করে, তো সে শুধু বলে—পি !—যে-কথার কোনোই মানে নেই।

সম্রাট বললেন, শুনছি নাকি নাইটিংগেল বলে এক অতি আশ্চর্য পাখি আমার রাজ্যে আছে, আমার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সেরা জিনিস নাকি এই নাইটিংগেল ? কেন আমায় এতদিন একথা জানানো হয় নি ?

পার্শ্বচর বললে, সম্রাট, এহেন পাখির কথা তো আমিও শুনিনি ! কেউ তো তাকে দরবারেও আনেনি কখনো !

সম্রাট বললেন, আমার হুকুম, আজই সন্ধেবেলা এই নাইটিং-গেলকে এখানে এনে আমাকে গান শোনাবে। কী ! সারা পৃথিবী এই অমূল্য সম্পদের কথা জানে, আর আমি নিজে তার খবর রাখবো না !

আজ্ঞে সম্রাট, আচ্ছা, আমি খোঁজ করছি।

কিন্তু কোথায় পাবে সে নাইটিংগেলকে ? সারা প্রাসাদ তন্ন-তন্ন করে খুঁজে, সকলকে জিজ্ঞেস করেও কিছু জানা গেল না। পার্শ্বচর তখন সম্রাটের কাছে ফিরে এসে বললে, প্রভু, যারা বই লিখেছে এ নিশ্চয়ই তাদের গল্পকথা। ওদের কথা বিশ্বাস করবেন না। এ-সমস্ত হয় বিলকুল মিথ্যে, নয় তো ভেল্কিবাজি।

—কিন্তু তা কী করে হয় ! যে-বইতে আমি পড়েছি, মহা-পরাক্রান্ত জাপান সম্রাট যে তা আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাতে কি কখনো মিথ্যা থাকতে পারে ? উঁহু, নাইটিংগেলের গান আমার চাই, আজই সন্ধ্যায়। আমার এই প্রাসাদে ওকে আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যদি নাইটিংগেলকে না পাই তো সমস্ত দরবারকে ভীষণ শাস্তি দেবো !

ৎসিং-পী ! এই বলে পার্শ্বচর আবার সমস্ত প্রাসাদ তন্নতন্ন করে খুঁজলো। শুধু সে নয়, প্রাসাদের অর্ধেক লোকও প্রাণের দায়ে

তার সঙ্গে যোগ দিলো। পৃথিবীসুদ্ধ সবাই জানে অথচ প্রাসাদে কেউ জানে না, এমন নাইটিংগেলের সন্ধানে সর্বত্র ভীষণ খানা-তল্লাসি চলতে লাগলো।

রান্নাঘরের এক ছোট্ট মেয়ে শেষ পর্যন্ত বললে, কী, নাইটিং-গেল ? হ্যাঁ, তার কথা জানি বৈকি ! তার গানের কথা বলছো ? হ্যাঁ, গায়ই তো ! আমার মা-র তো অসুখ, রোজ সন্ধেবেলা মা-র জন্যে এঁটোকাঁটা নিয়ে সমুদ্রের ধারে যাই ; ফেরবার সময় যখন হাঁপিয়ে পড়ে জিরোতে বসি, তখন তার গান শুনতে পাই। শুনতে শুনতে আমার চোখে জল এসে যায়। ঠিক মনে হয় যেন মা আমাকে চুমু খাচ্ছে।

বটে ! বটে ! পার্শ্বচর শুনে বলে উঠলো, যদি তুই আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারিস তো রান্নাঘরে তোর চাকরি পাকা করে দেবো, চাই কি, সম্রাটের খাওয়া পর্যন্ত তোকে দেখতে দেবো। দরবারে আজ নাইটিংগেলের গানের আসর বসবে।

তখন তারা চললো বনের মধ্যে যেখানে নাইটিংগেলের গান শোনা যায় সেদিকে। দরবারের অর্ধেক লোক ওদের সঙ্গে চললো। যেতে যেতে, যেতে যেতে হঠাৎ একটা গোরুর ডাক শোনা গেলো।

অমনি পার্শ্বচর বলে উঠলো, ঐতো, ঐতো ! ওঃ ! অতো ছোট একটা প্রাণীর এ কী অদ্ভুত ক্ষমতা রে বাবা ! হ্যাঁ, এ গান আগেও শুনছি, বেশ মনে পড়ছে !

না না, ও তো গোরুর ডাক ! বললে ছোট্ট মেয়েটি। এখনো আমাদের অনেকটা যেতে হবে।

আবার কিছুক্ষণ চলার পর জলায় কয়েকটা ব্যাং ডেকে উঠলো।

চমৎকার, চমৎকার ! চেঁচিয়ে উঠলো পার্শ্বচর, এবার ঠিক শুনতে পেয়েছি ! যেন ছোট মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ।

না না, ও তো ব্যাঙের ডাক! ছোট্ট মেয়েটি বলে উঠলো। তবে, আর বেশি দেরি নেই, শিগগিরই আমরা ওর গান শুনতে পাবো।

কিছুক্ষণ পরে নাইটিংগেলের গান শোনা গেলো।

ঐ, ঐ! ছোট্ট মেয়েটি বলে উঠলো, শোনো, শোনো! আর ঐ ছ্যাখো, ঐ বসে আছে। এই বলে সে একটা গাছের ডালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ধূসর রঙের ছোট্ট পাখিটাকে দেখিয়ে দিলো।

কিন্তু এও কি সম্ভব? পার্শ্বচর ভাবতে লাগলো, এমনটি যে হবে, এ তো আমি ভাবতেও পারি নি! এ তো নিতান্ত সাধারণ দেখতে! রংটা অবশ্য একটু ফিকে হয়ে গেছে, এত বড় বড় লোক সব দেখে গেছে তো!

মেয়েটি গলা চড়িয়ে বললে, ওগো ছোট্ট নাইটিংগেল, মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের খুব ইচ্ছে তিনি তোমার গান শোনেন।

এ তো খুবই আনন্দের কথা, এই বলে নাইটিংগেল এমন অপূর্ব গান শুরু করলে যে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলো।

পার্শ্বচর বলে উঠলো, ওঃ, ঠিক যেন ফটিকের ঘণ্টার শব্দ! ছ্যাখো ছ্যাখো, ছোট্ট গলাটা কেমন ওঠানামা করছে! সত্যি, আশ্চর্য! এমনটি কেউ কখনো শোনেনি! ওঃ, দরবার যা জমে উঠবে!

সম্রাটকে আর-একটু গান শোনাবো কি? নাইটিংগেল বলে উঠলো। সে ভেবেছিল স্বয়ং সম্রাটও বুঝি এদের সঙ্গে এসেছেন।

ওগো নাইটিংগেল, ওগো আমার ছোট্ট পাখিটি, আজ সন্ধ্যায় সম্রাটের দরবারে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি! সেখানে আজ মস্ত আসর বসবে, মহামান্য সম্রাট বাহাদুর স্বয়ং তোমার গান শুনবেন।

নাইটিংগেল বললে, কিন্তু আমার গান তো বনেই ভালো শোনায়। যাই হোক, সম্রাটের ইচ্ছেয় সে ওদের সঙ্গে প্রাসাদে গেলো।

প্রাসাদ আজ খুব জাঁক করে সাজানো হয়েছে। হাজার সোনার বাতিতে চীনেমাটির দেয়াল আর মেঝে ঝকমক করছে। অলিন্দে অলিন্দে কত রংবেরঙের ফুল! এত ছুটোছুটি আর তাড়াহুড়ো শুরু হলো যে সমস্ত ঘণ্টাগুলো একসঙ্গে বাজতে শুরু করলো—তাদের শব্দে নিজের কথাই নিজে শুনতে পাওয়া দায়!

মস্ত ঘরটার মাঝখানে বসে আছেন সম্রাট, তাঁর কাছে একটা সোনার দাঁড়ে নাইটিংগেলের জায়গা হয়েছে। সমস্ত দরবার ভরে গেছে। রান্নাঘরের সেই ছোট মেয়েটি, যার চাকরি ইতিমধ্যে পাকা হয়ে গেছে, সেও দরজার কাছে দাঁড়াবার অনুমতি পেয়েছে। সবার পরনেই চোখ-ধাঁধানো পোশাক। সম্রাট নাইটিংগেলকে ইঙ্গিত করতেই অমনি সবার দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়লো।

নাইটিংগেলের গান শুরু হলো। অপূর্ব সে গান! রাজার ছু-গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। ক্রমেই তার গান সবার হৃদয় স্পর্শ করলো। খুব খুশি হয়ে সম্রাট বললেন, আমার সোনার চটি নাইটিংগেলের গলায় পরানো হোক। নাইটিংগেল কিন্তু তাতে রাজি হলো না। সবিনয়ে বললে, যে-পুরস্কার আমি পেয়েছি তা-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট! স্বয়ং সম্রাটের চোখে যে জল আনতে পেরেছি, এই তো আমার সবচেয়ে বড় গৌরব! বলে সে আবার স্বর্গীয় কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত শুরু করলো।

ঠিক হলো, নাইটিংগেল এখন থেকে তার জন্যে যে দাঁড় আনা হয়েছে সেই দাঁড়ে থাকবে। দিনের মধ্যে কেবল ছু-বার তাকে বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো, আর রাত্রে একবার। বারোজন চাকর ওর দেখাশুনো করে; একটা করে সিল্কের ফিতে ওর পায়ে বেঁধে শক্ত করে ধরে রাখে। এ-হেন স্বাধীনতায় আর কার মজা লাগে বলো!

সহরের সবার মুখেই নাইটিংগেলের কথা ছাড়া কথা নেই। ছুজনের দেখা হতেই একজন বলে ওঠে—'নাইট', আর অপরজন

বলে ওঠে—'গেল' ; বলে, আর পরস্পরের মনের কথা বুঝতে পেরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। এমনকি দেশের এগারোটা ছেলের পর্যন্ত ঐ নামকরণ হলো।

একটা প্যাকেট একদিন সম্রাটের নামে এলো, তার ওপরে লেখা—নাইটিংগেল।

সম্রাট ভাবলেন, এই তো আমাদের বিখ্যাত পাখি সম্বন্ধে আর-একটা বই এলো। বই কিন্তু সেটা নয়, একটা বাক্সের ভিতরে ছোট্ট সুন্দর জিনিস একটি। জিনিসটি আর কিছু নয়, ঠিক সত্যিকারের নাইটিংগেলের মতো দেখতে তৈরি-করা একটা নাইটিংগেল, সারা দেহে তার হীরে চুনি পান্না ঝকমক করছে। এই নাইটিংগেলকে দম দিলেই ও আসল নাইটিংগেলের একটা গান গেয়ে ওঠে। গাইবার সময় ওর গলা ওঠে আর নামে, আর সেইসঙ্গে যত সোনা আর রুপো ওর গলায় খচিত আছে, জ্বলজ্বল করে ওঠে। ওর গলায় একটা ছোট্ট ফিতে ; তাতে লেখা—জাপান সম্রাটের নাই-টিংগেল চীন-সম্রাটের নাইটিংগেলের তুলনায় কিছুই নয়!

বাঃ, কী সুন্দর! সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, আর, যে এই কলের নাইটিংগেল এনেছে সে খেতাব পেলো—প্রধান রাজকীয় নাইটিংগেল-বাহক।

এবার ওরা দুজনে একসঙ্গে গান করুক, সভাসদরা বলে উঠলো—কী অপূর্ব দ্বৈতসংগীতই না হবে তাহলে!

দ্বৈতসংগীত কিন্তু একটুও জমলো না। আসল নাইটিংগেল নিজের মনের মতো গেয়ে চললো।

সংগীত-বিশারদ বললে, ওর গানে তো আমি একটুও খুঁত ধরতে পারছি না! কোথাও এতটুকু তাল কাটেনি বা ভুল হয়নি! কলের পাখি তখন একাই গেয়ে চললো। ঠিক আসল পাখির

মতোই ওর গান সকলের ভালো লাগলো, আর মণি-মুক্তোয় খচিত ওর চেহারা তো আসল নাইটিংগেলের চেয়ে অনেক সুন্দর বটেই !

একই সুর পরপর তেত্রিশবার গাইবার পরেও কলের পাখির ক্লান্তি নেই। সভাসদদের তাতেও আশ মেটেনা, আবার শুনতে চায়। কিন্তু সম্রাট ভাবলেন, আসল পাখির এবার গাওয়া উচিত।—কিন্তু একী ! খোলা জানলা দিয়ে কখন যে বনের পাখি বনে উড়ে গেছে কেউ লক্ষ্যই করেনি।

এমন ব্যাপার কেউ কখনো শুনেছো ? সম্রাট বলে উঠলেন। সভাসদ সকলেও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একবাক্যে বলে উঠলেন, নাইটিংগেলের মতো অকৃতজ্ঞ প্রাণী আর দুটি নেই ! তা যাই হোক, ভালো পাখিটাই তো আমাদের রয়ে গেছে ! নকল পাখিটাকে তাই আবার গাইতে হলো—এবার নিয়ে চৌত্রিশবার সেই এক সুর শুনেও কেউ সবটা শিখতে পারলো না—সুরটা খুব কঠিন কিনা ! সংগীত-বিশারদ তার অশেষ প্রশংসা করলো, বললে, আসল পাখির চেয়ে এর গান অনেক, অনেক ভালো। শুধু যে এর পোশাক আর অলঙ্কারের জন্যেই অনেক ভালো তা নয়, দেখুন সম্রাট বাহাদুর, আসল পাখির গানে কোন্ সুরের পরে ঠিক কোন্ সুর আসবে কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। কিন্তু কলের পাখির ব্যাপারে সব একেবারে বাঁধাধরা—এই সুরের পরে ঠিক এই সুরই আসবে। এর ব্যতিক্রম নেই। কেন এ হয়, মানুষের তৈরি এই আশ্চর্য যন্ত্র টুকরো টুকরো করে দেখলেই তা বোঝা যাবে। বোঝা যাবে কোন্ অংশটায় কী কাজ হয়, কেমন করে সুরগুলো ঠিক একটার পর একটা বেজে ওঠে।

ঠিক, ঠিক ; আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম, সভার সবাই একবাক্যে বলে উঠলো। ঠিক হলো, পরের রবিবার সংগীত-বিশারদ জনসাধারণকে পাখিটা দেখাবে।

—আর সেইসঙ্গে ওর গানও হবে। সম্রাট বলে উঠলেন।

গান হলো। শুনে সবাই খুব খুশি, চায়ের নেমন্তন্নে গিয়ে অনেক চা খেলে চীনেরা যেমন খুশি হয় তেমনি। সবাই তারিফ করলো ঘাড় নেড়ে ; আঙুল বাড়িয়ে বললে—আহা ! আহা ! সেই জেলে কিন্তু ওর গান শুনে বললে, মন্দ তো নয়, কিন্তু কিসের যেন একটা অভাব রয়ে গেছে।

আসল নাইটিংগেল দেশ থেকে নির্বাসিত হলো।

সম্রাটের বিছানার কাছে একটা সিল্কের কুশনের ওপর কলের পাখির জায়গা হলো, আর যত পুরস্কার সে পেয়েছে সমস্ত তার চারিদিকে সাজানো রইলো। আর খেতাব ? খেতাব পেলো—সম্রাট-বাহাদুরের রাতের বাউল। ওর স্থান হলো সম্রাটের বাঁ দিকে এবং সবার প্রথমে, কারণ সম্রাট হলেও তাঁরও হৃদয় তো বুকের বাঁদিকেই আছে, সুতরাং সেদিকটাই যে ভালো তাতে সন্দেহ কী ! নকল পাখি সম্বন্ধে সংগীতবিশারদ পঁচিশটা মোটা-মোটা বই লিখলো,—চীনে ভাষার যত কটোমটো শব্দ দিয়ে সে-বই ভরা। যে যেখানে ছিলো সবাই বললে তারা সব বই পড়েছে আর পড়ে বুঝতে পেরেছে ; কারণ তা না বললে যে লোকে তাদের বোকা বলে পায়ে মাড়িয়ে যাবে !

পুরো একবছর কেটে গেছে। সম্রাট, সভাসদ, দেশের সকলেরই এই গানের প্রত্যেকটি লাইন একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে, আর সেজন্যেই এ গান আরো বেশি ভালো লাগে। ওর সঙ্গে তারাও গান ধরতো। রাস্তার ছেলেরাও গেয়ে উঠতো—জী-জী-জী ক্লাক-ক্লাক ক্লাক ! স্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত গাইতেন।

একদিন সন্ধ্যায় সম্রাট বিছানায় শুয়ে পাখির গান শুনছেন, এমন সময় কী যে হলো, পাখিটার ভিতর থেকে দুটো শব্দ হলো, চাকাগুলো ঘুরে গেলো, আর সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ হলো।

সম্রাট তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে ডাক্তারকে খবর দিলেন, কিন্তু ডাক্তার কী করতে পারে? তখন ঘড়িওয়ালাকে ডাকা হলো। অনেক বকবক করে, অনেক উঁকিঝুঁকি মেরে সে পাখিটাকে কতকটা ঠিক করলো বটে, কিন্তু বললে যে পাখিটা যেন কম গান করে, কারণ ওর যন্ত্রপাতি খুব ক্ষয়ে গেছে। আহা, কী দুঃখের কথা! বছরে মাত্র একবার তার গান গাইবার হুকুম হলো, তাও খুব সাবধানে, আর ভয়ে-ভয়ে। সংগীত-বিশারদ কিন্তু এসব ব্যাপারে চটে গিয়ে খুব কড়া কড়া কথা বললো। তার মতে, পাখির কিছু হয়নি, ঠিক আগের মতোই গেয়ে চলেছে।

দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেলো। দেশে কারুর মুখে হাসি নেই; সম্রাটের খুব অসুখ, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

ইতিমধ্যেই এক নতুন সম্রাট নির্বাচিত হয়েছেন। পথে লোকের ভিড়, সম্রাটের পার্শ্বচরকে তারা জিজ্ঞেস করে, সম্রাট কেমন আছেন?

পার্শ্বচর কেবল মাথা নাড়ে আর বলে—পী! রত্নখচিত মস্ত পালঙ্কে সম্রাট শুয়ে আছেন, তাঁর মুখ রক্তহীন, ঠাণ্ডা। সম্রাট মারা গেছেন ভেবে সভাসদেরা হবু-রাজাকে অভিষেক করতে গেলো। চাকরদের ব্যস্ত আনাগোনা, কফি-র মস্ত ভোজে দাসীরা পরিবেশনে ব্যস্ত। প্রাসাদের ঘরে ঘরে, অলিন্দে অলিন্দে কাপড় বিছোনো, চলতে গেলে যাতে শব্দ না হয়। কী নিস্তব্ধ চারদিক! আসলে কিন্তু সম্রাট মারা যান নি, পালঙ্কে নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছেন,—সারা দেহ শক্ত, রক্তহীন; বড় বড় ভেলভেটের মশারিতে বিছানা ঢাকা। অনেক উঁচু একটা খোলা জানলা থেকে চাঁদের আলো সম্রাটের আর নকল পাখির ওপরে পড়ছে।

নিশ্বাস ফেলতেও সম্রাটের কষ্ট হচ্ছে, কী এক গুরু ভার যেন

তাঁর বুকে চেপে বসেছে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখেন, স্বয়ং মৃত্যু তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে! তাঁর সোনার মুকুট খুলে নিয়েছে, আর এক হাতে নিয়েছে রাজদণ্ড আর অন্য হাতে ঝলমলে পতাকা। ভেলভেটের মশারির খাঁজ থেকে অদ্ভুত-দর্শন কত মাথা উঁকি দিচ্ছে,—তাদের কয়েকটা অতি কুৎসিত, কয়েকটা শান্ত ও নম্র। ওগুলো হলো সম্রাটের কুকীর্তি আর সুকীর্তি ; মৃত্যু বুকে চেপে বসেছে বলে ওরা এসেছে।

সংগীত, সংগীত! সম্রাট চিৎকার করে উঠলেন, রাজ-ঢাকের বাদ্যি বাজাও, দামামা বাজাও! ওদের কথা যেন আমার কানে না আসে!

কিন্তু মাথাগুলো নড়লো না, মৃত্যুও স্থির হয়ে বসে ঠিক চীনেম্যানের মতো মাথা নাড়তে লাগলো।

সংগীত, সংগীত! আবার চেঁচিয়ে উঠলেন সম্রাট, ওরে লক্ষ্মী পাখি, ভালো পাখি! গান কর্, গান কর্! কত সোনা তোকে দিয়েছি, কত মণিরত্ন দিয়েছি!

পাখি কিন্তু নীরব। দম দেবার কেউ নেই, আর দম না দিলে তো পাখি গান করতে পারে না! এদিকে মৃত্যু একদৃষ্টে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে আছে,—কী ভীষণ নিস্তব্ধ চারিদিক!

ঠিক সেই মুহূর্তেই জানলার কাছে এক অনবদ্য সংগীত বেজে উঠলো। এ গান আসল নাইটিংগেলের ; জানলার বাইরে একটা গাছের ডালে বসে গেয়ে চলেছে। তাকে যে সম্রাটের কতো দরকার তা সে শুনেছে ; তাই সে এসেছে সম্রাটের কানে আশার সংগীত, আরামের সংগীত শোনাতে। ক্রমেই ঘরের সেই মাথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো, সম্রাটের শরীরে রক্তসঞ্চালন দ্রুত হলো ; আর স্বয়ং মৃত্যু একমনে গান শুনতে শুনতে বললো, গাও ছোট্ট পাখি, গেয়ে যাও!

হ্যাঁ, গাইবো : কিন্তু তুমি কি আমাকে ঐ সোনার রাজদণ্ডটা দেবে ? দেবে কি'ঐ রঙিন পতাকা, দেবে সম্রাটের মুকুটটি ?

একটা গানেই মৃত্যু খুশি হয়ে ঐসব অমূল্য বস্তু দিয়ে দিলো। নাইটিংগেল গেয়ে চলেছে। গাইলো নীরব সমাধিক্ষেত্রের কথা যেখানে সাদা গোলাপ ফোটে, যেখানে সুগন্ধ গাছের সুবাসে বাতাস ভরে ওঠে, শোকার্তের অশ্রুজলে তৃণ যেখানে সিক্ত। নিজের বাগানের জন্য তখন মৃত্যুর মন-কেমন করে উঠলো, ঠাণ্ডা সাদা কুয়াশার মতো জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ! সম্রাট বলে উঠলেন, পাখি, ওরে স্বর্গের পাখি, আমি তোকে চিনেছি। তোকে আমি আমার দেশ থেকে নির্বাসিত করেছিলাম, আর তুইই এখন তোর গানের সুরে সমস্ত অকল্যাণ সমস্ত বিভীষিকাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে আমায় রক্ষা করেছিস ! কী পুরস্কার যে তোকে দেবো !

আমার পুরস্কার তো আমি আগেই পেয়েছি, সম্রাট ! প্রথম যখন আমার গানে আপনার চোখে জল আসে সেদিনের কথা আমি কখনো ভুলবো না সম্রাট ! সম্রাটের অশ্রুই তো গায়কের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। আপনি নিদ্রা যান সম্রাট, সুস্থ শরীরে সেরে উঠুন।

পাখি গেয়ে চললো, আর গানের সুরের মোহে এক শান্ত, সুন্দর ঘুমে সম্রাট আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

সম্রাটের যখন ঘুম ভাঙলো, সমস্ত জানলা দিয়ে তখন সূর্যের আলো এসে তাঁর ওপর পড়েছে। ভৃত্যেরা কেউ তখনো আসেনি, তারা ভেবেছে তিনি মারা গেছেন। নাইটিংগেল তখনো সমানে গেয়ে চলেছে।

সম্রাট বললেন, ওরে, তুই সব সময় আমার কাছে থাকবি ; যখন খুশি গান করবি। ঐ নকল পাখিটাকে আমি এক্ষুনি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলবো !

না সম্রাট, তা করবেন না। ওর সাধ্যমতো তো ও করেছে। ও থাক যেমন আছে। আর, আমার কথা হলো, আমি তো প্রাসাদে বাস করতে পারবো না ; তবে খুশি-মতো আমি সন্ধ্যার দিকে আপনার কাছে আসবো, এই গাছের ডালে বসে গান শোনাবো। গান শুনে আপনার মন ভাবে ভরে উঠবে, খুশিতে পূর্ণ হবে। যারা সুখী তাদের গান গাইবো, যারা অসুখী তাদেরও গান গাইবো। আপনার আশে-পাশে ভালোমন্দ যা ঘটে অথচ যার আপনি খবর রাখেন না, সেসব কথাও আমি আপনাকে গেয়ে শোনাবো। ছোট্ট পাখি আমি, আমি অনেক দূর উড়ে যাই। গরিব জেলের কাছে, আপনার প্রাসাদ থেকে যারা বহু দূরে থাকে তাদের সকলের কাছে আমার যাওয়া-আসা। আমি আসবো, গাইবো ; কিন্তু একটা প্রার্থনা আমার আছে সম্রাট !

তোমার কোনো প্রার্থনাই আমার কাছে বিফল হবে না, পাখি ! বলে সম্রাট রাজবেশে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর সোনায় মোড়া ভারী রাজদণ্ডটা বুকের আছে তুলে ধরলেন।

একটা প্রার্থনা আমার সম্রাট ! একটা ছোট পাখি এসে আপনাকে এত কথা বলে যায়,—এ কথা কাউকে জানাবেন না, তাহলেই আর আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।

এই বলে নাইটিংগেল উড়ে চলে গেলো।

মৃত সম্রাটকে দেখতে এলো ভৃত্যের দল : অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তারা শুনলো, সম্রাট তাদের সুপ্রভাত জানাচ্ছেন।

অনুবাদ—অমিয়কুমার চক্রবর্তী

পাইক্র্যাফ্‌টের গোপন রহস্য

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্

ও যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে আমার দূরত্ব বারো গজের বেশি হবে না। ঘাড় ফেরালেই ওকে দেখতে পাই, এবং ওর দিকে তাকালে প্রায়ই আমাদের দৃষ্টিবিনিময় হয়। ওর দৃষ্টিতে তখন ফুটে ওঠে—

হ্যাঁ, অনেকটা মিনতির ভাবই ফুটে ওঠে। এবং তার সঙ্গে সন্দেহও মেশানো থাকে কতকটা।

চুলোয় যাক ওর সন্দেহ! ইচ্ছে করলে অনেক আগেই ওর সমস্ত রহস্য প্রকাশ করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করি নি, এবং সেদিক দিয়ে ওর নিশ্চিন্তই থাকা উচিত—মানে, ওর মতো মেদবহুল ব্যক্তির পক্ষে যতোটা নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব হয়! আর তা ছাড়াও, ওর রহস্য প্রকাশ করলেই বা তা বিশ্বাস করছে কে!

আহা, পাইক্র্যাফ্‌ট্, বেচারা! মাংসের পিণ্ড একটি। লণ্ডনের সমস্ত ক্লাব খুঁজলেও ওরকম স্থূল ব্যক্তি আর একটি পাওয়া যাবে না।

ক্লাবের একটা ছোট টেবিলে আগুনের ধারে বসে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে। কী খাচ্ছে ও? সতর্ক, চোরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি, আমার দিকে লক্ষ্য রেখে একখণ্ড গরম মাখন-মাখানো কেকএ দাঁত বসাচ্ছে। আরে গেল, আমার দিকে তাকানো কেন বাপু!

হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। তুমি যখন কিছুতেই তোমার নীচতা ত্যাগ করবে না, আমাকে উপযুক্ত সম্মান

দেবে না,—এখানে, তোমার চোখের সামনে বসেই তোমার সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করবো। তোমাকে আমি অনেক সাহায্য করেছি, আড়ালে রেখে রক্ষা পর্যন্ত করেছি; আর তার প্রতিদান-স্বরূপ তুমি আমার ক্লাব-জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছো—কেবল সেই এক কথা, করুণ দৃষ্টিতে বারবার একঘেয়ে এক অনুনয়—প্রকাশ কোরো না, আমার রহস্য প্রকাশ কোরো না!

আর তা ছাড়াও, ঐ রাক্ষসের মতো খাওয়াও আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

এই সব কারণেই আমি পাইক্র্যাফ্‌টের গোপন তথ্য প্রকাশ করতে বসেছি—সম্পূর্ণ তথ্য, এবং সম্পূর্ণ তথ্য ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পাইক্র্যাফ্‌টের সঙ্গে এই ধূমপান-কক্ষেই আমার আলাপ হয়। আমি তখন সবে নতুন মেম্বার হয়েছি, বয়স অল্প। আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারিনি তখনো। পাইক্র্যাফ্‌ট্ লক্ষ্য করেছিলো তা। একা বসে আছি, ভাবছি মেম্বারদের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করতে পারলে বেশ হতো। এমন সময় হঠাৎ এলো সে; প্রকাণ্ড থুতনি, ইয়া ভুঁড়ি বাগিয়ে একরকম গড়াতে গড়াতে এসেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসলো। তারপর জোরে জোরে কিছুক্ষণ নিশ্বাস ফেলে দেশলাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে একটা চুরুট ধরালো। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে কি যেন বললো, দেশলাইটা ভালো জ্বলছে না না কি। তারপর সে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করলো। যত-গুলো বেয়ারা পাশ দিয়ে গেছে, তাদের প্রত্যেককে থামিয়ে তার নিজস্ব তীক্ষ্ণ পাতলা গলায় দেশলাইয়ের কথা জানিয়েছে।—সে যা-ই হোক, কতকটা এভাবেই আমাদের আলাপ হয়।

একথা-সেকথার পর সে খেলাধুলো সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলো। তারপর আমার শরীরের গড়ন আর গায়ের রঙের কথা তুললো। বললে, আপনার শরীর একহারা; একহারা কেন, হয়তো রোগাও বলা চলে। গায়ের রং আমার হয়তো বিশেষ ফর্সা নয়—আমার প্রপিতামহী যে হিন্দু ছিলেন এজন্য আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই—কিন্তু তাই বলে যে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ আমাকে দেখেই তা বুঝতে পারবে, এ আমি পছন্দ করি না। গোড়া থেকেই তাই আমার মন পাইক্র্যাফ্‌টের ওপরে বিরূপ হয়ে উঠেছিলো।

আমার সম্বন্ধে এতো কথা বলার উদ্দেশ্যই কিন্তু ছিলো তার নিজের প্রসঙ্গের অবতারণা করা।

বললো, আপনি বোধহয় আমার থেকে খুব বেশি পরিশ্রম করেন না; আর আপনার খাওয়াও বোধহয় আমারই মতো? (অত্যন্ত স্থূল ব্যক্তিমাত্রের মতোই তারও ধারণা ছিলো যে, সে কিছুই খেতো না) তারপর বাঁকা হাসি হেসে বললে, অথচ দেখুন, আমাদের মধ্যে কতো পার্থক্য!

তখন সে শুরু করলো নিজের মেদবহুল শরীরের কথা। একই কথা বলতে লাগলো বারবার—রোগা হবার জন্যে সে কী কী করেছে এবং আরো কতো কী করবে, লোকে তাকে কী করতে বলেছে বা তার মতো অবস্থায় লোকে রোগা হবার জন্য কী করেছে। বললো, এমনিতে হয়তো মনে হবে, শুধু খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে অথবা ওষুধের ব্যবহারেই শরীরের পুষ্টি অথবা মেদ দমন করা সম্ভব। এমনি সব যত বাজে কথা তার। অত্যন্ত বিরক্ত লাগতো।

এক-আধবার হয়, তবু এরকম ব্যবহার ক্লাবে বরদাস্ত করা চলে। কিন্তু কিছুদিন পরে মনে হলো, অনেক সহ্য করেছি,

আর সম্ভব নয়। ও যেন পেয়ে বসেছে আমাকে! যখনই ধূমপান-কক্ষে প্রবেশ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে। খেতে বসেছি, অমনি পাশে এসে গোগ্রাসে খেতে শুরু করেছে। সব সময়ে যেন লেগেই রয়েছে পেছনে! তবে, এটুকুই আশ্বাসের কথা যে, সে শুধু আমার একার পেছনেই লাগে না। কিন্তু প্রথম থেকেই তার ব্যবহারে মনে হতো, কেমন করে যেন সে জানতে পেরেছে যে এমন একটা বিশেষ কিছু আমার মধ্যে থাকা সম্ভব, অন্য কারো মধ্যে যা নেই।

বলতো, ওজন কমাবার জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি—সব কিছু! বলতো, আর ফুলো ফুলো গালদুটো তুলে আমার দিকে উঁকি মেরে তাকাতো।

পাইক্র্যাফ্ট্, বেচারা! আবার সে ঘন্টি বাজাচ্ছে, নিশ্চয় এখনই আবার মাখন-মাখানো কেকএর অর্ডার দেবে।

একদিন সে কাজের কথা পাড়লো। বললে, আমাদের পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শেষ কথা বলে মনে করলে ভুল হবে। শুনেছি প্রাচ্যে—এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার দিকে এমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইলো যে মনে হলো যেন কোনো জলজন্তু তার চৌবাচ্চা থেকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ আমি ক্ষেপে উঠলাম: কে আপনাকে আমার প্রপিতামহীর ব্যবস্থালিপির কথা বলেছে বলুন তো?

ঘুসি পাকিয়ে সে বললো, কেন কী হয়েছে?

এই এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকবার আমাদের দেখা হয়েছে, আর প্রতিবারেই আপনি আমার এই গোপন তথ্য সম্বন্ধে স্থূল ইঙ্গিত করেছেন।

তা, ধরা যখন পড়েই গেছি আর স্বীকার না করে লাভ কী? হ্যাঁ, আমি শুনেছি—

প্যাটিসনের কাছ থেকে ?

হ্যাঁ, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও কতটা তাই বটে।

আমার মনে হলো, ও মিথ্যে বলছে।

জানেন, প্যাটিসন যা করেছিলো তা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই ?

ঠোঁটদুটো বন্ধ করে সে ঘাড় নাড়লো,—মেনে নিলো আমার কথা।

আমার প্রপিতামহীর ব্যবস্থালিপি নিয়ে নাড়াচাড়া করা বিশেষ নিরাপদ নয়। বাবা তো আমাকে প্রায় প্রতিজ্ঞা করিয়েই নিয়েছিলেন—

—কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন নি তো ?

না, কিন্তু তিনি আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। নিজেও তিনি মাত্র একবার তা ব্যবহার করেছিলেন।

ও! কিন্তু,—আপনি কী বলেন ? ধরুন—ধরুন, যদি এক-বারের জন্য—

ব্যবস্থালিপিগুলো অত্যন্ত অদ্ভুত। এমনকি তাদের গন্ধ পর্যন্ত …না, সে হয় না।

কিন্তু এতদূর অগ্রসর হয়ে আমার কথায় ছেড়ে দেবে, সে বান্দা পাইক্র্যাফ্‌ট্‌ নয়। তা ছাড়া এ আশঙ্কাও আমার ছিলো যে একবার যদি ও ধৈর্য হারায় তাহলে আর নিস্তার নেই, হঠাৎ হয়তো আমাকে আক্রমণ করেই বসবে। এ আমার এক দুর্বলতা, স্বীকার করতে লজ্জা নেই। কিন্তু তার ওপরে আমি এতো বিরক্ত হয়েছিলাম যে ইচ্ছে হলো বলি,—যাও, তোমার নিজের দায়িত্বে যা-খুশি করো গিয়ে। প্যাটিসনের যে প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে তুলেছি সে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, এবং এ-ক্ষেত্রে অবান্তর। তবে, তাকে যে ব্যবস্থালিপি দিয়েছিলাম, জানতাম তা সম্পূর্ণ নিরাপদ। অন্য-গুলোর সম্বন্ধে আমার কোনো সঠিক ধারণা ছিলো না, বরং

মোটামুটি এই ধারণাই ছিলো যে, তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কিন্তু পাইক্র্যাফ্‌টের ওপর ওদের ফলাফল যদি বিষাক্ত হয়ে দাঁড়ায়—

স্বীকার করতে লজ্জা নেই,—আমার মনে হলো, এমন কিছুর সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে পইক্র্যাফ্‌টের পক্ষে যা কখনো অনিষ্টকর হতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অদ্ভুত-গন্ধওয়ালা চন্দনের বাক্সটা সিন্দুক থেকে বের করে খসখসে চামড়াগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলাম। আমার প্রপিতামহীর হয়ে যিনি ব্যবস্থালিপিগুলি লিখে রেখেছিলেন, বিবিধ রকমের চামড়ার প্রতি বোধহয় তাঁর দুর্বলতা ছিলো। তাঁর হাতের লেখাও ছিল অত্যন্ত জড়ানো। অনেক কিছুরই পাঠোদ্ধার করতে পারলাম না এবং যেটুকুর পারলাম তাও অতি কষ্টে—যদিও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের দৌলতে হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আমাদের বংশে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। তবে, একটা ব্যবস্থালিপির পাঠোদ্ধার আমি ঠিকই করেছিলাম। সিন্দুকের ধারে মেঝের ওপর বসে অনেকক্ষণ ধরে সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

পরের দিন পাইক্র্যাফ্‌টকে বললাম, এই যে এটা দেখছেন,—

সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যগ্রভাবে হাত বাড়ালো, কিন্তু আমি চট্‌ করে হাত সরিয়ে নিলাম।—আমার যতদূর মনে হচ্ছে, এটা হলো ওজন কমাবার জন্য। (পাইক্র্যাফ্‌ট—ও!) অবশ্য আমি একেবারে নিশ্চিত হতে পারছি না, তবে, আমার মনে হচ্ছে তাই। কিন্তু আমার উপদেশ যদি শুনতে চান তো বলবো, এ না নেওয়াই আপনার ভালো—ভেবে দেখুন, আপনার জন্যেই আমি আমার রক্ত পর্যন্ত কলুষিত করতে বসেছি—কারণ যতদূর জানি, আমার

প্রপিতামহীর দিকের পূর্বপুরুষরা একটু অদ্ভুত ধরনেরই ছিলেন,—বুঝলেন তো ?

তাহলেও আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই, পাইক্র্যাফ্‌ট্‌ বললো।

আবার আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়লাম। অনেক চেষ্টা করলাম, কিছুতেই আমার কল্পনা দানা বেঁধে উঠতে পারলো না। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মিঃ পাইক্র্যাফ্‌ট্‌, রোগা হয়ে গেলে আপনাকে কেমন দেখতে হবে, একবার ভেবে দেখছেন কি ?

যুক্তিতে বুঝবে, সে পাত্র পাইক্র্যাফ্‌ট্‌ নয়। ওকে প্রতিজ্ঞা করালাম, এর ফলে যা-ই হোক, নিজের শরীর নিয়ে আর কখনও আমাকে একটা কথাও বলবে না। তারপর ব্যবস্থালিপিটা ওর হাতে দিলাম। বললাম, সাবধান ! অত্যন্ত বেয়াড়া জিনিস কিন্তু !

সেজন্যে আপনাকে ঘাবড়াতে হবে না, বলে সে ব্যবস্থালিপিটা গ্রহণ করলো।

চোখ বড়-বড় করে সে ব্যবস্থালিপিটার দিকে তাকালো—বললে, কিন্তু—কিন্তু—

এতোক্ষণে ও আবিষ্কার করেছে, ব্যবস্থালিপিটা ইংরিজি ভাষায় লেখা নয়। বললাম, আমি সাধ্যমতো একটা তর্জমা করে করে দিচ্ছি।

ভালো তর্জমাই করে দিলাম। তারপর সপ্তাহদুয়েক আমাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয়নি ; যতোবার সে আমার কাছে আসতে চেয়েছে, চোখ রাঙিয়ে চলে যেতে ইঙ্গিত করেছি ; আর সেও আমাদের চুক্তি ভঙ্গ করেনি। এইভাবে কেটে গেলো দু-সপ্তাহ : কিন্তু দেখা গেল পাইক্র্যাফ্‌ট্‌ একটুও রোগা হয়নি। তখন সে বললো, বলতে বাধ্য হচ্ছি মশাই, এতে কিছুই হচ্ছে না। নিশ্চয় কোনো গণ্ডগোল আছে কোথাও, না হলে কোনো উপকার

পাচ্ছি না কেন! আপনি কিন্তু আপনার প্রপিতামহীর প্রতি ঠিক সুবিচার করছেন না।

ব্যবস্থাপত্রটা কোথায়?

সন্তর্পণে পকেট থেকে বের করে ও ব্যবস্থাপত্রটা আমার হাতে দিলো।

তালিকাটার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ডিমটা খারাপ ছিল তো?

না তো! কেন, তাই কি হওয়া উচিত ছিল নাকি?

আমার প্রপিতামহীর ব্যবস্থাপত্রের ব্যবহারে এ তো বলাই বাহুল্য! যখনই কোনো বিশেষ নির্দেশ না থাকবে বুঝতে হবে, সবচেয়ে খারাপ জিনিস ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে তাঁর অত্যন্ত কড়াকড়ি ছিলো। এর কয়েকটা ব্যাপারে অবশ্য কখনো-কখনো অন্য ব্যবস্থাও দেওয়া যেতে পারে। আপনার কাছে র‍্যাটল্ স্নেকের টাটকা বিষ আছে?

জ্যামর‍্যাকের দোকান থেকে একটা র‍্যাটল্ স্নেক কিনেছিলাম, দাম পড়েছিলো—

যতই পড়ুক, সে ব্যাপার আপনার। এই শেষের নির্দেশটা—

আমি একজনকে চিনি, যে—

হুঁ! আচ্ছা, আমি অন্য ব্যবস্থাগুলোর কথাও লিখে দিচ্ছি। ও ভাষা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান তাতে মনে হয়, এর বানানটা অত্যন্ত গোলমেলে।—হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, 'কুকুর' বলতে এখানে বোঝাবে, 'পারিয়া কুকুর'।

তারপর প্রায় এক মাস কেটে গেছে। পাইক্র্যাফ্ট্ রোজ ক্লাবে আসে। একটুও রোগা হয়নি, এবং ফলে তার উদ্বেগও রয়ে গেছে সমানই। আমাদের সর্ত সে ভঙ্গ করেনি, যদিও মাঝে-

মাঝে হতাশভাবে মাথা নেড়ে সর্তের প্রতি অমর্যাদা দেখিয়েছে। একদিন বললো, আপনার প্রপিতামহী—

বাধা দিয়ে আমি বলে উঠলাম, সাবধান, তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথাও নয়!

ও চুপ করলো।

আমি ভেবেছিলাম, পাইক্র্যাফ্‌ট্ হয়তো আমার ব্যবস্থাপত্র আর ব্যবহার করবে না; কারণ তিনজন নতুন মেম্বারের সঙ্গে যেভাবে সে সেদিন নিজের বপুর বিশালতা সম্বন্ধে কথা বলছিলো তাতে মনে হলো, ও নতুন ব্যবস্থাপত্রের সন্ধানে রয়েছে। এ-হেন সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ওর টেলিগ্রাম এলো।

টেলিগ্রাম নিয়ে ছোকরাটা সোজা আমার কাছে এসে চিৎকার করে উঠলো, মিঃ ফর্মালীন! টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে তখুনি খুলে ফেললাম।

—ঈশ্বরের দোহাই, চলে আসুন—পাইক্র্যাফ্‌ট্।

হুঁ! বেশ বুঝলাম, প্রপিতামহীর সুনাম অব্যাহতই রয়েছে। সত্যি বলতে কী, অত্যন্ত আনন্দ হলো, আনন্দের আতিশয্যে ভোজন-পর্বটা বেশ ভালো করেই সম্পন্ন করলাম।

হলঘরের পোর্টারের কাছে তার ঠিকানা পেলাম। ব্লুম্‌স্‌বেরিতে একটা বাড়ির ওপরের তলার ফ্ল্যাটে সে থাকতো। কফি-টফি সেরে চুরুটের অপেক্ষা না রেখেই সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

হলঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজলাম। মনে মনে বললাম, ব্যবস্থাপত্রটা ও না নিলেই পারতো। শুয়োরের মতো যার খাওয়া, তার শরীরটাও শুয়োরের মতোই হওয়া উচিত।

এক জঁাদরেল-গোছের স্ত্রীলোক এসে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো। তার মাথায় টুপি ঠিক জায়গায় নেই, মুখে উদ্বেগের ছায়া।

আমি নাম জানাতে দ্বিধাভরে দরজা খুলে দিলো। বললে, তিনি বলেছিলেন, আপনি এলে যেন ভিতরে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কোথায় আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তা নয়, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কেবল আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। তারপর চুপিচুপি বললো, তিনি স্যার দরজা বন্ধ করে আছেন।

বন্ধ করে!

হ্যাঁ স্যার। কাল সকাল থেকে দরজা বন্ধ করে আছেন, কাউকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছেন না আর থেকে থেকে গালাগালি করছেন। উঃ, কী ভয়ানক!

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকালাম। ঐ ঘরে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্যাপারটা কী?

বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললো, পথ্যের জন্যে বড় জ্বালাতন করেছেন, স্যার। বলেন, এমন পথ্য চাই যাতে পেট ভরে। যা পেয়েছি জোগাড় করে দিয়েছি।···সাংঘাতিক একটা কিছু বোধহয় উনি খেয়েছেন।

ভিতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে এলো,—কে, ফর্মালীন?

পাইক্র্যাফ্‌ট্ নাকি? বলে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

ওকে চলে যেতে বলুন।

বললাম।

দরজার ভিতর থেকে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেলো, কে যেন অন্ধকারে দরজার হাতলটা হাতড়াচ্ছে। পাইক্র্যাফ্‌টের পরিচিত ঘোঁৎ ঘোৎ শব্দও কানে এলো।

বললাম, ঠিক আছে। চলে গেছে সে।

আরো অনেকক্ষণ কেটে গেলো, কিন্তু তবুও দরজা খুললো না।

হঠাৎ চাবি ঘোরানোর শব্দ শোনা গেলো, আর শোনা গেলো পাইক্র্যাফ্টের গলা,—ভেতরে আসুন।

হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম দরজাটা। স্বভাবতই আশা করেছিলাম, পাইক্র্যাফ্টকে সামনে দেখতে পাবো।

কিন্তু কোথায় সে!

এমন হতভম্ব আমি জীবনে কখনো হইনি। যেখানে ঢুকলাম সেটা হলো তার বসবার ঘর। জিনিসপত্র অগোছালো, ইতস্তত ছড়ানো; বইপত্রের মধ্যে রয়েছে খাবারের প্লেট, ডিশ; চেয়ারগুলো উল্টে পড়ে রয়েছে। কিন্তু পাইক্র্যাফ্ট?

ঘাবড়াবার কিছু নেই মশাই, ঠিক আছে। দরজাটা বন্ধ করে দিন—পাইক্র্যাফ্টের গলা শোনা গেলো। এতক্ষণে আমি তাকে আবিষ্কার করলাম।

দরজার ওপরে কোনের দিকে কার্নিশের কাছে সে রয়েছে,—কে যেন ছাদের সঙ্গে এঁটে রেখেছে তাকে। উদ্বেগ ও ক্রোধ একসঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করতে করতে বললে, দরজাটা বন্ধ করে দিন; কারণ একবার যদি ও এ-অবস্থায় দেখতে পায় আমাকে—

দরজা বন্ধ করে দূরে গিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। বললাম, জানেন, হঠাৎ যদি হাত ফস্কে পড়ে যান তো ঘাড়টি একেবারে ভেঙে যাবে!

হায়, সে সৌভাগ্যও কি আমার হবে! করুণ, হতাশার স্বরে পাইক্র্যাফ্ট বললো।

আপনার মতো বয়সে ওরকম ওজন নিয়ে কেউ যে এমন ছোট ছেলের মত কসরৎ দেখাতে যেতে পারে—

থাক থাক, ঢের হয়েছে! তার মুখে বেদনার ছাপ ফুটে উঠলো—আপনার পাজি প্রপিতামহী!

মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি! তাকে সাবধান করে দিলাম।

দাঁড়ান, বলছি সব। অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে সে বললো।

কী অবলম্বন করে ওখানে আছেন বলুন তো?

হঠাৎ দেখলাম, কই, কিছুই তো অবলম্বন করে নেই! ও তো শুধু ভেসেই রয়েছে ওখানে—ও যদি গ্যাস-ভর্তি বেলুন হতো তাহলে যেমন ভেসে থাকতো তেমনি! ছাদ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেয়াল বেয়ে নেমে আসতে লাগলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, সেই ব্যবস্থালিপি—আপনার প্রপিতামহী—

খবর্দার! চিৎকার করে উঠলাম।

খোদাই-করা কি-একটা ছবির ফ্রেম কথা বলতে-বলতে অন্যমনস্ক ভাবে ও ধরেছিলো, হঠাৎ সেটা খুলে যেতেই ও আবার সজোরে ছিটকে ছাদে চলে গেলো, আর ছবিটা সোফার ওপর পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেলো। এতক্ষণে বুঝলাম, ওর শরীরের সর্বত্র সাদা-সাদা দাগগুলো কিসের। অতি সন্তর্পণে, একটা তাক অবলম্বন করে আর-একবার ও নেমে আসবার চেষ্টা করলো।

অমন প্রকাণ্ড বপু নিয়ে নিচের দিকে মাথা করে দেয়াল বেয়ে নেমে আসবার চেষ্টা—সে এক অতি অপূর্ব দৃশ্য! ঐ ব্যবস্থালিপি, সে বললো, অত্যন্ত বেশিরকম কার্যকরী হয়েছে!

কী রকম?

ওজন চলে গেছে—প্রায় সব ওজন আমার চলে গেছে।

এতোক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা।

হায় ভগবান!—কিন্তু বলতে কি পাইক্র্যাফ্‌ট্‌, আপনি চেয়েছিলেন, রোগা হতে; কিন্তু কেবলই ওজন কমাবার কথাই বলে এসেছেন।

যাই হোক, আমি অত্যন্ত খুশি হলাম, তখনকার মতো, পছন্দই করে ফেললাম ওকে।—আসুন আপনাকে সাহায্য করি, বলে

তাকে হাতে ধরে নামিয়ে আনলাম। মেঝে নাগাল পাবার জন্য তার পা ছোঁড়া দেখে ঝড়ের দিনে ঝাণ্ডা ধরে রাখার দৃশ্য মনে পড়ে গেলো।

একটা টেবিল দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐ টেবিলটা নিরেট মেহগেনি কাঠের, খুব ভারী। একবার যদি আমাকে ওর তলায় ঢুকিয়ে দিতে পারেন—

তাই দিলাম। বন্দী বেলুনের মতো দুলতে লাগলো সে। দূরে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

একটা চুরুট ধরিয়ে বললাম, বলুন খুলে, ব্যাপারটা কী।

খেলাম তো ওষুধটা।

কেমন লাগলো ?

উঃ, কী জঘন্য !

আমারও সেই ধারণাই ছিলো। আমার প্রপিতামহীর প্রায় সব ব্যবস্থাপত্রেরই প্রতিটি অনুপান, তাদের মিশ্রণ, এমনকি তাদের ফলাফল পর্যন্ত,—আর যাই হোক অন্তত খুব জঘন্য যে হবেই, এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিলো না। আমার দিক দিয়ে—

—প্রথমে আমি ছোট্ট এক চুমুক খেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে মনে হলো যেন অনেকটা ভালো বোধ করছি, বেশ হালকা লাগছে। তখন আমি স্থির করলাম, সবটাই খেয়ে ফেলবো।

আ হা হা !

আমি নাক বন্ধ করে ছিলাম। একটু একটু করে হালকা হয়ে যেতে লাগলাম, আর কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলাম।

হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো পাইক্র্যাফ্‌ট্‌—তাহলে আমি এখন কী করবো ছাই ?

একটা বিষয় বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছি যা আপনার এখন কিছুতেই করা উচিত হবে না। একবার যদি ঘরের বাইরে

ফাঁকায় বেরোন, তো আপনি কেবল ওপরেই উঠতে থাকবেন। বলে, ওপর দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দিলাম। তখন আবার আপনাকে পেড়ে আনবার জন্য সাণ্টোজ-ডুমণ্ডকে* পাঠাতে হবে।

কিন্তু এ অবস্থা কেটে যাবে তো?

ঘাড় নেড়ে বললাম, সে-ভরসায় থাকতে পারেন না।

আবার ক্ষেপে উঠলো সে, আশেপাশের চেয়ারগুলোর ওপরে সজোরে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো। অমন বেঢপ মোটার পক্ষে যতোটা খারাপ ব্যবহার সম্ভব, তার কিছুই ও বাদ দিলো না। আমার সম্বন্ধে, আমার প্রপিতামহীর সম্বন্ধে, যা-তা বলতে লাগলো।

বললাম, আচ্ছা, একবারও আমি আপনাকে ও ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করতে বলেছি?

উদার হৃদয়ে ওর সমস্ত অপমানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে, ওর চেয়ারের হাতলে বসে শান্ত হয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এ ঝঞ্ঝাট ও নিজেই মাথা পেতে নিয়েছে এবং ফলে যা হয়েছে, একদিক দিয়ে ঠিকই হয়েছে বলতে হবে। নিশ্চয়ই ও খুব বেশি খেয়ে ফেলেছে। ও কিন্তু তা স্বীকার করতে চায় না। এই নিয়ে আবার কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে তর্ক চললো।

ক্রমে সে এমন চিৎকার শুরু করলো যে বাধ্য হয়ে আমাকে ও আলোচনা থেকে বিরত হতে হলো। তারপর বললাম, আর তা ছাড়াও আপনি একটা মহা অন্যায় করেছেন। আপনার বলা উচিত ছিলো, রোগা হবেন,—তাহলে সত্যি বলা হতো। কিন্তু অসম্মানের ভয়ে কেবল বলেছেন, ওজন কমাবেন। আপনি—

বাধা দিয়ে সে জানালো সে সব বুঝেছে, আর জিজ্ঞেস করলো এখন তার কী করা উচিত।

*ব্রেজিলের সুবিখ্যাত বৈমানিক

বললাম, নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী এখন আপনার ব্যবস্থা করা উচিত। এতক্ষণে আমরা সত্যিকারের কাজের কথায় এলাম। বললাম, হাতে ভর দিয়ে ছাদে হাঁটা শেখা বোধহয় আর আপনার পক্ষে তেমন কঠিন হবে না—

কিন্তু ঘুমোবো কেমন করে ?

সে এমন কিছু মুস্কিলের ব্যাপার নয়। সতরঞ্চি-গোছের একটা কিছু করিয়ে তার নিচে বিছানার মতো কিছু ফিতে দিয়ে মজবুত করে বেঁধে দেবেন। তারপর একটা কম্বল বা চাদর-টাদর দিয়ে ধারগুলো ওর সঙ্গে বোতাম দিয়ে এঁটে দেওয়া—এ আর এমন কী অসম্ভব ব্যাপার ? তবে হ্যাঁ, স্ত্রীলোকটির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে হবে।

একটু আপত্তির পর সে আমার কথায় রাজি হলো। স্ত্রীলোকটিকে এই সব অদ্ভুত উল্টোপাল্টা করার ব্যাপারগুলো জানাতে সে সহজভাবেই তা নিলো, আমরাও আশ্বস্ত হলাম।

বললাম, ইচ্ছে করলে লাইব্রেরি-ঘরের সিঁড়িটাও আপনি ঘরে রেখে দিতে পারেন, আর আপনার খাবারও বইয়ের তাকের ওপরে দেওয়া যেতে পারে। ইচ্ছেমতো নেমে আসারও একটা সহজ উপায় আমি আবিষ্কার করলাম—

বৃটিশ এনসাইক্লোপিডিয়াটা (দশম সংস্করণ) ওপরের তাকে রেখে দিলেই হলো, গোটা-দুই খণ্ড তুলে নিলেই নেমে আসতে পারবেন। আমরা ঠিক করলাম, ছাদ-বরাবর দেওয়ালে লোহার রেলিং মতন থাকবে, যাতে একটু নিচুতে কোথাও নামতে হলেও কোনো অসুবিধে না হয়।

ক্রমে আমি পাইক্র্যাফটের ব্যাপারে রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। স্ত্রীলোকটিকে ডেকে সমস্ত খুলে বলা, বিছানা উল্টো করে পাতা, এ সমস্তই আমাকে করতে হলো। এ-সব

নিয়ে দিন-দুই তার ফ্ল্যাটেই থাকতে হলো আমাকে। স্ক্রু-ড্রাইভারের কাজে আমার হাত চলে ভালো; তার জন্যে বেশ কয়েকটা ছোটোখাটো কাজ করে দিলাম—এই যেমন, ঘণ্টিটা যাতে নাগালে পায় সেজন্য সেটার সঙ্গে একটা তার জুড়ে দেওয়া, ইলেকট্রিক বাতিগুলোর মুখ উল্টে দেওয়া, ইত্যাদি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেমন অদ্ভুত, তেমনি মজার। মস্ত বড় পোকার মতো পাইক্র্যাফ্‌ট্ ছাদে গুঁড়ি মেরে বেড়াচ্ছে আর দরজার ওপরের চৌকাট ধরে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্লাবে আসা একেবারে বন্ধ,—এ ভাবতেও ভারি আনন্দ হয়!…

আমার সর্বনাশা উদ্ভাবনী শক্তিই কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে পেয়ে বসলো। ওর ঘরে আগুনের ধারে বসে ওর হুইস্কি ধ্বংস করছি, ছাদে ওর প্রিয় কার্নিশের কোনে একটা টার্কিশ কম্বলের নিচে ও রয়েছে। হঠাৎ মতলবটা আমার মাথায় খেলে গেলো—

আরে আরে পাইক্র্যাফ্‌ট্! এ সবের তো কোনো দরকার নেই! সিসের গেঞ্জি, সিসের আণ্ডারওয়্যার! ব্যাস! ভালো করে চিন্তা না-করেই বলে ফেললাম। কথাটা শুনে পাইক্র্যাফ্‌ট্ প্রায় কেঁদে ফেললো। বললে, আবার কি তাহলে সব ঠিক—

আগাগোড়া ভালো করে না ভেবেই সমস্ত রহস্য ওর কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিলাম—সিসের পাত কিনুন। চ্যাপ্টা করে গোল গোল করে কেটে নিন, তারপর গেঞ্জি-আণ্ডারওয়ারের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে সেলাই করে নিন। জুতো যা পরবেন, তারও তলায় সিসের পাত লাগান, হাতে নিন নীরেট সিসের থলি। ব্যাস, আর দেখতে হবে না। বন্দী জীবন ছেড়ে আবার বাইরে বেরোতে পারবেন। এমন কি, ভ্রমণেও যেতে পারেন—

আরো ভালো একটা কথা মাথায় এলো। বললাম, জাহাজ-ডুবির ভয়ও আর আপনার রইলো না। কিছু জামাকাপড়, আর

নিতান্ত প্রয়োজনীয় মালপত্র কিছু নিয়ে বাকি সব ফেলে দিন, সোজা আকাশে ভেসে যাবেন—

উচ্ছ্বাসের মাথায় হঠাৎ তার হাত ফস্কে হাতুড়িটা পড়ে গেলো। আর-একটু হলেই আমার মাথায় পড়েছিলো আর কি !

বলেন কী মশাই, আবার আমি ক্লাবে যেতে পারবো !

সঙ্গে সঙ্গে আমার উৎসাহ নিবে এলো। অস্ফুটভাবে বললাম, হ্যাঁ, তা পারবেন বৈকি।

ও ক্লাবে আসতে পারলো। নিয়মিতই আসছে আবার। আমার পেছনে বসে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে ; মাখন-মাখানো রুটি, চা,—এবার নিয়ে তিনবার হলো। ওর যে ওজন বলতে প্রায় কিছুই নেই, ও যে খানিকটা উদর-সর্বস্ব মাংসের পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয় , পোশাকে ঢাকা খানিকটা চর্বি শুধু, মানুষের মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ, অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর,—সেই স্ত্রীলোকটি আর আমি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। বসে-বসে লক্ষ্য করছে, কখন আমার লেখা শেষ হবে। সুবিধে পেলেই আমার পথরোধ করবে, সমুদ্রের মতো সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপরে।···

ও কেমন বোধ করছে, ও কেমন বোধ করছে না, মাঝে মাঝে ওর কেমন মনে আশা হয় ও-ভাব যেন একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে,—বারবার এসব কথা আমায় শোনাবে, আর থেকে-থেকে জিজ্ঞেস করবে,—ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন তো ? কেউ যদি জানতে পারে তো বড় লজ্জার কথা হবে কিন্তু !

···বেশ বোকা-বোকা দেখায় ওকে—ছাদের তলায় ওভাবে গুঁড়ি মেরে ভেসে বেড়ানো—

আমার আর দরজার মাঝখানে ঘাঁটি আগলে ও বসে রয়েছে। ওকে এড়িয়ে কী করে যাবো তাই ভাবছি।

অনুবাদ—নমিতা চক্রবর্তী

শব-শিকারী

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

সারা বছর ধরে প্রতিটি রাত ডেভেনহামে আমরা চারজন—গোরস্থানের তত্ত্বাবধায়ক জর্জ, বাড়িওলা, ফেটিস আর আমি—জর্জের ঘরে বসে গল্প করতাম। কখনো-কখনো হয়তো আরো কয়েকজন এসে জড়ো হতেন, কিন্তু ঝড়ই হোক, তুষারই পড়ুক আর শিলাবৃষ্টিই হোক—আমরা চারজন আমাদের নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে বসতামই। ফেটিস ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক; বৃদ্ধ, মাতাল, বেশ শিক্ষিত এবং কিছু ধন-সম্পত্তির মালিক—কারণ আলসেমিতেই তাঁর দিন কাটতো। অনেক বছর আগে, যখন যুবক, তখন ফেটিস ডেভেনহামে আসেন এবং এখানে বাস করতে করতেই এই সহরের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। তাঁর নীল ক্যামলেট ক্লোক এ সহরের এক বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস। জর্জের ঘরে তাঁর নিয়মিত বসা, গির্জেয় তাঁর না-যাওয়া, তাঁর পুরোনো কয়েকটি বদ দোষ—সব ব্যাপারই অবশ্য ডেভেনহামের আলোচ্য। আমরা তাঁকে ডাক্তার বলে ডাকতাম, কারণ ওষুধপত্তর সম্বন্ধে তাঁর একটু বিশেষ রকমের জ্ঞান ছিলো এবং ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া বা সরে-যাওয়া হাড়কে ঠিকভাবে বসাতে তাঁকে দেখা গেছে। কিন্তু এই সামান্য ক-টি ব্যাপার ছাড়া তাঁর চরিত্র কিংবা তাঁর বিগত দিনের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের আর কোনো জ্ঞান ছিলো না।

এক অন্ধকার শীতের রাত। বাড়িওলা আমাদের সঙ্গে এসে বসার কিছুক্ষণ আগে ন-টা বেজে গেছে। আশে-পাশের এক বিখ্যাত জমিদার পার্লামেণ্টে যাবার পথে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে

আক্রান্ত হয়ে জর্জের বাড়িতে এসে ওঠেন। লণ্ডনের তাঁর বিখ্যাত চিকিৎসককে টেলিগ্রাফ করা হয়েছে। ডেভেনহামের ইতিহাসে এই প্রথম এ-ধরনের একটা ব্যাপার ঘটতে দেখা গেলো—কেন না, মাত্র কদিন হলো রেলপথ খুলেছে এবং আমরা সকলেই হঠাৎ এই ঘটনায় কিছু-না-কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছি।

পাইপে তামাক ভরে আগুন জ্বালিয়ে বাড়িওলা বললেন—উনি এসেছেন!

উনি? আমি বললাম,—কে, ডাক্তার?

হ্যাঁ।

ওঁর নাম কী?

বাড়িওলা উত্তর দিলেন, ডক্টর ম্যাকফারলেন।

ফেটিস এতক্ষণে তিন পেগ মদ খেয়ে ফেলেছেন, বোকার মত কখনো ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখছেন, কখনো বা এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছেন; আমাদের শেষ কথাটায় তিনি যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন এবং 'ম্যাকফারলেন' নামটা দু-বার আপন মনে উচ্চারণ করলেন—একবার ধীরে ধীরে, কিন্তু দ্বিতীয়বার হঠাৎ চমকে উঠে।

বাড়িওলা বললেন, হ্যাঁ, ঐ তাঁর নাম। ডক্টর ওল্‌ফ ম্যাকফারলেন।

ফেটিস সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতিস্থ হলেন; তাঁর চোখ জ্বলে উঠলো, স্বর পরিষ্কার, জোরালো, ধীর স্থির, ভাষা তীক্ষ্ণ ও আন্তরিক হয়ে উঠলো। তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তনে আমরা চমকে উঠলাম, মনে হলো যেন একটা মৃতদেহ বেঁচে উঠেছে।

তিনি বললেন, মাপ করবেন, আমি আপনাদের কথাবার্তায় বিশেষ মন দিই নি। এই ওল্‌ফ ম্যাকফারলেন কে? তারপর বাড়িওলার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে সে বলে উঠলো, না না!

এ হতে পারে না, কখনো হতে পারে না! কিন্তু তবু আমি ওকে একবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখতে চাই।

একটা ঢোক গিলে জর্জ জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি ওঁকে চেনেন, ডাক্তার?

উত্তর হলো, ভগবান না করুন! কিন্তু তবু কী আশ্চর্য, সেই এক নাম; ঠিক এ-ধরনের দুটি নাম কল্পনা করা যায় না। বলতে পারেন, লোকটি কি বৃদ্ধ?

বাড়িওলা বললেন, সত্যি কথা বলতে গেলে তাঁর বয়স খুব অল্প নয়, তাঁর চুলও সব সাদা; কিন্তু তাঁকে আপনার চেয়ে ছোট দেখায়।

আমার চেয়ে অনেক—অনেক বড়, টেবিল চাপড়ে ফেটিস উঠে বললেন, আমার এ-অবস্থার জন্য দায়ী মদ আর পাপ। এই লোকটির হয়ত বিবেক খুব পরিষ্কার, আর হজমশক্তিও ভালো। বিবেক! হয়তো আপনারা মনে করবেন যে এক সময় আমি খুব ধার্মিক, ভালো খৃষ্টান ছিলাম, নয় কি? কিন্তু না, আমি কোনোদিন তা ছিলাম না। আমি গির্জেয় যেতাম না; হয়তো আমার অবস্থায় পড়লে ভল্টেয়ার গির্জেয় যেতেন—কিন্তু এই মাথা, এই বুদ্ধি—এক সময় পরিষ্কার, কর্মঠ ছিলো। আমি সব দেখতাম, কিন্তু কোনো কিছু মেনে নিতাম না।

কিছুক্ষণ ভীতিকর নীরবতার পর আমি ধীরে ধীরে বললাম, আপনি যদি এই ডাক্তারকে চেনেন, তবে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে যে আপনিও আমাদের বাড়িওলার মতো এই ডাক্তার সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা পোষণ করেন না।

ফেটিস আমার কথায় কোনো কান দিলেন না।

হঠাৎ বললেন, ঠিক আছে। আমি লোকটাকে সামনাসামনি একবার দেখতে চাই।

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ, তারপর হঠাৎ দোতলার একটা দরজা সজোরে বন্ধ হলো এবং সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলো।

বাড়িওলা চিৎকার করে উঠলেন, ঐ যে ডাক্তার। তাড়াতাড়ি করলে এখনো হয়তো ওকে ধরা যেতে পারে।

সেই ছোট বাইরের ঘর থেকে জর্জ ইনএর দরজা মাত্র ছু-পায়ের পথ। ওক কাঠের সিঁড়িটা একেবারে প্রায় রাস্তায় গিয়ে নেমেছে—সিঁড়ি আর বাইরের দরজার চৌকাটের মধ্যে শুধু একটা টার্কিশ গালিচা ছাড়া আর কিছু নেই। আর এই জায়গটুকু শুধু যে সিঁড়ির ওপরের আলোতেই ঝক্‌মক্‌ করতো তা নয়, বার-রুমের জানলা দিয়েও আলোর হাসি ঠিকরে পড়ে এ-জায়গাটাকে উজ্জ্বল করে তুলতো। ফেটিস ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে-পেছনে গিয়ে তাঁদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখলাম। ডক্টর ম্যাকফারলেন খুব সরল এবং সপ্রতিভ। তাঁর পাংশু অথচ দৃঢ়বদ্ধ মুখের ওপর সাদা চুল সুন্দরভাবে সাজানো। গায়ে তাঁর দামী শুচিশুভ্র পোশাক, দামী সোনার ঘড়ির চেন, চোখে সোনার চশমা এবং হাতে একটা দামী ফারের লম্বা কোট। তাঁকে দেখে মনে হয় যে তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যেই এতো বড় হয়ে উঠেছেন এবং আমাদের সেই টাক-মাথা, নোংরা, কোঁচকানো পুরোনো ক্যামলেট কোট-পরা বন্ধুটিকে সিঁড়ির নিচে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখে আমাদের কেমন যেন বিসদৃশ লাগছিলো।

একটু জোরেই, ঠিক বন্ধুর মতো নয়, তিনি ডাকলেন,—ম্যাকফারলেন !

বিখ্যাত ডাক্তারটি এই অনভ্যস্ত অন্তরঙ্গ ডাকে চতুর্থ সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন—মনে হলো কিছুটা আশ্চর্য এবং কিছুটা ক্ষুণ্ণ বোধ করলেন।

টডি ম্যাকফারলেন! ফেটিস আবার ডাক দিলেন।

লণ্ডনের ডাক্তারটি টলতে টলতে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। পলকের জন্য একবার সামনে এবং পরমুহূর্তে একবার তাঁর পেছন দিকে তিনি তাকিয়ে নিলেন। তারপর ভয়-বিস্মিত কণ্ঠে ফিস-ফিসিয়ে বললেন, ফেটিস! তুমি?

হ্যাঁ, আমি! ফেটিস উত্তর দিলেন। তুমি কি মনে করেছিলে আমিও মারা গেছি? আমাদের বন্ধুত্ব কি এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার?

চুপ! চুপ! ডাক্তার বলে উঠলেন। তোমার আমার এই দেখা এমন আশ্চর্য, আশাতীত—মানে, তোমার এই চেহারায়,—সত্যি কথা বলতে গেলে, তোমাকে প্রথমে আমি ঠিক চিনতে পারিনি। কিন্তু আমি খুব আনন্দিত—সত্যিই তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। কিন্তু এখনকার মতো ভাই আমি চলি, কেননা আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে এবং ট্রেন ফেল করা আমার চলবে না। কিন্তু তুমি—হ্যাঁ, তুমি তোমার ঠিকানাটা আমায় দাও, আমি শিগগিরই তোমাকে খবর দেবো। মনে হচ্ছে তোমার এখন দিন বিশেষ ভালো যাচ্ছে না—তোমার জন্যে একটা কিছু করতেই হবে আমাদের। ফেটিস, আমাদের সেই পুরোনো দিনের কথা মনে করে তোমার জন্যে কিছু করা উচিত, নয় কি?

টাকা? ফেটিস চিৎকার করে উঠলেন, তোমার কাছ থেকে টাকা? তোমার কাছ থেকে যে টাকা আমি নিয়েছিলাম তা সেই বৃষ্টির মধ্যে যেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম সেখানেই পড়ে রয়েছে!

ডক্টর ম্যাকফারলেন এতক্ষণ বেশ একটু জোরের সঙ্গে মুরুব্বির ভাব নিয়ে কথা বলছিলেন, কিন্তু ফেটিসের এই তীব্র প্রত্যাখ্যান আবার তাঁকে একটু বিড়ম্বিত করে তুললো।

তাঁর কমনীয় মুখের উপর দিয়ে এক কুৎসিত এবং বীভৎস ছায়া খেলে গেলো। তিনি বললেন, ভাই, তুমি যা খুশি তাই মনে করতে পারো, যদিও তোমাকে আঘাত দেওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আমি কারও ব্যাপারে মাথা গলাতে চাই না। তবুও, আমি তোমাকে আমার ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি—

আমি চাই না, আমি জানতে চাই না তোমার ঠিকানা! ফেটিস বাধা দিলেন,—আমি তোমার নাম শুনলাম, মনে হলো, হয়ত তুমিই হবে। জানতে ইচ্ছে করলো, সত্যি-সত্যিই ভগবান আছেন কি না! এখন জানলাম, ভগবান নেই। যাও!

ফেটিস তবুও সিঁড়ি আর দরজার মাঝের গালিচার ওপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যে লণ্ডনের বিখ্যাত ডাক্তারকে যেতে হলে একধারে সরে যেতে হবে। এই অবমাননাকর অপসরণের পূর্বে তিনি একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর পাংশু মুখে, চোখের কোনে এক ভয়ঙ্কর দৃষ্টি ফুটে উঠলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তিনি বুঝতে পারছিলেন যে সদর দরজার আড়াল থেকে তাঁর গাড়ির গাড়োয়ান এই অভাবনীয় দৃশ্য উপভোগ করছে, সেইসঙ্গে জর্জের ছোট্ট ঘরে আমাদের সকৌতূহল অবস্থিতিও তাঁকে বিচলিত করে তুলছিলো। এতজন সাক্ষীর উপস্থিতির জন্য তিনি চলে যাওয়াই সমীচীন মনে করলেন। একদিকে কাত হয়ে নিচু হয়ে সাপের মতো ছিটকে দরজার দিকে দৌড় দিলেন; কিন্তু তাঁর দুর্দশা তখনও শেষ হয় নি। ফেটিস তাঁর বাহু শক্ত করে ধরে স্পষ্ট, ধীর স্বরে বললেন, তুমি কি আবার তা দেখেছো!

লণ্ডনের বিখ্যাত ধনী ডাক্তার জোরে চিৎকার করে উঠলেন; তাঁর প্রশ্নকর্তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দুই হাতে মাথা চেপে ধরা-পড়া চোরের মত ছুটে পালিয়ে গেলেন। আমাদের কারুর নড়বার আগেই তাঁর গাড়িটা স্টেশনের দিকে জোরে ছুটতে শুরু করেছে।

স্বপ্নের মত ব্যাপারটা ঘটে গেলো, কিন্তু এই স্বপ্ন গালিচার ওপর তার প্রমাণ আর চিহ্ন রেখে গেছলো। পরদিন চাকর চৌকাটের ওপর তাঁর ভাঙা সোনার চশমাটি কুড়িয়ে পায়। আমরা বাররুমের জানলার ধারে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলাম ; আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ফেটিস—আরো গম্ভীর, পাংশু এবং একাগ্র।

বাড়িওলাই প্রথম সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন, ভগবান রক্ষা করুন, মিঃ ফেটিস! এসব কী ব্যাপার? আপনি কী সব অদ্ভুত কথা বলছিলেন?

ফেটিস আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেককে একবার ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর বললেন, আপনারা কোনো কথা গোপন রাখতে পারেন কি না দেখা যাবে। এই ম্যাকফারলেন লোকটির মুখোমুখি হওয়া খুব সহজ কথা নয়! যারা মুখোমুখি হয়েছে, সবাই অনুতাপ করেছে, কিন্তু তা অত্যন্ত দেরিতে।

তারপর কাউকে বিদায় না জানিয়ে, এমনকি আমাদের দুজনের জন্য অপেক্ষা না করেই হোটেলের আলোর নিচে দিয়ে দূর অন্ধকার রাতের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

গনগনে আগুন আর চার মোমবাতির স্বচ্ছ আলোয় আমরা তিনজন বাইরের ঘরে আমাদের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। পূর্বানুষ্ঠিত ঘটনাটি যতোই আমরা পর্যালোচনা করতে লাগলাম ততোই বিস্ময় কেটে গিয়ে কৌতূহলে দাঁড়াতে লাগলো। আমরা সাধারণত অনেক রাত পর্যন্ত বসতাম, কিন্তু সেই রাতেই সবচেয়ে আমরা বেশিক্ষণ বসেছিলাম। যাওয়ার আগে আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলাম এবং স্থির হলো যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যেককে প্রমাণ করতে হবে। আমাদের এই অবহেলিত বন্ধুর অতীত, এবং যে গোপন রহস্য সে ও লণ্ডনের বিখ্যাত ডাক্তারই শুধু জানতো—তা খুঁজে বের করা ছাড়া তখন

আর আমাদের অন্য কোনো কাজ ছিলো না। গর্ব করার মতো নয়, কিন্তু জর্জ ইন-এর অন্য তুজনের চেয়ে আমি একটু ভালোভাবে গুছিয়ে গল্প বলতে পারতাম এবং হয়ত এখন আর আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো লোক জীবিত নেই যে আপনাদের কাছে এই ঘৃণ্য এবং অসাধারণ কাহিনী বলতে পারে।

যৌবনে ফেটিস এডিনবরার স্কুলে ডাক্তারি পড়তেন। তাঁর এক অদ্ভুত প্রতিভা ছিলো—তিনি যা শুনতেন তা-ই বুঝতে পারতেন এবং নিজের মতো করে চিরকালের জন্য মনে রাখতে পারতেন। বাড়িতে পড়াশোনা করতেন খুব কম: কিন্তু তিনি নম্র, মনোযোগী এবং মেধাবী ছিলেন। তাঁর শিক্ষকেরা শিগগিরই তাঁকে মনোযোগী ও বুদ্ধিমান ছাত্র হিসেবে চিনে নিলেন; আর আমি প্রথম শুনে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম যে তাঁর সুঠাম দেহ দেখে সে-সময়ে সকলেই তাঁকে একটু খাতির করতো। সে-যুগে এ্যানাটমির এক অদ্ভুত-প্রকৃতির শিক্ষক ছিলেন, তাঁকে আমি 'কে'—নামেই ডাকবো। তাঁর তখন প্রচুর নামডাক ছিলো।

মিঃ কে—তখন তাঁর ব্যবসার চরম শীর্ষে; তাঁর অত জনপ্রিয় তার কারণ ছিলো কিছুটা তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, আর কিছুটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের অকর্মণ্যতা। ফেটিস এবং অন্যান্য ছাত্রদের এই বিশ্বাস ছিল যে এই অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তির অনুগ্রহেই তাঁদের এই সাফল্য। মিঃ কে—একজন অত্যন্ত সুশিক্ষক এবং বড় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর এই দ্বৈত ভূমিকাতেই ফেটিস তাঁর দৃষ্টিতে পড়েন এবং স্কুলের দ্বিতীয় বছরেই তিনি তাঁর ক্লাসে দ্বিতীয় ডেমনস্ট্রেটর বা সহকারী হয়ে ওঠেন।

এই সহকারী হিসেবেই লেক্‌চার এবং অপারেশন ঘরের ভার তাঁর ওপর পড়ে। ঘরদোরের পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য ছাত্রদের

কার্যকলাপের জন্য তাঁকেই কৈফিয়ৎ দিতে হতো এবং তাঁর আর-এক কাজ ছিলো, লেকচার-ঘরের জন্য সমস্ত জিনিস আনা, দেওয়া ও ভাগ করা। শুধু এই শেষের ব্যাপারটির জন্যই মিঃ কে—তাঁকে প্রথমে একই ওয়ার্ডে, পরে শব-ব্যবচ্ছেদের ঘরের সঙ্গে একই বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানে শীতের গভীর রাতে, ঘুম-কাতর চোখে উঠে জঘন্য চরিত্রের শব সরবরাহকারীদের কাছ থেকে শব নিতে হতো। সারা দেশে এরা অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিলো, তবু তাদের জন্য চুপি-চুপি দরজা খুলে তাদের কাঁধের বোঝা নামিয়ে তাদের টাকা দিয়ে সেই ঘরে মানব-জীবনের অবান্ধব স্মৃতি নিয়ে একা জেগে রাত কাটাতে হতো। এই অবস্থার মধ্যে থেকেই তাঁকে দু-এক ঘণ্টা গড়িয়ে নিয়ে রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি দূর করে সারাদিনের পরিশ্রমের জন্য তৈরি হতে হতো।

মর-জগতের এই বিচিত্র জীবনের মধ্যে থেকে খুব কম ছেলেই অচঞ্চল থাকতে পারতো। কিন্তু তাঁর মন সমস্ত বিবেচনার পথ রুদ্ধ করে রেখেছিলো। অন্যের ভাগ্যের সম্বন্ধে তাঁর কোনো চিন্তা ছিলো না, তাঁর নিজের কামনা এবং উচ্চাভিলাষ নিয়েই তিনি মগ্ন ছিলেন। তিনি চাইতেন তাঁর শিক্ষক এবং সহপাঠিদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র ব্যবহার—তাই তিনি ভালো করে পড়াশুনো করতে আনন্দ পেতেন এবং দিনের পর দিন তাঁর মনিব মিঃ কে—র জন্য ত্রুটিহীন ভাবে কাজ করে যেতেন। তাঁর এই দিনের কাজের শেষে রাতে তিনি মদ্যপানে আনন্দ পেতেন এবং যখন দুদিকের ওজন সমান হতো, তাঁর বিবেক শান্ত হতো।

শব-সংগ্রহ ক্রমে তাঁর এবং তাঁর শিক্ষকের কাছে এক চিরন্তন সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। এত বড় এবং ব্যস্ত ক্লাসে এ্যানাটমি শিক্ষার জন্য শব প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হয়ে যেতো; যার ফলে এই ব্যাপার যে অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ালো তাই নয়, যারা এই

ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত তাদের প্রত্যেকের কাছেই মারাত্মক হয়ে উঠলো। মিঃ কে—র নিয়ম ছিলো, এই ব্যবসায় কাউকে কোনো প্রশ্ন না করা। তিনি বলতেন, তারা শব আনে, আমরা দাম দিই। কাউকে যে হত্যা করে শব আনা হয় নি, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিলো না। এ ধারণা যদি তাঁর একবার মনে হতো, তবে তিনি হয়ত ভয়ে শিউরে উঠতেন, কিন্তু এরকম এক ভয়ঙ্কর ব্যাপারটাকে তিনি এমন লঘুভাবে নিতেন যে তা ভদ্রতা-বহির্ভূত বলে মনে হতো এবং এই ব্যবসায়ীদের লোভ দেখাতো। ফেটিসের মাঝে মাঝে মনে হতো, শবগুলি অত্যন্ত তাজা। শেষ রাত্রের এই অতিথিদের বীভৎস গুণ্ডার মতো চেহারা দেখে তাঁর প্রায়ই এই ব্যাপারে সন্দেহ হতো। তিনি বুঝতেন তাঁর কাজের মাত্র তিনটি ব্যাপার ; যা আনা হবে তা গ্রহণ করা, তার জন্য দাম দেওয়া এবং কোনো অপরাধের চিহ্ন থাকলে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া।

এক নভেম্বরের প্রত্যুষে এই নিয়ম তীব্র পরীক্ষার সম্মুখে উপস্থিত হলো। দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণায় ফেটিস সারারাত জেগে ঘরময় অস্থির পায়চারি করছেন—পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতো একবার করে বিছানায় আছড়ে পড়ছেন আর একবার উঠছেন। এইভাবে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটু তন্দ্রার মত এসেছিলো। হঠাৎ তাঁর ঘুম তৃতীয় ও চতুর্থবারের সঙ্কেত-ধ্বনিতে ভেঙে গেলো। বাইরে ঠাণ্ডা চাঁদের আলো, ঝড় আর তুষার। সহর এখনো জাগেনি, কিন্তু কর্মব্যস্ত দিনের চিহ্ন ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে। এই দুর্বৃত্তেরা সেদিন একটু দেরিতেই এসেছে এবং মনে হলো তারা তাড়াতাড়ি চলে যেতে অত্যন্ত ব্যস্ত। ফেটিস ঘুম-চোখে সিঁড়ির আলো জ্বালিয়ে দিলেন ; স্বপ্নের মতো তাদের অনুযোগ তাঁর কানে বাজতে লাগলো। যখন তারা তাদের সেই পণ্য বস্তা থেকে বার করে রাখলো তখন তিনি দেয়ালে হেলান

দিয়ে ঢুলছেন। তাদের টাকা দেওয়ার জন্য তিনি নিজেকে সজোরে ঝাড়া দিয়ে উঠলেন এবং তাঁর চোখ মড়ার ওপর পড়লো। তিনি চমকে উঠলেন এবং আলো বাড়িয়ে দু-পা এগিয়ে গেলেন।

হা ভগবান! তিনি চিৎকার করে উঠলেন,—এ যে জেন গ্যালব্রেইথ!

তারা কোনো কথা না বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো।

তিনি বলে চললেন, শোনো। আমি একে চিনি। কাল পর্যন্ত এই মেয়েটি বেঁচে ছিলো। তার হঠাৎ মরা অসম্ভব; তোমরা যে তার শব সৎভাবে জোগাড় করেছো—এ একেবারে অসম্ভব।

তাদের মধ্যে একজন বললো, আপনি একেবারেই ভুল করছেন মশাই। আর-একজন তার মুখের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সঙ্গে-সঙ্গেই টাকা চাইলো।

এই ভীতিকে উপেক্ষা করা বা বিপদকে ছোট করে দেখা সম্ভব ছিলো না। ভয়ে ফেটিস পাংশু হয়ে গেলেন। কয়েকটা আজে-বাজে কথা বলে, টাকা গুনে দেওয়ার পর তারা চলে গেলো। তারা চলে যাওয়া মাত্রই তিনি সন্দেহ নিরসনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রায় এক ডজন সন্দেহাতীত আঘাতের চিহ্নে এইটুকু পরিস্ফুট হলো যে, মেয়েটিকে সেই রাত্রে হত্যা করা হয়েছে। ভয়ে বিহ্বল হয়ে তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর এই আবিষ্কারটি সুস্থমস্তিষ্কে চিন্তা করতে লাগলেন এবং এইরকম কঠিন ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি করার বিপদ সম্বন্ধে মিঃ কে—র উপদেশও স্মরণ করলেন; তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি তাঁর ঠিক ওপরের সহকর্মীর উপদেশের জন্য অপেক্ষা করাই স্থির করলেন।

ইনি হলেন এক তরুণ ডাক্তার, ওল্‌ফ ম্যাকফারলেন। ডানপিটে ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়, চালাক এবং যেকোনো রকমের প্রতারণায় সিদ্ধহস্ত। তিনি বহু দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং

বিদেশেই পড়াশোনা করেছেন। চমৎকার তাঁর ব্যবহার, হয়ত অন্যের চেয়ে তিনি একটু বেশি অগ্রসর। মঞ্চের ব্যাপারে তিনিই শেষ কথা ; স্কেটিং বা গল্‌ফ খেলায় তিনি পারদর্শী ; অত্যন্ত সৌখীন তাঁর বেশভূষা এবং তাঁর এই গৌরবকে শীর্ষে নিয়ে গেছলো এক তেজস্বী ঘোড়া আর গাড়ির অস্তিত্ব। ফেটিসের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিলো ; তাঁদের এক ধরনের কাজ তাঁদের জীবনধারার মধ্যে কিছুটা সাম্য এনে দিয়েছিলো। যখন শব দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠতো তখন তাঁরা দুজন ম্যাকফারলেনের গাড়িতে করে কোনো এক নির্জন কবর-খানায় যেতেন এবং ভোরের আগেই তাঁদের মাল নিয়ে শব-ব্যবচ্ছেদের ঘরের দরজায় ফিরে আসতেন।

ঠিক সেদিনই ম্যাকফারলেন অন্য দিনের চেয়ে একটু তাড়া-তাড়ি এসেছিলেন। ফেটিস তাঁর পায়ের শব্দ শুনে সিঁড়ির ওপরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা বলে বিপদের কারণটা দেখালেন। ম্যাকফারলেনও দেহের সমস্ত চিহ্ন দেখলেন।

মাথা নেড়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখে ব্যাপারটা একটু গণ্ডগোলের বলেই মনে হচ্ছে।

তবে আমি কী করবো ? ফেটিস জিজ্ঞাসা করলেন।

করবে ? ম্যাকফারলেন বললেন, তুমি কি কিছু করতে চাও ? আমার মনে হয়, যতো কম কথা বলবে, ততো তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চাপা পড়বে।

ফেটিস বললেন, কিন্তু কেউ হয়তো ওকে চিনতে পারবে। ক্যাস্‌ল রকে ওকে প্রায় সকলেই চেনে।

আশা করি তা হবে না। আর যদি তা হয়ই, তুমি তো আর করো নি—তবেই সব শেষ। ব্যাপারটা হলো এই যে, এ-ধরনের ঘটনা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। যদি ব্যাপারটা ঘুলিয়ে তোলো তো মিঃ কে—কে সবচেয়ে বেশি বিপদের মধ্যে ফেলবে।

তুমিও খুব বিপদে পড়বে, আর আমিও। এক-একবার মনে হয়, কোনও খৃষ্টান কাঠগড়ায় দাঁড়ালে আমাদের কেমন দেখাবে, আর আমাদের হয়ে আমরা কী ছাই বলবো! আমার কথা বলতে গেলে, একটা কথা অত্যন্ত সত্য—ঠিক কথা বলতে গেলে আমাদের প্রত্যেকটি শবদেহই হত্যা করে আনা।

ম্যাকফারলেন! ফেটিস চিৎকার করে উঠলেন।

থামো থামো! উনি ধমকে উঠলেন। যেন তুমিই এর আগে তা সন্দেহ করতে না!

সন্দেহ করা এক কথা—

আর প্রমাণ আর-এক কথা। হ্যাঁ, তা আমি জানি। এই শবটি এখানে আনা উচিত হয় নি। শবটিকে তাঁর বেত দিয়ে নাড়া দিয়ে বললেন, আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে এ-সম্বন্ধে কোনো চিন্তা না করা এবং এটিকে চিনতে না পারা। আর, আমি একে চিনতে পারছিও না। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি চেনো—আমি তোমাকে জোর করবো না। কিন্তু আমার মনে হয় যে-কোনো লোক ঠিক আমার মতো কাজই করবে, এবং এইটুকু আমি বলতে পারি যে মিঃ কে—ও আমাদের কাছে ঠিক এই রকমই আশা করবেন। কথাটা হচ্ছে, কেন তিনি আমাদের দুজনকেই তাঁর সহকারী হিসাবে বেছে নিলেন? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, তিনি বাক্যবাগীশ কাউকে চান নি।

ফেটিসের মতো ছেলেকে শান্ত করতে এধরনের কথাবার্তাই যথেষ্ট। তিনি ম্যাকফারলেনের কথামতো চলতেই রাজি হলেন। এই দুর্ভাগা মেয়েটির শব-ব্যবচ্ছেদও হলো এবং কেউ তাকে চিনতে পেরেছে বলে মনেও হলো না।

এক বিকেলে দিনের কাজের পর ফেটিস একটি জনপ্রিয় সরাইখানায় গিয়ে ম্যাকফারলেনকে একটি অপরিচিত লোকের

সঙ্গে বসে কথা বলতে দেখলেন। লোকটি বেঁটেখাটো, রুগ্ন: কয়লা-কালো তার চোখ। তার দেহের গড়ন দেখে তাকে বুদ্ধিমান এবং বেশ ভব্য মনে হলেও তার হাবভাবে তা বিশেষ প্রকাশ পায় না। কারণ দেখে তাকে গ্রাম্য, অসভ্য ও বোকা বলে মনে হলেও কিন্তু সে ম্যাকফারলেনের ওপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে মনে হলো। খাবারের অর্ডার দিচ্ছে ঠিক গ্রেট ব্যাশ-র মতো; একটু দেরি হলেই রেগে উঠছে, আদেশ মান্য করার ভঙ্গী দেখে কঠোর সমালোচনা করছে। লোকটি ফেটিসকে দেখে সঙ্গেসঙ্গেই পছন্দ করে ফেললো এবং তাঁকে প্রচুর মদ খাইয়ে নিজের অতীত জীবনের অনেক গোপন কথা বলে কৃতার্থ করলো। সে যা বললো তার দশ ভাগের একভাগও যদি সত্য হয় তবে সে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য বদমাইস, এবং তার মতো অভিজ্ঞ লোকের দৃষ্টিতে পড়ায় ফেটিসের একটু গর্বও হলো।

লোকটি বললো, আমি একটা বদ লোক, কিন্তু ম্যাকফারলেনই হলো ওস্তাদ—আমি ওকে টডি ম্যাকফারলেন বলে ডাকি। টডি, তোমার বন্ধুর জন্য আর-এক গ্লাস অর্ডার দাও। পরে আবার বললো, টডি, উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দাও। আবার হয়তো বললো, টডি আমাকে ঘৃণা করে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই; টডি, তুমি সত্যিই ঘৃণা করো।

ম্যাকফারলেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, ঐ বদখৎ নামে তুমি আমাকে ডাকবে না!

শোনো কথা! ছেলেদের ছুরি খেলা দেখেছো? আমার সমস্ত শরীরের ওপর টডি ঐ রকম করতে চাইবে, অপরিচিত লোকটি বললো।

ফেটিস বললেন, আমরা ডাক্তাররা ওর চেয়ে ভালো খেলা জানি। যে মরা বন্ধুকে পছন্দ করি না, তার দেহ আমরা ব্যবচ্ছেদ করি।

ম্যাকফারলেন চমকে উঠে তাকালেন, যেন এই কথাটাই তাঁরও মনে এখনি জেগেছিলো।

বিকেলটা কেটে গেলো। সেই অপরিচিত লোকটি,—তার নাম গ্রে—ফেটিসকে ডিনার খেতে নিমন্ত্রণ করলো এবং এমন ভয়ঙ্কর খাবারের সে অর্ডার দিলো যে সরাইখানায় একেবারে হুলুস্থুল পড়ে গেলো। যখন সব শেষ হলো তখন ম্যাকফারলেনকে টাকা মিটিয়ে দিতে অর্ডার দিলো। অনেক রাতে যখন তাঁরা বিদায় নিলেন, গ্রে তখন বদ্ধ মাতাল। তার মাতলামিতে, আর অর্থক্ষয়ে ম্যাকফারলেন গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। ফেটিসের মাথায় তখন নানা রঙের পানীয়ের সঙ্গীত বাজছে, পা টলছে এবং মন কোন্ দূর দেশে ভেসে বেড়াচ্ছে। পরদিন ম্যাকফারলেন ক্লাসে অনুপস্থিত হলেন এবং গ্রের সঙ্গে হোটেল থেকে হোটেলে ঘুরতে হচ্ছে মনে করে মনে মনে ফেটিস হাসলেন। যে মুহূর্তে তিনি ছুটি পেলেন, সেই মুহূর্তে তিনি গত রাতের বন্ধুদুটির খোঁজে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তাঁদের খুঁজে পেলেন না; তাই সকাল-সকাল ফিরে এসে একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ে পরম সুখে নিদ্রা দিলেন।

ভোর চারটের সময় এক পরিচিত সঙ্কেতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো। সিঁড়ি বেয়ে দরজার কাছে নেমে ম্যাকফারলেনকে তাঁর গাড়ি নিয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। গাড়িতে তাঁর অতি পরিচিত সেই বীভৎস লম্বা পোঁটলা—!

এ কী? তিনি চিৎকার করে উঠলেন, তুমি কি একলাই বার হয়েছিলে! কী করে তুমি সামলালে?

এক ধমকে ম্যাকফারলেন তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে আদেশ করলেন। দুজনে মিলে সেই শবটি ওপরে এনে টেবিলের ওপর রাখার পর ম্যাকফারলেন চলে যাওয়ার

উপক্রম করলেন। তারপর একটু থেমে খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, একবার ভালো করে মুখটা দেখে নাও। ফেটিস তাঁর মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ম্যাকফারলেন আর-একবার বললেন, একবার দেখে নিলে ভালোই করতে।

কিন্তু অন্যজন চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু কোথায়, কেমন করে, কখন তুমি একে পেলে?

ওর মুখটা একবার ছাখো শুধু। এই উত্তরই হলো।

ফেটিস হতবাক হয়ে গেছলেন, অদ্ভুত এক সন্দেহ তাঁকে পেয়ে বসলো। তরুণ ডাক্তারের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে একবার শবের ওপর রেখে আবার তাঁর দিকে তাকালেন। অবশেষে একটু ভয় পেয়ে তিনি ধীরে ধীরে আদেশ মতো কাজ করলেন। যে দৃশ্য দেখলেন ঠিক তাই-ই তিনি আশা করেছিলেন, তবু সে এক নিষ্ঠুর আঘাত। যাকে মাত্র কাল এক হোটেলে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখে এসেছেন, তাকে হঠাৎ মৃত্যুশীতল জড়তায় চটের ওপর উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেটিসের মনেও বিবেকের আতঙ্ক দেখা দিলো। তাঁর জানা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এই বরফ-শীতল টেবিলের ওপর এসে উঠতে দেখে তাঁর আত্মা শিউরে উঠলো। কিন্তু এসব চিন্তা তখন গৌণ। তাঁর প্রথম ভয় হলো ওল্‌ফকে নিয়ে। এরকম এক ভীষণ পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত তিনি কী করে যে তাঁর বন্ধুর মুখের দিকে তাকাবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি চোখ তুলতে সাহস পাচ্ছিলেন না, এবং একটা কথা বলার বা শব্দ করার ক্ষমতাও তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

ম্যাকফারলেনই প্রথমে কথা কইলেন। ধীরে ধীরে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর দৃঢ় হাত অতি ধীরে ফেটিসের কাঁধের ওপর রাখলেন। বললেন, রিচার্ডসন মাথাটা নিতে পারে।

রিচার্ডসন নামে ছাত্রটি শবের মাথা ব্যবচ্ছেদ করার জন্য

অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলো। এ-কথার কোন উত্তর এলো না। হত্যাকারী আবার বললে, ব্যবসার কথা ধরলে 'তোমার আমাকে এখন টাকা দেওয়া উচিত; তোমার হিসেব ঠিক থাকা চাই।

ফেটিস তাঁর স্বর ফিরে পেলেন, কিন্তু তা যেন প্রকৃত স্বরের প্রেতাত্মা। বললেন, তোমাকে টাকা দেবো? এর জন্য তোমাকে টাকা দিতে হবে?

কেন, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে দেবে। যেদিক দিয়েই ছাখো না কেন, তুমি আমাকে দিতে বাধ্য। আমি তোমাকে এমনিই এটা দিতে পারি না, তুমিও বিনা দামে এটা নিতে পারো না—তুজনেরই হিসেব তবে ঠিক থাকলো। এটা ঠিক জেন গ্যালব্রেইথের ব্যাপারের মতো। কোনো ব্যাপারে যতো বেশি গলদ থাকবে, ততো আমরা এমন ভাবে কাজ করবো যেন সেটা একেবারে নির্ভুল ছিলো। বুড়ো কে—কোথায় তাঁর টাকা রাখেন?

ঘরের কোনের আলমারিটা দেখিয়ে ভাঙা গলায় ফেটিস উত্তর দিলেন, ওখানে।

তবে আমাকে চাবিটা দাও, শান্ত ভাবে ম্যাকফারলেন হাত বাড়ালেন।

এক মুহূর্তের ইতস্ততের পর ফেটিস চাবিটা দিলেন। আঙুলের মধ্যে চাবিটা ধরে পরম স্বস্তির নিশ্বাসটা ম্যাকফারলেন চেপে রাখতে পারলেন না। আলমারিটা খুলে একটা তাক থেকে দোয়াত কলম ও একটি কাগজের খাতা এবং অপর জায়গা থেকে শবের দাম তিনি বের করে আনলেন।

এখন শোনো। তিনি বললেন, এই গেলো এর দাম—তোমার বিশ্বাসের প্রথম প্রমাণ, তোমার বাঁচবার প্রথম ধাপ। এখনি এটা তোমায় করতে হবে। তোমার খাতায় হিসেব লেখো, তাহলেই তুমি তুনিয়াকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারবে।

কয়েকটি মুহূর্ত ফেটিস দুঃসহ চিন্তায় বিভোর রইলেন, কিন্তু দুদিকের ভয় মিলিয়ে তাঁর কাছে বর্তমান ভয়কেই দূর করা যুক্তি-সঙ্গত মনে হলো। ম্যাকফারলেনের সঙ্গে বর্তমান বিরোধের চেয়ে ভবিষ্যৎ যেকোনো ভীতি কম অবাঞ্ছিত বলে মনে হলো। হাতের আলোটা টেবিলের ওপর রেখে ধীর স্থির হাতে খাতায় তারিখ, জিনিস এবং দাম লিখলেন।

ম্যাকফারলেন বললেন, এখন এই টাকাটা তোমারই পকেটে যাওয়া উচিত। আমি আমার ভাগ আগেই পেয়ে গেছি। ভালো কথা, আমার মতো লোকের যখন বরাত খোলে, তখন তার পকেটে কিছু এসে যায়। বলতে লজ্জা করে, তবু সব ব্যাপারেই একটা নিয়ম আছে। যথা, কাউকে খাওয়াতে নেই, দামী বই কিনতে নেই, পুরোনো ধার শোধ দিতে নেই ঃ ধার কোরো, ধার দিও না।

কিছুটা ভাঙা গলায় ফেটিস বললেন, ম্যাকফারলেন, তোমার জন্য আমি আমার গলা ফাঁসিকাঠে বাড়িয়ে দিয়েছি!

আমার জন্য! ওল্‌ফ চিৎকার করে উঠলেন,—আমি যতদূর বুঝি, তুমি আত্মরক্ষার জন্যই এই কাজ করেছো। ধরো আমি যদি বিপদে পড়ি, তুাম তখন কোথায় দাঁড়াবে? এই দ্বিতীয় ব্যাপারটা ঠিক প্রথম ব্যাপারটার থেকেই নেমে এসেছে। মিঃ গ্রে হলো মিস্ গ্যালব্রেইথেরই পরবর্তী ঘটনা। একবার শুরু করে তুমি থামতে পারো না। একবার শুরু করলে বরাবর চালিয়ে যেতে হবে, এই হলো একমাত্র খাঁটি সত্য। শয়তানের বিশ্রাম নেই।

এই বিভ্রান্ত ছাত্রটির হৃদয়-মন ভাগ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় ভীতিকর অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ভগবান! কিন্তু আমি কী করেছি? কখন আমি শুরু করলাম! ক্লাসের সহকারী হওয়ায় দোষ কোথায়? এই চাকরি খালি ছিলো,

যে-কেউ এ চাকরি নিতে পারতো। আমার আজ যে অবস্থা, তারও কি তাই হতো?

ম্যাকফারলেন বললেন, ভায়া হে, কী ছেলেমানুষ তুমি! তোমার ক্ষতিটা কী হয়েছে? মুখ বুজে থাকলে তোমার কী ক্ষতি হতে পারে? এ জীবনটা কেমন জানো? আমাদের মধ্যে দুটো জাত আছে—সিংহ আর ভেড়া। ভেড়ার দলে হলে তোমাকে গ্রে কিংবা গ্যালব্রেইথের মতো এখানে আসতে হবে, আর সিংহের দলে হলে মিঃ কে—র মতো, পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিমান লোকের মতো গাড়ি হাঁকাতে পারবে। তুমি এই ব্যাপারেই ঘাবড়ে গেছো, কিন্তু কে—র দিকে একবার তাকাও। তোমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে। আমি তোমাকে ভালোবাসি, কে—তোমাকে ভালোবাসেন। তোমার জন্ম হয়েছে সকলের ওপর সর্দারি করতে। আমি শপথ করে বলতে পারি যে একটা হাসির ব্যাপার দেখলে ছোট ছোট ছেলেরা যেমন হেসে গড়িয়ে পড়ে, তিন-চার দিনের মধ্যেই তুমিও এই ব্যাপারটার কথা মনে করে হাসিতে ফেটে পড়বে।

এই বলে ম্যাকফারলেন বিদায় নিলেন এবং সকাল হওয়ার আগেই গা-ঢাকা দেবার জন্য জোরে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। ফেটিস একা তাঁর সমস্ত দুঃখ নিয়ে বসে এই নিদারুণ বিপদের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর দুর্বলতার শেষ নেই এবং একটার পর একটা ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় তিনি ম্যাকফারলেনের ভাগ্য-বিধাতা হওয়ার পরিবর্তে তাঁরই বেতনভুক্ত, অপরাধের সঙ্গী হয়ে পড়ছেন। গ্যালব্রেইথের ঘটনা গোপন করা এবং হিসেবের বইয়ে এই জমা-খরচ রাখা তাঁর মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিলো।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো। ক্লাসের ছেলেরা এসে গেলো; এর শরীরের অংশগুলি এক একজনকে দেওয়া হলো এবং কেউ

কোনো কথা না বলে তা নিয়ে কাজ করলো। রিচার্ডসন মাথাটি পেয়ে খুশি হলো এবং ছুটির ঘণ্টার আগেই তাঁদের ঘোর বিপদ কেটে যাওয়ার অবস্থা দেখে ফেটিস আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন।

তৃতীয় দিনের দিন ম্যাকফারলেন এলেন। তিনি নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ; কিন্তু এই দুদিনের অনুপস্থিতির পর আজ নতুন উদ্যমে ছাত্রদের বোঝাতে লাগলেন। বিশেষ করে রিচার্ডসনকে তিনি এমন সাহায্য করলেন, উপদেশ ও উৎসাহ দিলেন, যে সে হাতের মুঠোর মধ্যেই সোনার মেডেল দেখতে পেলো।

এক সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই ম্যাকফারলেনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো। ফেটিস তাঁর ভয়ের হাত এড়িয়ে সে ব্যাপার একেবারেই ভুলে গেলেন। তাঁর সাহসে তিনি আত্মপ্রসাদ বোধ করতে লাগলেন• এবং মনে-মনে সেই ঘটনাটিকে এমনভাবে সাজিয়ে নিলেন যে তা মনে করে তিনি আজ কিছুটা গর্বই বোধ করলেন। তাঁর সঙ্গীর তিনি খুব কমই দেখা পেতেন। ক্লাসে অবশ্য তাঁদের দেখা হতো ; মিঃ কে—র কাছ থেকে তাঁরা দুজনে একত্রেই আদেশ নিতেন। গোপনে হয়তো কদাচিৎ তাঁদের কথা হতো এবং ম্যাকফারলেন আগাগোড়াই তাঁর দয়ার্দ্র, হাসিখুশি ভাব বজায় রাখতেন। কিন্তু তাঁদের সেই গোপন ব্যাপারটা তিনি সযত্নে এড়িয়ে যেতেন ; এমনকি যখন ফেটিস ফিসফিস করে তাঁকে জানালেন যে তিনিও সিংহের দলে নাম লিখিয়ে ভেড়ার দলকে ত্যাগ করেছেন তখন তিনি হেসে ইঙ্গিতে তাঁকে চুপ করে থাকতে বললেন।

আবার এমন এক সময় এলো যখন তাঁদের দুজনকে আবার ঘনিষ্ঠ হতে হলো। মিঃ কে—র আবার শবের অভাব হলো ; ছাত্ররাও অত্যন্ত উৎসুক এবং এই শিক্ষক কোনো সময়েই শবের অভাব সহ্য করতে পারতেন না। ঠিক সেই সময় গ্লেনকোর্স নামে এক পল্লীগ্রামে এক সমাধি দেওয়ার খবর এলো। সময় সে-

জায়গাটায় বেশি কিছু পরিবর্তন আনতে পারে নি; আজকের মতো তখনও জনমানবের বাসস্থানের বহু দূরে এক চৌমাথার ওপরে এই জায়গাটা ছিলো এবং ছয়টি সিডার গাছের জঙ্গলে তা একেবারে ঢাকা ছিলো। কাছের পাহাড়ের ওপর ভেড়ার ডাক, দুপাশের দুই ঝর্ণা—একটির নুড়ি-পাথরের মধ্যে দিয়ে গান গাওয়া আর অপরটির দুর্দম বেগে নিচের খাদের মধ্যে আছড়ে পড়া, পাহাড়ি গাছে বাতাসের মর্মর এবং সপ্তাহান্তে একবার দূর গির্জের ঘণ্টা-ধ্বনিই শুধু এর নীরবতা ভঙ্গ করে। এখানে কোনো আত্মীয়-স্বজন আর পুরাতন সমাধিস্তম্ভে ফুল দিতে আসে না। এই-রকম জায়গাতেই শব-শিকারীর দল নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে শব চুরি করতে উৎসাহ পায়। মাটির নিচে মৃতদেহকে পুঁতে যখন তার পুনরুজ্জীবনের কথা আনন্দে চিন্তা করতে করতে আত্মীয়-স্বজনেরা চলে যায়, তখনই আসে অর্ধ-আলোকিত, দ্রুত হাতে কোদাল চালানোর শব্দ। কফিন ভেঙে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে শবদেহটিকে বস্তায় মুড়ে অন্ধকার নিশ্চন্দ্র পথে পথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোপনে ঘুরে ফিরে উৎসুক ছাত্রদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

দুই শকুন যেমন এক মরা ভেড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি তাঁরা সেই কবরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ষাট বছরের বৃদ্ধা চাষী-বৌ, যাকে ভালো মাখন আর মিষ্টি কথাবার্তা ছাড়া আর কোনো কিছুর জন্যই কেউ মনে করতে পারে না, তাকে আজ মাঝরাতে কবর থেকে খুঁড়ে বের করতে হবে এবং তার শব সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে দূরের এই সহরে, যেখানে সে প্রতি রবিবার ভালো পোশাক পরে সেজেগুজে যেতে গর্ব বোধ করতো; পারিবারিক কবরখানায় অন্যান্য মৃত আত্মীয়ের পাশে তার স্থান শূন্য থাকবে এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ছাত্র এবং ডাক্তারদের কৌতূহল মেটাতে থাকবে।

বিকেল হলে লম্বা কোট পরে, একটি কড়া বোতল নিয়ে দুজনে বের হলেন। অঝোর ধারায় তীব্র শীতল বৃষ্টি তাঁদের গায়ে সূচ ফুটিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে-মাঝে দমকা বাতাস তাঁদের আরো বিব্রত করে তুলছিলো; কিন্তু বৃষ্টির ঝরঝরানি একটুও কমেনি। মদের বোতল এবং সবকিছু থাকা সত্বেও তাঁরা নিস্তেজ-ভাবে চুপচাপ গাড়ি হাঁকিয়ে চলছিলেন। পেনিকুইকে এসে তাঁরা থামলেন, এখানেই সন্ধ্যাটা কাটাতে হবে। কারখানার কাছেই একবার থেমে যন্ত্রপাতিগুলোকে লুকিয়ে রেখে তাঁরা ফিশার্স ট্রাইস্টে এসে উঠলেন। গাড়ি আর ঘোড়া আস্তবলে তুলে দুই ডাক্তার সেই হোটেলে ঢুকে সবচেয়ে ভালো খাবার আর ঘরের অর্ডার দিলেন। আলো, আগুন, কাঁচের জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ এবং রাতের ভীতি-বিরক্তিকর কাজ তাঁদের নৈশ-ভোজনে কিছুটা আনন্দ সঞ্চার করলো। প্রত্যেকটি গ্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের অন্তরঙ্গতা বেড়ে উঠলো। ম্যাক-ফারলেন কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা তাঁর বন্ধুকে দিলেন।

তোমার পুরস্কার! তিনি বললেন, দুই বন্ধুর মাঝে এই বীভৎস কাজের চিন্তা তামাকের ধোঁয়ার মতো উড়ে যাক।

ফেটিস স্বর্ণমুদ্রা পকেটস্থ করে তাঁর হৃদয়ানুভূতির প্রতিধ্বনি করলেন। বললেন, তুমি একজন দার্শনিক। তোমার পরিচয় পাওয়ার আগে আমি একটি গাধা ছিলাম। তুমি আর মিঃ কে—আমাকে মানুষ করে তুললে।

নিশ্চয়ই! ম্যাকফারলেন জোর গলায় বললেন। মানুষ? সেদিন সকালে আমার সাহায্যের জন্য একটি মানুষই এসেছিলো, বুঝলে? বড়, কথাসর্বস্ব, চল্লিশ বছরের বুড়োরা সেদিন হয়তো ঐ দেখে মুখ ফিরিয়ে নিতো; কিন্তু তুমি করোনি—তুমি তোমার মাথা ঠিক রেখেছিলে। আমি তা লক্ষ্য করেছি।

শোনো কথা, কেন রাখবো না? ফেটিস বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই বললেন,—ওটা আমার কোনো ব্যাপার নয়। একদিকে গণ্ডগোলের সৃষ্টি ছাড়া আর কোনো লাভ নেই, অপর দিকে তুমি-আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। তবেই বোঝো! তিনি পকেটে এমন জোরে থাবড়া দিলেন যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো।

এইসব অপ্রীতিকর কথায় ম্যাকফারলেনের মনে সামান্য ভয়ের সঞ্চার হলো। হয়ত বন্ধুটিকে সাফল্যের সঙ্গে এই ব্যাপারটি শেখানোর জন্য তাঁর অনুশোচনাও হলো; কিন্তু বন্ধুটির বড়াই আবার শুরু হওয়াতে তিনি আর বাধা দেওয়ার সময়ও পেলেন না।

ভয় না পাওয়াটাই হলো বড় কথা। তোমার আমার কথা বলি, সত্যি বলতে কী, আমি ফাঁসি যেতে চাই না। স্বর্গ, নরক, দেবতা, দানব, ভালো, মন্দ, পাপ, পুণ্য—সকলকে লোভ দেখাতে পারে, কিন্তু তোমার আমার মতো লোক এগুলো অবজ্ঞা করে।

তখন রাত হয়ে গেছে। আদেশ মতো ঘোড়ার গাড়িটা এসে গেছে, দুধারের দুটো আলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। দুজনে হোটেলের বিল মিটিয়ে পথ ধরলেন। যাবার সময় বলে গেলেন যে তাঁরা পিবলসের দিকে যাচ্ছেন এবং সেইদিকেই গাড়ি হাঁকিয়ে দিলেন। তারপর জনমানবের বসতির বাইরে এসে আলো নিবিয়ে আবার উল্টোপথে অলিগলি ঘুরে গ্লেনকোর্সের দিকে চললেন। গাড়ির আর অবিরত বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। চারিদিক নীরন্ধ্র অন্ধকার; মাঝে-মাঝে এখানে-সেখানে বাড়ির সাদা দেয়াল, সাদা দরজা দেখে রাস্তা ঠিক করতে হচ্ছিলো। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই পথ হাতড়ে-হাতড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না। কবরখানার সামনে বনের কাছে এসে আলোর শেষ রশ্মিও তাঁরা হারিয়ে ফেলে অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। তাই গাড়ির একটা আলো খুলে আবার আলো জ্বালিয়ে নিতে হলো। এই-

ভাবে বৃষ্টি-ভেজা গাছের তলা দিয়ে বড়-বড় চলন্ত ছায়ার মাঝ দিয়ে তাঁরা তাঁদের ঘৃণ্য কাজের জায়গায় এসে দাঁড়ালেন।

তাঁরা দুজনেই এই কাজে অভিজ্ঞ এবং শাবল চালানোয় দক্ষ; বিশ মিনিট যেতে-না-যেতেই তাঁরা কফিনের ঢাকনির ওপর শাবলের শব্দ পেলেন। ঠিক সেই সময়ে ম্যাকফারলেনের হাতে একটা পাথরের আঘাত লাগায় তিনি বিরক্ত হয়ে পাথরটি মাথার ওপর দিয়ে পেছনে ছুঁড়ে ফেললেন। যে গলা-সমান কবরের গর্তের মধ্যে তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেটি কবরখানার উঁচু জায়গাটার ঠিক কিনারায় ছিলো এবং জায়গাটিকে ভালো করে আলোকিত করার জন্য গাড়ির আলোটিকে একটি গাছে হেলান দিয়ে ঝর্ণার ঠিক খাড়া ধারটিতেই রাখা হয়েছিলো। দুর্ভাগ্য পাথরটিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেয়নি। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচ ভাঙার শব্দ, সমস্ত জায়গা জুড়ে অন্ধকার তমিস্রা আর ঝর্ণার খাড়া পাড় বেয়ে লণ্ঠনটির পড়ে যাওয়ার ঝন্‌ঝন্ শব্দ। দু-একটা পাথরের নুড়ি লণ্ঠনের ঘায়ে ছিটকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগলো; তারপর সেই অন্ধকার রাত আবার চুপ করে গেলো। তাঁরা আরো কিছু শোনার জন্য কান খাড়া করে রইলেন, কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টি কিংবা ঝোড়ো বাতাসের হুংকার ছাড়া ধূ-ধূ-করা মাঠে আর কিছুই শোনা যাচ্ছিলো না।

তাঁদের এই ঘৃণ্য কাজের এতো কাছাকাছি এসে অন্ধকারেই তা শেষ করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করলেন। কফিনটিকে তুলে ভেঙে ফেলে শবটিকে বস্তায় ভর্তি করে দুজনে গাড়িতে বয়ে নিয়ে গেলেন। বস্তাটিকে সোজা করে ধরার জন্যে একজন গাড়িতে উঠে বসলেন, অপর জন ঘোড়ার লাগাম ধরে দেয়াল আর ঝোপ হাতড়ে হাতড়ে সরু রাস্তা ছাড়িয়ে বড় রাস্তায়

গাড়িটিকে নিয়ে এলেন। বড় রাস্তায় পড়েই তিনিও গাড়িতে উঠে খুব জোরে সহরের দিকে গাড়িটি হাঁকিয়ে দিলেন।

এই কঠিন কাজে তুজনেই ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেছলেন ; রাস্তার মাঝের গর্তে গাড়ির চাকা পড়ে গাড়িটি লাফিয়ে উঠছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের তুজনের মাঝখানে দাঁড়-করানো শবটি একবার এর ঘাড়ে একবার ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে। এই বীভৎস বিশ্রী ব্যাপার এক-একবার ঘটামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাড়াতাড়ি ধাক্কা দিয়ে শবটিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই ব্যাপারের বারবার পুনরাবৃত্তি তাঁদের তুজনের স্নায়ুকেই শিথিল করে তুলছিলো। তাঁদের এই অপ্রীতিকর বোঝাটি সমানে এদিক-ওদিক লাফালাফি করতে লাগলো—একবার হয়ত মাথাটা কারও কাঠের ওপর লতিয়ে পড়ছে, পরমুহূর্তে হয়ত ঠাণ্ডা ভিজে বস্তাটি কারো মুখের ওপর আছড়ে পড়ছে। ফেটিসের মনকে একটা মৃত্যু-শীতল অনুভূতি আস্তে আস্তে আঁকড়ে ধরছিলো। তিনি বস্তাটার দিকে তাকালেন, মনে হলো প্রথমে যা দেখেছিলেন বস্তাটাকে যেন তার চেয়ে বড় বলে মনে হচ্ছে! পল্লীর সমস্ত কুকুর তাঁদের গাড়ির পেছন পেছন অদ্ভুত করুণ চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে—শুনে শুনে তাঁদের মনে হলো যেন অস্বাভাবিক কোনো ভৌতিক ব্যাপার ঘটছে, যেন এই মৃতদেহের কোনো এক অজানা পরিবর্তন ঘটছে এবং তারই ভয়ে কুকুরগুলো ওভাবে ডাকছে।

অনেক কষ্টে গলা পরিষ্কার করে তিনি বলে উঠলেন, ভগবানের দোহাই, একটা আলো—একটা আলো!

ম্যাকফারলেনেরও মনের অবস্থা তখন বোধহয় ঠিক সেই পর্যায়ে এসেছিলো। তিনি কোনো কথা বললেন না ; ঘোড়া থামিয়ে লাগামটা বন্ধুর হাতে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আলো জ্বালবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তাঁরা ততক্ষণে মাত্র অচেন-

ক্লিনির চৌমাথা পর্যন্ত এসে পৌছেছেন। তখনও মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে, যেন মহাপ্রলয় ঘনিয়ে এসেছে; এবং এই অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে আলো জ্বালা খুব সহজ ব্যাপার নয়। দেশলাইয়ের কম্পমান নীল শিখাটি সলতের গায়ে লাগিয়ে তাকে জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে দেওয়ার পর যখন ছোট্ট গাড়িটার চারপাশে একটু আবছা আলো হলো, তখন দুই বন্ধু পরস্পরকে একবার দেখলেন, তারপর তাঁদের দৃষ্টি পড়লো তাঁদের দুজনের মাঝের সেই বস্তাটির ওপর। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারায় চটের বস্তাটা ভিজে মৃতদেহের অবয়বটা পরিস্ফুট করে তুলেছিলো। ধড়ের থেকে মাথাটা সম্পূর্ণ আল্‌গা, ঘাড় একেবারে সোজা; এই বীভৎস দৃশ্য দেখে দুজনের চোখেই এক ভৌতিক বিস্ময় জেগে উঠলো।

আলোটা তুলে ধরে ম্যাকফারলেন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এক অজানা ভয় ভিজে কাপড়ের মতো শবদেহটিকে যেন জড়িয়ে ধরে ফেটিসের মুখের চামড়াকে টেনে ধরছে—অর্থহীন এক ভয়, অকাল্পনিক এক বিভীষিকা তাঁর সমস্ত দেহে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মুহূর্তপরেই তিনি কথা বলতে গেলেন; কিন্তু বন্ধু তার আগেই কথা বলে ফেলেছেন।

ভয়-কম্পিত স্বরে চুপি চুপি ম্যাকফারলেন বললেন, এটি স্ত্রীলোক নয়!

ফেটিস ফিসফিস করে বললেন, বস্তাটা বন্ধ করার সময় কিন্তু এটি স্ত্রীলোক ছিলো!

আলোটা ধর! বন্ধু বললেন। আমি এর মুখ দেখবো।

ফেটিস আলো ধরতে ম্যাকফারলেন বস্তার মুখ খুলে মাথার আবরণ তুলে ফেললেন। তাঁদের দুজনের অত্যন্ত পরিচিত, অনেক স্বপ্নে দেখা এই ঘোরবর্ণ, সুগঠিত, পরিষ্কার দাড়ি-কামানো মুখের ওপর আলো স্পষ্ট এসে পড়লো। এক উৎকট

চিৎকার অন্ধকার কালো রাত চিরে দিয়ে গেল এবং তুজনেই গাড়ির ওপর থেকে তুদিকে লাফিয়ে পড়লেন। আলোটা পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে নিভে গেলো, ঘোড়াটা এই চিৎকারে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে জোর পায়ে এডিনবরার দিকে ছুটে চললো, সঙ্গে চললো শুধু গাড়ির একমাত্র আরোহী—মৃত এবং বহুদিন আগে ব্যবচ্ছিন্ন গ্রে-র মৃতদেহ।

অনুবাদ—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

লিও টলস্টয় (১৮২৮—১৯১০) রুশ লেখক। উচ্চবংশসম্ভূত ঋষি টলস্টয়ের লেখার মধ্যে মানবতার যে উচ্চ আদর্শ ধ্বনিত হয়েছে, জগৎ-সাহিত্যে তার তুলনা নেই। তাঁর শ্রেষ্ঠ বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস', 'আনা কারেনিনা', 'রেজারেকশন' ও 'নীড়'। এই সংকলনের অন্তর্গত গল্পটি পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প বলে সর্ববাদীসম্মত।

আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪—১৯২৪) ফরাসী সাহিত্যিক। জন্ম হয় প্যারীতে। জীবনের অধিকাংশ কালই তাঁর ওখানে কেটেছিলো। তাঁর কলাসিদ্ধির খ্যাতি আজ পৃথিবীবিস্তৃত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ কেবল তারই একটি সাধারণ স্বীকৃতি মাত্র। দীর্ঘ ৪০ বছরের সাহিত্যসাধনার ফলে যে অপূর্ব গল্পসম্ভার তিনি উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি গল্প এই গ্রন্থে সংকলিত হলো। তাঁর অপূর্ব রচনা-সম্ভারের মধ্যে কেবলমাত্র 'পেংগুইন আইল্যাণ্ড'এর নাম করছি।

হেন্‌রিখ সিন্‌কেভিচ (১৮৪৬—১৯১৬) পোল্যাণ্ডের লেখক। তাঁর এই গল্পটির মতো উজ্জ্বল স্বদেশপ্রেমের গল্প পৃথিবীর সাহিত্যেও বিরল। তাঁর রচনার খোলা আকাশ, নির্জন সমুদ্র, মেঘ-রৌদ্র, অরণ্য আর একাকীত্বের স্বাদ নেশার মতো পেয়ে বসবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেকার যে আসল মানুষ আছে, তার বিষণ্ণ মধুরতার যে কাহিনী এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে তা যে-কোনো মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'কুয়ো ভাদিস' পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বি. বিয়র্নসন (১৮৩২—১৯১০) নরওয়ের লেখক। নরওয়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও জাতীয় সংগীতের রচয়িতা এই সাহিত্যিকের সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পটির অনুবাদ এই গ্রন্থে স্থান পেলো। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ও. হেনরি (১৮৬২-১৯১০) আমেরিকার লেখক। লেখক ও. হেনরি নামেই পৃথিবীময় পরিচিত হলেও তাঁর আসল নাম উইলিয়ম সিডনি পোর্টার।

ছোট গল্পকে যে একই সঙ্গে ছোট এবং গল্প হতে হবে, 'একথা বোধহয় তাঁর মতো কেউই উপলব্ধি করেনি। গল্পের কারিকুরির ব্যাপারেও তাঁর দক্ষতা ছিলো অসাধারণ। সংখ্যায় তাঁর চেয়ে বেশি ছোট গল্প এবং বেশি সার্থক গল্প হয়তো আজ পর্যন্ত কেউই লেখেন নি। গল্পের শেষে বিস্ময় বা চমক দিয়ে গল্পকে অকস্মাৎ তীব্র করে তোলার ব্যাপারে তাঁর চেয়ে বেশি কৃতিত্ব বোধহয় আর কেউই দেখাতে পারেন নি।

এডগার এ্যালান পো (১৮০০-১৮৪৯) আমেরিকার লেখক। অনন্য-সাধারণ সাহিত্য-প্রতিভা। রোগে, দুঃখে, দারিদ্র্যে, বঞ্চনায় বহু অভিশাপ-দীর্ণ এই স্বল্পস্থায়ী জীবন। মূলত কবি হলেও তাঁর অসাধারণ গল্পসমূহের জন্যই তাঁর অসাধারণ জনপ্রীতি। যা অলৌকিক, যা সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে, বিস্ময়ে আতঙ্কে রোমাঞ্চিত, তাই দিয়ে তিনি রচনা করেছেন নানা বিচিত্র কাহিনী। অস্বাভাবিকের প্রতি আকর্ষণ তাঁকে রহস্যমূলক কাহিনী রচনাতেও উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁকে আধুনিক কালের ডিটেকটিভ কাহিনীর জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না। রহস্য-সমাধানে বিশ্লেষণী মনোবৃত্তির আভাস তিনি দিয়েছেন যে-কয়েকটি বিখ্যাত গল্পে, তারই একটা নমুনা এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হলো।

এডওয়ার্ড মর্গ্যান ফর্স্টার (১৮৭৯—) ইংরেজ লেখক। এঁর উপন্যাস-সমূহ ১৯০৫ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে লিখিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে আগে নাম করতে হয় 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' ও 'হাওয়ার্ডস এণ্ড'। যে-কটি কল্পকথার জন্য তাঁর লেখনী অমরত্ব লাভ করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পটির অনুবাদ এ-সংকলনে স্থান পেলো।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ (১৮৬৬-১৯৪৬) ইংরেজ সাহিত্যিক। নিতান্ত সাধারণ অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আপন চেষ্টায় জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিলেন। ওয়েল্‌সের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, সাহিত্যিক প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক মণীষার অপরূপ সমন্বয় ঘটানো। তাঁর বিরাট সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে এমনি বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি-করা কল্পকাহিনীগুলির আকর্ষণ সহজে ঘুচবে না। তাঁর এই ধরনের লেখার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো 'দি ওয়ার অব্ দি ওয়ার্লডস্', 'দি টাইম্ মেশিন', 'দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো', 'দি ইনভিজিবল ম্যান' ও অসংখ্য ছোট গল্প, যাদের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্প এখানে পরিবেশিত হলো।

এ্যাণ্টন চেখভ (১৮৭০-১৯০৪) রুশ লেখক। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প-লিখিয়ে হিসেবে চেখভের নাম। ডাক্তারি ডিগ্রি থাকলেও কখনো চিকিৎসালয়ে কাজ করেন নি, আজীবন সাহিত্যই করে গেছেন। তবে, এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তাঁর সাহিত্য-সাধনায় অনেক কাজে এসেছিলো। অল্প কথায় অনেক কথা বলার বিস্ময়কর ক্ষমতা তাঁর ছিলো। নাট্যকার হিসেবে অধিক খ্যাতি-সম্পন্ন হলেও তাঁর ছোট গল্প পড়ে কোনো সমালোচক বলেছেন, 'তাঁর গল্পের মধ্যে আমরা এক সম্পূর্ণ পৃথিবীকে দেখতে পাই।' আলোচ্য গল্পটি তাঁর লিপিকুশলতার এক অপূর্ব নিদর্শন।

হ্যানস্ এ্যাণ্ডারসেন (১৮০৫-১৮৭৫) ডেনমার্কের লেখক। বাবা মুচি, মা ধোবানী। এই পরিবারের ছেলে হ্যানস্ নিজেই ছেলেবেলায় ছিলেন তাঁর অপরূপ কাহিনী 'কুৎসিত হাঁস'এর নায়কের মতো—কেমন বেয়াড়া চেহারার। পারিপার্শ্বিক জীবনের সংকীর্ণতা তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারে নি, লেখাপড়া শিখে লিখতে শুরু করেন। যে অসংখ্য রূপ-কাহিনী সত্তর বছরের দীর্ঘ জীবনে তিনি লিখে গেছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে তার তুলনা নেই। তেমনি একটি গল্পই এই সংকলনে পরিবেশিত হলো।

হাওয়ার্ড ফাস্ট (১৯১৪—) আমেরিকার লেখক। মানুষের শৌর্য ও গৌরবের ইতিহাস মন্থন করে যেরূপ বলিষ্ঠতার সঙ্গে তিনি সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন, তার তুলনা বিরল। ন্যায়ের আদর্শ সাধারণকে অসাধারণ করে তোলে—এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করেছেন; অলৌকিক ঘটনাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ফ্রীডম রোড', 'স্পার্টাকাস, 'আনভ্যাংকুইশ্‌ট' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গল্পটিতে তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

জে. বি. এস. হলডেন (১৮৯২-) ইংরেজ বৈজ্ঞানিক, যদিও সম্প্রতি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন। পিতা ও পিতামহ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় মানুষ এবং মাত্র সামান্য যে-কয়েকটি গল্প তিনি লিখে গেছেন সেগুলির পটভূমিকায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাই প্রবল। অদম্য প্রাণশক্তিসম্পন্ন অদ্ভুত তাঁর ব্যক্তিত্ব। বর্তমান গল্পটিতে তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

রবার্ট লুই স্টিভেনসন (১৮৫০-১৮৯৪) ইংরিজি লেখক। সারা জীবন ব্যাধিতে ভুগে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে এই অলোকসম্পন্ন প্রতিভার মৃত্যু হয়। এই স্বল্পপরিসর জীবনে তিনি যা লিখে গেছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে অমরত্ব-লাভের পক্ষে তা যথেষ্ট। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস-সমূহের মধ্যে 'কিডন্যাপ্‌ট্', 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড', 'ডক্টর জেকীল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড', 'ক্যাট্রিওনা' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি সোমোয়ায় কাটিয়েছিলেন: গল্প-বলিয়ে হিসেবে সেখানে তাঁর খ্যাতি হয়েছিলো। আলোচ্য গল্পটি তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।
